জনমানসের দৃষ্টিতে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা]

প্রথম খণ্ড

[প্রথম অধ্যায়—ষষ্ঠ অধ্যায়]

[ভগবদ্গীতা ও Praxiology]

[A *Study in Methodology*]

[জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধনের সর্ব্বোত্তম কৌশলের ব্যাখ্যান]

জিজ্ঞাসু

হরিচরণ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৩

ভারতবর্ষে মুদ্রিত :
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯
কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রক :
শ্রীসুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মূল্য—৫·০০

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ স্বামীজীমহারাজের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই গ্রন্থে উপনিষৎ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং সেই সকল উদ্ধৃতির যে বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় বসুমতী-সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আর মহাভারত হইতে উদ্ধৃতি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত হইতে এবং মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের অনুবাদ হইতে। ইঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিতেছি। আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বসু ও অধ্যাপক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট, ঁহাদের সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হইত না।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান্ পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া দেওয়ায় আমি বিশেষ কৃতার্থ। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থটী প্রকাশ করায় ইহার কর্ত্তৃপক্ষকে, বিশেষ করিয়া উপাচার্য্য ডাঃ সত্যেন সেন মহাশয়কে, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হরিচরণ ঘোষ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ ঘোষ সুদীর্ঘকাল Economics (অর্থনীতি) ও (স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্) Statistics শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ছাত্রসংসদ ও সুধীসমাজে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কুলধর্মানুরোধে এবং ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিশ্বাসে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবল অনুরাগী। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পাঠ তাঁহার পরিবারে দীর্ঘকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গীতার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন এবং নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত গীতোক্ত তত্ত্বের রহস্য আবিষ্কার করিতে উদ্যত হন। তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের মর্ম বুঝিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অধুনা প্রবর্ত্তিত Praxiology শাস্ত্রের সহিত সুপরিচিত। এই শাস্ত্রের লক্ষ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্য optimization of operational efficiency অর্থাৎ কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন। গীতোক্ত কর্মযোগের সহিত এই নবপ্রবর্ত্তিত শাস্ত্রের যোগসূত্র তিনি অনুসন্ধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধনের বীজ এবং রহস্য গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে অভিব্যক্ত। কর্মের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিগত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। সনাতন ধর্মের যে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই প্রতিনিয়ত বর্ণের বিহিত কর্মের নাম স্বধর্ম। এই স্বধর্মের পালন সকলের নিকট অপরিহরণীয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটে পরধর্মের লোভে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'। ব্রাহ্মণ যদি যজন, যাজন, দান প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন এবং

অধ্যাপনা বর্জন করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম শস্ত্রবিদ্যা অবলম্বন করেন এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ধর্ম বা বৈশ্যের ধর্মাশ্রয় করেন তাহা হইলে বৃত্তি-সঙ্কর ঘটিবে। বৃত্তিসঙ্কর ঘটিলে বর্ণসঙ্কর অপরিহার্য্য হইবে। বর্ণসঙ্কর হইলে সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবে। ইহা আর্য সনাতন ধর্মের প্রতিভু ঋষিগণ এবং আচার্যগণের দৃষ্টিতে ভয়াবহ অব্যবস্থা।

অর্জুন যুদ্ধে স্বজনবধের আশঙ্কায় ক্ষাত্রধর্মের বিসর্জন দিয়া ব্রাহ্মণোচিত চতুর্থ আশ্রমের ভৈক্ষ্যবৃত্তির আশ্রয় করিতে উদ্যত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বুদ্ধির বিকার উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে স্বধর্মের অনুষ্ঠানে প্রণোদিত করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাহা তাহার স্বধর্ম। এই স্বধর্মকে দোষদুষ্ট ভাবিয়া অহিংসাপ্রধান ব্রাহ্মণবৃত্তির অবলম্বন প্রত্যবায়ের হেতু হইবে। অর্জুন স্বভাব ও সংস্কার বশতঃ ক্ষাত্রধর্ম পালনেরই অধিকারী এবং তাহাতেই তিনি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়। পরধর্মে সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা আত্মবিড়ম্বনায় পর্যাবসিত হইবে। ক্ষত্রিয় যদি হিংসাকলুষিত বলিয়া ধর্মযুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, এবং শাস্ত্রবিহিত নীতির অনুসরণে প্রজাপালন ও রাজাশাসন হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে অরাজকতার উদ্ভব হইবে। অরাজকতার ভয়াবহ পরিণাম মহাভারতের শান্তিপর্বে স্পষ্ট কথায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরিচয় আমরা আমাদের বঙ্গদেশে অনুভব করিয়াছি এবং করিতেছি। মানবের জীবন, ধন, সম্পত্তি স্বধর্ম-অনুষ্ঠান সমস্তই বিপন্ন হইয়াছে। এই ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয় হইতে জাতিকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। কিন্তু রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি রাষ্ট্রনায়কগণ যদি দুর্বৃত্তের দণ্ডবিধানে শৈথিল্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে জনগণের অবস্থা পশু অপেক্ষা হীনতর হইবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিবারণের জন্য

ভগবান্ অর্জুনকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধে হিংসা অবর্জনীয় এবং ইহা পরমধর্ম অহিংসার বিরোধী। এই হিংসার ফলে হিংসাকারীর নরকাদি দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহা শ্রেয়স্কাম পুরুষের অকর্ত্তব্য। রাজ্যসুখলোভে প্রযুক্ত হইয়া যাহারা জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ঈদৃশ শত্রু পক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অর্জুন ইচ্ছা করেন না। ইহা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ অধিকতর কাম্য। এই বুদ্ধিসঙ্কটে (intellectual crisis-এ) গীতার তত্ত্ববিদ্যা (philosophy) প্রণিধানযোগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত। যে কোন কর্মের অনুষ্ঠানে জীবহিংসা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও শরীর রক্ষার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিলে জীবহিংসা ঘটে। পৃথিবীর সর্বত্র, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, জীব বর্ত্তমান এবং তাহা এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে স্বল্প প্রতিঘাতে তাহারা বিনষ্ট হয়। সকলকেই কর্ম করিতে হইবে। এমন কি, গৃহীর কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা পরিব্রাজক, নৈষ্কর্ম্যই যাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহারাও এইরূপ হিংসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। শরীর ধারণ করিতে হইলে কর্ম আবশ্যক, এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বহু জীবের প্রাণহানি হয়। ধর্মযুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য। কিন্তু তাহা পরিহার করিলে ধন, প্রাণ, স্বধর্ম বিপন্ন হয়। ইহার ফল আমরা পূর্বেই সূচিত করিয়াছি। ধর্মযুদ্ধ না করিলে দুর্বৃত্ত, দস্যুধর্মী ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসনের অধিকারী হইবে। তাহাদের দুঃশাসন অরাজকতার অধিক। অতএব সমগ্র জাতির স্বার্থ ও স্বধর্মরক্ষার জন্য ধর্মযুদ্ধ অনিবার্য। রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া পরধনলোভে পররাজ্য অপহরণ

দস্যুতার স্বরূপ। ভারতবর্ষ দীর্ঘ অষ্ট শতাব্দী যাবৎ দস্যুধর্মা মধ্য-এশিয়াবাসী ম্লেচ্ছগণের দ্বারা পরাজিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে এবং প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ বৃটিশ শাসনে পরাধীনতার দুঃখ অনুভব করিয়াছে। তাহা এই দেশবাসীর স্বধর্ম পরিত্যাগের ফল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষে রাজন্যবৃন্দ সংহত হইয়া ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই। তাহার কারণ তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ এবং ব্যক্তিগত সুখসম্পদভোগের উদগ্র লোভ। এই রাগদ্বেষ বর্জন করিয়া স্বজাতি স্বধর্ম পালনে তাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন না। এই ব্যক্তিগত সুখৈশ্বর্য্য লাভের ইচ্ছা বর্জন না করিয়া সমগ্র জাতির কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়ার পাপে ভরতবর্ষের হিন্দু নরপতিগণ কলুষিত হইয়াছিলেন। বহু মানবের হিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিবার শিক্ষা আমরা গীতায় লাভ করি।

হিংসা ও অহিংসার তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশদভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মা অবিনশ্বর, দেহের নাশে আত্মার বিনাশ হয় না। আর দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'। যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মৃত্যু হইবে। অতএব এই অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা জ্ঞানী ব্যক্তির অনুচিত। বিশেষতঃ ধর্ম্মযুদ্ধে স্বধর্ম্ম পরিপালনের জন্য শত্রুবধ অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য শত্রুবধে হিংসার অভিযোগ নিরবকাশ। স্বীয় সুখভোগের নিমিত্ত কিংবা বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধী ব্যক্তির বধসাধন হিংসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব ধর্ম্মযুদ্ধে হিংসাজনিত পাপ হইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অহিংসার ঐকান্তিক সমর্থক জৈনগণের আচার্য উমাস্বাতি বলিয়াছেন—"প্রমত্তযোগাৎ প্রাণব্যপরোপণং হিংসা"—অর্থাৎ প্রমাদ, লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতির দ্বারা প্রণোদিত জীবননাশই হিংসা। কুমারিল ও জয়ন্তভট্ট এক

শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের মতে হিংসাই ধর্ম। তাহারা সংসারমোচক নামে পরিচিত। 'সংসারমোচকাদীনাং হিংসা ধর্মত্বসম্মতা' (শ্লোকবার্ত্তিক)। অধুনা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একশ্রেণীর রাজনীতিক বিরোধী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বধ-সাধন ধর্ম বলিয়া মনে করেন এবং এই বিশ্বাসের অনুরোধে বহু নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটিয়াছে। ইহারা নক্সালপন্থী নামে প্রসিদ্ধ আছে। ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ না থাকিলেও তাহাদের মতবাদ (ideology) এই হিংসার মূল উৎস। তজ্জন্য মোহবশতঃ প্রাণনাশকেও হিংসা বলা হইয়াছে। এইরূপ এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রাণনাশকে ধর্মের সাধন বলিয়া মনে করেন। এইরূপ লোকক্ষয়-কর ভয়াবহ ব্যক্তিগণের বধবন্ধাদির দ্বারা হিংসা নিবারণ রাজার অবশ্য কর্তব্য। হিংসার প্রতিরোধ করিতে যদি হিংসা অপরিহার্য্য হয় তাহা স্বধর্মপালনের নিমিত্ত, পাপের হেতু নহে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণী মাত্রেরই কর্ম অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। কর্ম পরিত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অসম্ভব। অতএব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে কর্মানুষ্ঠান বন্ধনের হেতু হয় না। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ' – সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের আরাধনা। কোন কর্মই স্বভাবতঃ হীন বা উৎকৃষ্ট নহে। মহাভারতের ব্যাধগীতায় পরমতত্ত্বজ্ঞানী ব্যাধ স্বধর্ম মাংসবিক্রয় করিতেন। তাহা স্থূল দৃষ্টিতে হীনকর্ম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু রাগদ্বেষ পরিহার করিয়া স্বধর্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত বলিয়া দোষের হেতু হয় নাই।

সমস্ত কর্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। কর্মের দ্বারাই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। অতএব কর্মানুষ্ঠানে কোন শৈথিল্য বা প্রমাদ থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইবে। রাগদ্বেষ দ্বারা মানুষের চিত্ত তাহার ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। স্থিরবুদ্ধি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলেই

সম্ভব হয়। রাগদ্বেষবর্জন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনাবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান ত্রুটিহীন। ইহাই কর্মানুষ্ঠানের কৌশল। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।' অতএব কর্মশক্তির উৎকর্ষ ও কাষ্ঠা প্রাপ্তি যোগযুক্ত চিত্তেরই স্বাভাবিক পরিণতি। Optimization of operational efficiency, যাহা বর্তমান praxiology-র লক্ষ্য, তাহা গীতোক্ত কর্ম-যোগেরই প্রতিরূপ। ইহা অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যৌক্তিকদৃষ্টিতে আমি তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করি। গীতার philosophy বা তত্ত্ববিদ্যা বহুমুখী। ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মের ন্যায় অনন্ত। নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে গীতারহস্য উদ্ঘাটন করিতে বহু মনীষী প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রয়াস নিরর্থক হয় নাই। অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় যে নবীন দৃষ্টিভঙ্গীতে গীতার ব্যাখ্যা করিলেন তাহা আমাদের গীতার তত্ত্ববিদ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রভূত আনুকূল্য করিবে। 'All roads lead to Rome' – এই চির প্রচলিত প্রবাদবাক্য বর্তমানক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লেখকের সারস্বত-সাধনা সার্থক হইয়াছে। গীতার সমস্ত ব্যাখ্যা যাহা শ্রদ্ধাপ্রণোদিত হইয়াছে, প্রাচীন ভাষ্যকার হইতে আধুনিক মনীষীগণের প্রচেষ্টা আমাদিগকে একই লক্ষ্যে উপনীত করে। সত্যের অনুশীলনের দ্বারাই তাহার বহুরূপের এক একটি রূপ যথার্থভাবে প্রতিভাসিত হয়। বর্তমান গ্রন্থকার দীর্ঘ কালব্যাপী আলোচনা ও মননের দ্বারা গীতার রহস্যের যে রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুর শ্রদ্ধার যোগ্য। ইহা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় প্রবৃত্ত বলিয়া সুধী সমাজে পরিগৃহীত হইবে। ভগবানের নিকট গ্রন্থকারের নিরাময় দীর্ঘজীবন এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় সারস্বতসাধনার অপ্রতিহত গতি প্রার্থনা করি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে শান্তনু নামে এক মহাবীর নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী গঙ্গাদেবীর গর্ভে অষ্টমপুত্র ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। তিনি তখন দেবব্রত নামে খ্যাত ছিলেন।

পরে রাজা শান্তনু ধীবর রাজকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু যুবক পুত্র দেবব্রতের মনোভঙ্গের আশঙ্কায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। দেবব্রত ইহা জানিতে পারিয়া পিতার সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বৈমাত্র ভ্রাতার অনুকূলে রাজপদের স্বত্ব ত্যাগ এবং পাছে বিবাহ করিলে তাঁহার পুত্র এই রাজপদ আকাঙ্খা করে, সে কারণ চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তখন হইতে তিনি ভীষ্মনামে খ্যাত।

মৎস্যগন্ধার গর্ভে রাজা শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুটী পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্য রাজা হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের দুইকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ব্যাসদেবের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন ; তাই কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্যপ্রাপ্ত হন। ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রই পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের অভিভাবক হন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্র। দুর্য্যোধন অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ও অভিমানী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের জ্যেষ্ঠ

যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়া মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের পরামর্শে কৌশলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বারণাবতে জতুগৃহে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ বিদুরের পরামর্শে সেই বিপদ হইতে রক্ষা পান এবং ব্রাহ্মণের বেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

সেই সময় দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুন সমবেত সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। বিবাহের পর পাণ্ডবগণ রাজ্য প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র দুইভাগে সমস্ত রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। ইহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনায় ও যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবের উন্নতি দেখিয়া দুর্যোধনের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। কৌশলপূর্ব্বক পাশা খেলায় আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি পরাজিত করেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, পত্নী সমস্ত হারিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের যত্নে কৌরবগণকে ক্রীড়ালব্ধ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইল। ইহাতে দুর্য্যোধন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় পাশা খেলিতে নিমন্ত্রণ করেন। এইবার পণ হইল, হারিলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। এবারও যুধিষ্ঠির হারিয়া যান এবং পণানুসারে বনে গমন করেন।

নির্দ্ধারিত ত্রয়োদশ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে রাজ্য ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। দুর্য্যোধন সম্মত হইলেন না, পরন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দিব না।" কৃষ্ণ-বাসুদেব উভয় পক্ষের কল্যাণকামনা করিয়া বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দূত হিসাবে কৌরবদিগের সহিত একটী

সুষ্ঠু সামঞ্জস্য করিবার আপ্রাণ প্রয়াস করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। দুর্য্যোধন কোন পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। ইহা হইতেই যুদ্ধের সূত্রপাত আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত দুই পক্ষই যুদ্ধ ঘোষণা স্থির করিলেন। এই পারিবারিক যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইলেন এবং দুর্য্যোধনকে এক লক্ষ নারায়ণী সেনা দিলেন।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে[১] পৃথিবী বিবরণ করিতে করিতে যুদ্ধের যথাযথ পূর্ব্ব ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সঞ্জয় একেবারে ভীষ্মের পতনবার্ত্তা ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিলেন। ভীষ্মপতন বার্ত্তায় বিস্মিত ধৃতরাষ্ট্র তখন যুদ্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,[২]

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥

এই আদেশ সূচক প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় সেই অদ্ভূত লোমহর্ষণ বিচিত্রযুদ্ধ[৩] সবিস্তারে বর্ণনা করেন ; কিন্তু ভগবদ্গীতা এই যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ নহে। ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিতবিষয় অসামান্য এক ঘটনা।[৪] যে অমিততেজা ক্ষত্রিয় রাজকুমার জীবনে বহু যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজে ও তদানীন্তন ভুবনে মহাযোদ্ধা হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃতীয় পাণ্ডব বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধৃমণ্ডল দর্শন করিয়া একেবারে পঙ্গু ও প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পরম বিষাদপ্রাপ্ত হন। তাঁহার সারথি ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সখার এই বিষাদ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভগবদ্গীতা তাহারই বর্ণনা।

১। ১৩শ অধ্যায়　　২। ১।১　　৩। ১৮।৭৬　　৪। ১৮।৭৪

সূচনা

শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন কালের একটী অত্যন্ত বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের রাজকুমারের উপদেষ্টা। এই রাজকুমার তাঁহার অতীত জীবনে বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, খণ্ড খণ্ড ভাবে শত্রু হত্যা করিয়া যুদ্ধ জয়ের পর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বিবদমান দুই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্য ও শারীরিক অসুস্থতা প্রকাশ পায়। এই যুদ্ধের উদ্যোগে এমন কি ঘটিল যে সেই ক্ষত্রিয় রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। অর্জ্জুনের এই অবস্থায় তাঁহার উপদেষ্টা হিসাবে পাঁচ শত পচাত্তর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের এই নিষ্ক্রিয়তা রোধ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশ্য শেষকালে শ্রীকৃষ্ণ সফল হইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন এবং যুদ্ধও করিয়াহিলেন।

এই ব্যাখ্যায় আমরা এই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ একটী ঐতিহাসিক ঘটনা মানিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুরূপ ক্ষেত্রে কি ভাবে উপকারে আসিতে পারে তাহার বিচার করিয়াছি – অবশ্য যতটুকু জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে লাগিতে পারে। জনসাধারণের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কোন আড়ম্বর নাই ; তাহাদের জীবন সহজ সরল and without any complications। মনে রাখিতে হইবে ইহারাই মনুষ্য সমাজের পনেরো আনা। অতএব এই সুমহান শাস্ত্র হইতে এই অতিকায় লোকসমাজ কি পাইতে পারে তাহারই এক মূল্যায়ন করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গীতার মঙ্গলাচরণের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে যে গোপালনন্দন সমস্ত উপনিষদ দোহন করিয়া এই মহান গীতামৃত দুগ্ধ সুধীদিগের (ব্রহ্মবাদিনঃ-শ্বেতা) জন্য পরিবেশন করিয়াছিলেন। তথাপি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জনগণ এই ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রেরণা ও শান্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। নিশ্চয়ই কিছু পাইয়া থাকে, নচেৎ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জনসমাজে ইহার প্রচার সম্ভব হইত না ; বিদ্বজ্জন মধ্যেই সীমিত থাকিত। এই ব্যাখ্যায় এই কিছুর একটা বাস্তব বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস করা হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে একথা ভুলিলে চলিবে না যে পার্থকে বুঝাইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন করিবার জন্য ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বিশালবুদ্ধি ব্যাসকে দিয়া মহাভারতে তাঁহার এই সকল বচন গ্রথিত করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বচন হইতে জনগণও অনুরূপ অবস্থায় অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধিসঙ্কট ঘটিলে, তাহাদের জীবনের চলার পথে যথেষ্ট পাথেয় পাইতে পারে। আর এই বৃহত্তর সমাজও সাধারণ জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্যক্ ও সুপ্রয়োগে লাভবান হইতে পারে।

যেহেতু এই ব্যাখ্যা জনসমাজের জন্য সেই হেতু গীতোক্ত শ্লোকের গূঢ় তত্ত্ব-অর্থে প্রবেশ করা হয় নাই। গীতার ভাষা সহজবোধ্য। ভাষার এই সহজবোধের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র আলোচনা করা হইয়াছে। অর্জ্জুনের উদ্দিষ্ট গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ – জীব কেবল কর্ম্ম করিতে অধিকারী, কর্ম্মফলে তাহার অধিকার নাই ; আর সেই জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন তাহার পক্ষে পরম কল্যাণকর ও চরম কর্ত্তব্য—জনসাধারণের জীবনে কর্ম্ম করিবার উপায় হিসাবে (as a study in methodology) কিরূপ সহায়তা করিতে পারে,

তাহাই বিচারের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বচন কি Ten Commandmentsএর ন্যায় Gospel জাতীয় শৈলোপদেশ, যাহা জনগণের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সুস্থ করিতে সহায়তা করে? না, ইহা এক গভীর দার্শনিক আলোচনা ও বিরাট মননচর্চ্চা, serious intellectual gymnastics? না, ইহা জীবের কর্ম্মশক্তির উৎকর্ষ ও পরাকাষ্ঠাসাধনের সর্ব্বোত্তম পদ্ধতি, সর্ব্বোত্তম কৌশলের ব্যাখ্যান—যে কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের ও সেই জাগতিক জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী জীবনের সনাতন মার্গ—a Study in Methodology for optimisation of human actions both here and hereafter?

কিন্তু পূর্ব্বসূরীরা যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে হিন্দুজাতির অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে পরম শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, (তাঁহারা) এই গ্রন্থে কেবলমাত্র জীবের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের এক প্রকৃষ্ট পদ্ধতির সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যান বলিয়া উপলব্ধি করেন। তাঁহারাও স্বীকার করেন যে এই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে মুখ্যত ব্যবহারিক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। তবে তাঁহারা ইহা আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও ইহা আদ্যন্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় পূর্ণ—এই মতে দৃঢ়সিদ্ধান্ত। ইঁহাদের মধ্যে যে সকল হিন্দুদার্শনিক পণ্ডিতগণ আধুনিক, বিশেষ করিয়া প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী, যথা শ্রীঅরবিন্দ, তাঁহাদের মতে "গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ[১]।"

১। গীতার ভূমিকা (প্রস্তাবনা)

গীতায় অধিকাংশ বাক্যই যে দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী বলিয়া নিশ্চয় করেন যে জীবের মধ্যে শুদ্ধচেতা ব্যতিরেকে শমদমাদিগুণসম্পন্ন, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" বিদ্বজ্জনও তন্নির্দ্দিষ্ট এই সকল দার্শনিকতত্ত্ব প্রথম চেষ্টায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তাঁহাদেরও উপলব্ধি করিতে সময় ও সাধনার (অভ্যাসের) প্রয়োজন এবং তাঁহারাও gradually, ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। আর জনসাধারণ তাহাদের সমাজে ও সংসারে স্থূলভাবে যাহাতে তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য ও পূর্ণ হইতে পারে তাহারও নির্দ্দেশ দেন। এ কারণ সমগ্র গীতা বিশেষ মনোযোগের সহিত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে একটী পরিষ্কার ক্রমবিন্যাস, gradation আছে। আর সেই ক্রমবিন্যাসের প্রথম ধাপের নির্দ্দেশ, জনসাধারণ ও বিদ্বজ্জনের নিম্নসারির জন্য স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন, তাহাতে তাহাদের কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠাপ্রাপ্তি (তৃতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ অধ্যায়); দ্বিতীয় ধাপে ব্রহ্ম-তথা-শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় পরিচিতি, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এবং জীবের স্থূলদেহে তাঁহার দর্শন ও প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মপন্থার বিশ্লেষণ (সপ্তম অধ্যায়—চতুর্দ্দশ অধ্যায়) এবং শেষ ধাপে এই পন্থা অনুসরণে তাঁহার "মদ্ভাবমাগতাঃ" হইয়া মোক্ষলাভ অনিবার্য্য (পঞ্চদশ-সপ্তদশ অধ্যায়)—এই নির্দ্দেশ দিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতকার সমগ্র গীতায় তাঁহার বক্তব্যের একটী সুনির্দ্দিষ্ট ও সুদৃঢ় সংক্ষিপ্তবৃত্তির (resumè and recapitulation) সন্নিবেশন করিয়াছেন।

ভূমিকা

এ কথা মানিতেই হইবে যে মহাভারতের সময় সমাজব্যবস্থা বেশ উন্নতধরণের ছিল। বিশেষ করিয়া শান্তিপর্ব্বে যে রাষ্ট্রগঠন ও সমাজ-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান কালের আধুনিক সমাজ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ এক উন্নত ধরণের সমাজ ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া সেই সামাজিক পটভূমিকায় ভগবদ্গীতার সামাজিক নির্দ্দেশগুলির মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

তবে একটী কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে গীতায় যে ধরণের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত ; individual জীব হিসাবে শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্ ও জনসাধারণ – এই তিন শ্রেণী স্বীকার করা হইয়াছে। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র – এইরূপ কোন অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাগ গীতায় করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরের আরাধনা ; কোন কর্ম্মই স্বভাবতঃ হীন বা উৎকৃষ্ট নহে। পরন্তু চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত এক সমাজসংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহার ভিত্তি গুণান্বিতকর্ম্ম। এই চারি বর্ণ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটী অপরগুলির পরিপূরক। কোন একটীকে বাদ দিয়া এই সমাজসংস্থা পূর্ণভাবে সক্রিয় হইতে পারে না এবং সেরূপ সমাজ স্বীকৃতও হয় নাই। এইরূপ পরিপূর্ণ সমাজসংস্থায় সমাজভুক্ত সভ্যেরা (members of the society) কীরূপ ভাবে নিজ নিজ কার্য্য কর্ম্ম সাধন করিবে এবং কী পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জীবের তথা সমাজের কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠা সাধিত হইবে – তাহার এক কৌশল গীতায় বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণবাসুদেব দৃঢ়ভাবে

ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করিলে সমাজে একটী বিশেষ অবস্থায় (at a point of time) সমগ্র সমষ্টিগত কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠা সাধিত হইবে। এই কর্ম্মপদ্ধতিতে optimisation of most human actions সম্ভব। অতএব গীতা কার্য্য-কর্ম্মকরণের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী সম্বন্ধে অনুশীলন বিশেষ; অন্য ভাষায় ইহা আধুনিকতম Theory of Praxiologyর পূর্ব্বাভাষ ও অগ্রদূত।

মনুষ্যজীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহা মোটামুটি শত শত ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি, a bundle of activities। "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"[১] অর্থাৎ জীব সকলের জন্ম অর্থাৎ pulsation হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্জ্জন (অর্থাৎ বিনাশ) পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যেকটী ক্রিয়াই, প্রত্যেকটী activityই কর্ম্ম; আর সমগ্রভাবে বিশেষ একটী মনুষ্য জীবন সেই সকল ক্রিয়ারই total।

প্রত্যেক উন্নত ধরণের সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এমন কোন নিয়মপদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায় কি, যাহাতে এই সকল ক্রিয়াকলাপ, শুদ্ধমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবহার নহে—জীবের সমগ্র জীবনের কর্ম্মশক্তি ফলপ্রদ ও কার্য্যকর হয়? এমন কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্ম প্রণালী কি আবিষ্কার করা যায়—যাহাতে জীবের সকল প্রকার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন সম্ভবপর হয়?

এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীরা Operations Research, Statistical Quality Control, Business Management প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মনুষ্য জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই

১। ৮।৩

সকল পদ্ধতি জীবের কার্য্যকর্ম্ম-করণের আংশিক অনুশীলন ; ইহারা মনুষ্যজীবনের সমগ্র পরিধি ব্যাপিয়া আলোচনা করে না কিংবা আলোচনা করিবার দাবিও করে না। যদি এমন কোন সর্ব্বব্যাপী কার্যপ্রণালী উদ্ভাবন করা যায় যাহা মনুষ্যজীবনের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে ফলপ্রসূ ও কার্য্যকরী করিবে—শুদ্ধমাত্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নহে, এমন কোন Master method, কর্ম্মকরণের এমন কোন সার্ব্বিক মুখ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়, যদ্দারা মনুষ্যজীবনে তাহার সামগ্রিক কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সমাজে ও সংসারে জীবের কর্ম্মশক্তির কোনরূপ অপব্যবহার, অপচয়, কিংবা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে কিয়দংশ বুদ্ধিজীবীরা মনুষ্যজীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করিয়া মানবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সম্ভাবনার গবেষণার বিষয়ের একটী পৃথক শিক্ষা-বিভাগের জন্য সচেষ্ট হন। পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ (যথা ইংলণ্ডের Von Mises এবং রাশিয়ার Slutsky) প্রচার করেন যে অর্থনীতির কিয়দংশ বিষয়বস্তুর সমাধান জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠার সম্ভাব্য বিষয়বস্তুরই সমাধান। ওই সময়ের শেষের দিকে পোলাণ্ডের পণ্ডিতগণ বলিতে থাকেন যে Discourse de la Methodsএ বিচারিত Cartesian Rules, কার্টেজিয়ান্ নিয়মাবলী মনুষ্য জীবনের সার্ব্বিক কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সম্ভাবনার প্রণালী হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহার পর Taylor, Gilbraith, Adamiecki প্রভৃতি সমাজশিক্ষকগণ শ্রমবিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানাদি ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপক হিসাবে Management Theory প্রচার করেন। এই সকল গবেষণায় একটী বিষয় পরিষ্কার হয় যে শিল্প কেন্দ্র ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মনুষ্য-জীবনে এমন অনেক field, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে জীবের

কর্মশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ ও প্রয়োজন আছে। পোলাণ্ডেও ইহা স্বীকৃত হয় এবং এই প্রয়াসের শেষরূপ Principles of Praxiology এবং এই ব্যবহারিক বিদ্যার বিস্তার কল্পে Polish Academy of Sciences এর অন্তর্গত Praxiology গবেষণাগার। যাহার উদ্দেশ্য "to study the new discipline termed Praxiology and concerned with the efficiency of actions understood as generally as possible. The principles of praxiology thus apply to industrial production, agriculure, animal breeding, transport, health service, education and schooling, public administration, administration of justice, national defence, sports, games, theatre, fine arts etc. alike."[১]

কিন্তু এই নূতন পদ্ধতির ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত Kotarbiniski মনে করেন যে Praxiologyর তত্ত্বগুলি আরো একটী ব্যাপক শাস্ত্রের অন্তর্গত; যদিও তাঁহার মতে সেই শাস্ত্র এখনো বৈজ্ঞানিক ভাবে সুসম্বদ্ধ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন"[২]

"All those concepts belong to a possibly very general theory which, like praxiology, still waits to be systematised in a scientific manner. The various generalisations belonging to that theory are currently used by us when we think of anything. That theory might be termed ontology, dialectics, general theory of objects, theory of events, first princi-

---

১। Tadeusz Kotarbinski—The Tasks and Problems of Praxiology, Polish Prospective, Warsaw, September, 1970, pp. 8,

২। Ibid pp. 20-21.

ples, or still otherwise. Its concepts include, for instance, that of organisation, interpreted as such a system of relations between the parts of a compound object and relations between the parts and the whole, which makes that object resist the forces that work to destroy it. ..It may probably be said that the rules of praxiology are based on conclusions deduced from the concepts of action and cooperation, and on the observed or deduced relationships discussed by the theory of events, relationships most concerned with organisation. They seem to be mostly rules of organisation of collective acts. Special cases of such rules consist in recommendations and warnings concerned with organisation, and hence management, of units engaged in economic activity. It is not to be wondered, therefore, that following Slutsky (1926) we interpret praxiology as a special case of a general theory of events, on the one hand and as a generalisation of economy, or to put it more precisely, of a theory of the organisation and management of human teams concerned with economic cooperation, on the other "[১]

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কৃষ্ণবাসুদেব শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্ম করিবার এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কর্ম্মপদ্ধতি, এইরূপ এক Master Method-এর বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ দেন। তাঁহার নির্দ্দেশ-

---

১। যাঁহারা এই সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে জানিতে উৎসুক, তাঁহারা Prakseologia, Warsaw, PWN, 1969 পড়িতে পারেন।

মত কাজ করিলে সমাজে ও সংসারে optimum yield সম্ভব হইবে এবং মনুষ্যজীবনে কর্মশক্তির কোনরূপ অপচয়, অপব্যবহার কিংবা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের মতে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সময় সময় দেখা যায় যে স্বকীয় কর্ত্তব্যকরণে এই নির্দ্দেশ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংহিতার কিংবা লৌকিকবিষয় শ্রবণের (established social practices and superstitions) সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। এইরূপ সংঘর্ষে সমাজে ও সংসারে জীবের কর্ম্মশক্তি হইতে optimum yield পাওয়া যায় না, মানবের কর্মশক্তির অপচয় ও ক্ষতি হয়। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে, স্বভাব-বিহিত স্বধর্মের সহিত প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্মাদির সংঘর্ষ এড়াইবার কৌশল কি? সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াইয়া সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম কি করিয়া করা যায় এবং কি উপায়ে সমাজে ও সংসারে জীবের কর্ম্মশক্তির বিন্দুমাত্র অপচয় না করিয়া optimum yield পাওয়া যায় তাহারই আলোচনা করিয়া কর্ম করিবার এক Master Method prescribe করিয়াছেন।

বহু বুদ্ধিজীবী এবং কিছু জ্ঞানীও সংঘর্ষ বাঁধিলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে পাপ হইবার সম্ভাবনায় স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকেন —কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকার কোন সার্থকতা নাই এবং তাহা যুক্তিযুক্তও নহে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া নিপুণভাবে স্বধর্ম্মপালনে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে পাপ ত হয়ই না, বরঞ্চ কৌশলপূর্ব্বক স্বধর্মাচরণে জীব optimum yield produce করে এবং সমাজ ও সংসারের বিশেষ এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় (at a point of time) সর্ব্বোত্তম লাভ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্মকরার এই কৌশল আয়ত্ত করাই জীবের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং

বর্ত্তমান সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা আয়ত্ত করিতে শিক্ষায়তনে বিশেষ শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজন। পোলাণ্ডে Praxiology গবেষণাগারে সেখানকার পণ্ডিতগণ তাহাই করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটী প্রশ্ন: কে এই স্বভাববিহিত স্বধর্ম পালন করে? জীবাত্মা, না তাঁহার আধারস্থিত স্বকীয় প্রকৃতিজাতগুণ? জীবাত্মার ভিন্ন ভিন্ন আধার তাহার স্বকীয় প্রকৃতিজাত গুণদ্বারা কর্ম্ম করে। অতিরিক্ত প্রশ্ন: এই সকল কর্ম্মের ফল কে পাইবে? আধারই নিশ্চয় তাহা ভোগ করিবে। তবে এই ভোগের একটী রীতি[১] শ্রীকৃষ্ণ নির্ণয় করিয়াছেন. তাহা অন্যথা করিয়া আধার যদি ভোগ করে, তাহা হইলে "স্তেন এব সঃ।[২] উপনিষদ্ এই আধার সম্বন্ধে বলেন;

নৈব স্ত্রী ন পুমানেব ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে।[৩]

এবং জীবাত্মা

"শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং, স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ,

স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি।"[৪]

অতএব উপনিষদের মন্ত্রানুযায়ী জীবাত্মা শরীরকে (আধারকে) আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিলেও সাক্ষাৎ ও মুখ্য ভাবে অকর্ত্তা, "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ"[৫]; সে কারণ কর্ম্মফলে তাঁহার সাক্ষাৎ কোন অধিকার নাই। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত মন্তব্য "কর্ম্মণ্যেবাধিকরস্তে মা ফলেষু কদাচন।"[৬] তিনি শুধু দৃষ্টি দিয়া[৭] বিভিন্ন আধারস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিকে ক্রিয়মান্ করিয়া সংসার চালু রাখেন; "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং দেবাত্মশক্তিম্।"[৮] সংসার ও সমাজের দিক

১। ৩।১০-১৩ ২। ৩।১২ ৩। শ্বেতা ৫।১০ ৪। কৈবল্য ১।১২

৫। ১৩।৩০ ৬। ২।৪৭ ৭। ১৩।২৩ ৮। শ্বেতা ১।৩

দিয়া ইহা একটী তথ্য (fact) কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আধার যে এক ও অভিন্ন এবং এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতি যে পরা প্রকৃতির various different facets, "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্.[১] ইহা উপলব্ধির বিষয় এবং ইহাই একমাত্র সত্য। ইহাই ভারতের ঐতিহ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এ নিমিত্ত হিন্দু সমাজের সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে গৃহস্থের নামে সংকল্প করিয়া পুরোহিত মহাশয় পূজা আরম্ভ করিলেও শেষ করেন "ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু।" আর গীতাকার বলেন,[২]

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

এ কারণ সমাজ ও সংসারে জীবের কর্ম্মকরার পদ্ধতির দুইটি দিক; বাস্তব ও অধ্যাত্ম। একটী যে অপরটীর পূরক[৩] এবং এই দুইদিকের সমন্বয়ই যে সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ জীবন, যাহার কোন ছেদ নাই, ভেদ নাই, বিকার নাই; যাহা একক ও অকৃত্রিম; তদ্ব্যতীত অন্য আর কিছুরই যে অস্তিত্ব নাই, তাহাই গীতাকার প্রমাণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।" অন্য কথায়, ইহাই প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদ।

তবে এই সকল যুক্তি অজ্ঞ দিগের জন্য নহে; শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনগণের জন্য প্রশস্ত। সে কারণ সামাজিক বিধি হিসাবে ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। তথাপিও রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষকেরা এই আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা পরিকল্পনা করিবেন এবং তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে তাঁহাদের প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ সমাজে উপযুক্ত শিক্ষা প্রসার করিয়া

১। ৯।৭ ২। ৪।২৪ ৩। ঈশা ১১-১২

জনসাধারণের মানসিক বিবর্ত্তন ও প্রস্তুতি। রাশিয়া ও মহাচীন তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সর্ব্বপ্রকার জীব কি সমপর্য্যায়ভুক্ত; এবং are all types of labour, in substance, the same? এখানেও অতিরিক্ত প্রশ্ন : যদি সকল প্রকার জৈবিক শ্রম, in substance, সমভাবাপন্ন হয় এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রমজনিত কর্ম্ম জীবকে পরমাগতি লাভে সহায়তা করে, তাহা হইলে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের source, ভিন্ন ভিন্ন জৈবিক শ্রম, কি সমপর্য্যায়ভুক্ত?

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য ৫।১৭-১৮ এবং ১৮।৪৫-৪৫ শ্লোকে পাই। তিনি বলেন যাঁহারা জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ, সেইরূপ পণ্ডিতেরাই যাহা সত্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহারাই সে কারণ নিশ্চয় করিতে পারেন যে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য নাই।[১] ইহা যে শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া সঠিক তাহাই নহে, সামাজিক তথ্য হিসাবেও একটী শুদ্ধ বলিষ্ঠ আদর্শ যাহা অনুশীলন করিয়া সমাজে ও সংসারে রূপায়ন করা প্রত্যেক সমাজনেতা ও সংস্কারকের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সমাজভুক্ত সভ্যেরা, in course of time, যথা সময়ে এই আদর্শে অনুশীলিত হইয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ আর দেখিবে না। "জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ" পণ্ডিতের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিরাও বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে তুল্যরূপ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানকালে বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে এই তুল্যরূপ দেখিতে কেবল গীতোক্ত পণ্ডিতেরাই পারেন। শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান ব্যতিরেকে সাধারণের পক্ষে এই বলিষ্ঠ আদর্শানুযায়ী চিন্তা ও পরে কাজ করা

১। ৫।১৭-১৮

সম্ভব নহে। তাঁহারা ভুলিয়া যান, আদর্শ আদর্শ! কেহই কোন অবস্থায়েই আদর্শের সমগ্র অনুশীলন করিতে পারে না ; সে কারণ কি জীব সাধারণ কোন আদর্শই সম্মুখে রাখিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইবে না? এইরূপ ধারণা বোধ হয় ভ্রান্ত ; কারণ আমরা দেখিয়াছি যে আদিম সামাজিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালে আমরা অনেক অগ্রসর হইয়াছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরো অধিক অগ্রসর হইব। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত উক্তি, জীবমাত্রই "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"[১] সর্ব্বজীবের এই তুল্যরূপই প্রতিপাদন করে।

কিন্তু এই সকল বুদ্ধিজীবীরা তাঁহাদের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে সর্ব্বজীব যে তুল্য, তাহা নিশ্চয় করে না বলিয়া দৃঢ়মত জ্ঞাপন করেন। উদাহরণ স্বরূপ মন্তব্য করেন যে শরীরযন্ত্রে বহু অংশ আছে ; যাহা পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু তুল্যমূল্য নহে। তাঁহাদের প্রশ্ন : মস্তিষ্কের সহিত হস্তদ্বয় কিংবা পাদদেশের কোন অংশের সমভাবের কোন তুলনা কি সম্ভব, না তাহা যুক্তি-যুক্ত? ইহার উত্তরে, এই সকল বুদ্ধিজীবীদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সতীর দেহচ্ছিন্ন একান্ন অংশের একান্ন পীঠের কোন তারতম্য আছে কি? কামাখ্যায় মহামুদ্রাপীঠ ও কালীঘাটের পদাঙ্গুলীপীঠের কোন তারতম্য হিন্দু-সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি করেন কি? এতদ্ব্যতীত, তাঁহাদের comparison between মস্তিষ্ক ও পাদদেশের অংশ সঠিক ভাবে প্রযোজ্য নহে। তাঁহাদের দেখাইতে ইচ্ছা করে যে, কোন একটী যন্ত্রে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সামান্যতম একটী অংশ বিকল হইলে যন্ত্রটী সম্পূর্ণভাবে বিকল হইয়া অকেজো হইয়া যায়। এতো গেল লৌকিক ব্যাখ্যা!

১। ১৫।৭

উপনিষদ এ বিষয়ে বলেন, "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্,"[১] "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্,"[২] "সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।"[৩] উপনিষদের মতে, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, আবার মহান্ হইতেও মহান। তাহা হইলে তাঁহার অংশবলিতে—যত সূক্ষ্ম হউক না কেন—সেই পূর্ণকেই বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোন তারতম্য যুক্তিযুক্ত নহে।

ভিন্ন ভিন্ন জীবের তথা-কথিত, so-called, পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য জানা গেল। এখন দেখা যাউক সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত[৪] কি? তিনি অবিচলিত ও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে, স্বধর্ম্মনিরত-ব্যক্তি যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে জীব সকলের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে।

এই মন্তব্যে দেখা যাইতেছে স্বকীয় স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিয়া মানব তাঁহারই অর্চ্চনা করে এবং অন্তে সিদ্ধিলাভ করে। সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরের আরাধনায় পরিণত হইতে পারে, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"[৫] কোন কর্ম্মই স্বভাবতঃ হীন বা উৎকৃষ্ট নহে।

১। শ্বেতা ৩।২০ ২। শ্বেতা ৪।১৪ ৩। মুণ্ডক ৩।১।৭
৪। ১৮।৪৫-৪৬ ৫। ৩।৯

এইরূপ যুক্তি হইতে যদি ইহা সিদ্ধান্ত করা হয় যে শ্রীকৃষ্ণের মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে, আদর্শের দিক দিয়া এবং পরমাগতি লাভের মাধ্যম-হিসাবে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের কোনরূপ পার্থক্য নাই, এই দিক দিয়া তাহারা সকলেই তুল্যমূল্য এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে তাহারা পাপগ্রস্ত হয় না বরঞ্চ তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে – তাহা কি ন্যায়বিচারে ভ্রান্ত ? কৃষ্ণবাসুদেবের মন্তব্যে দেখা যাইতেছে যে জীবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করিতে, পরমাগতি লাভ করিতে সমভাবে, তুল্য-মূল্য হিসাবে important, তাঁহাতে কোন তারতম্য নাই ; চাই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ।

এখন প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণের মতে যদি ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বকীয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের মাধ্যমে পরমাগতি প্রাপ্তি অতি নিশ্চিন্ত হয়, তাহা হইলে এই সকল পৃথক পৃথক কর্ম সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কি ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ ? ইহাই জিজ্ঞাসুর বিরাট জিজ্ঞাসা ।

কিন্তু পূর্ব্বসূরীরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে হিন্দুজাতির অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে পরম শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন । গীতায় নানা বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে ; মৃত্যুরহস্য, আত্মার অবিনশ্বরতা, প্রকৃতি, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের স্থান ইহাতে আছে । কিন্তু সে সব তত্ত্ব ছাড়া গীতায় আর একটী প্রধান বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । ইহা জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিবার এক সর্ব্বোত্তম প্রণালী, যাহাতে জীবের কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠা সাধিত হইবে এবং সমাজ ও সংসারে দ্বন্দ্ব, প্রতিঘাত, অসূয়া ও হিংসা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানুষের স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও শান্তি

এবং optimisation of human actions guaranteed হইবে। এই দিক দিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাহিসাবে স্বীকৃতি দাবি করিতে পারে এবং গীতাকার তাঁহার সময়ে প্রচলিত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহ ভিত্তি করিয়া জীবের জীবনযাত্রার একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এই দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিয়া গীতাবচন বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের সর্ব্বোত্তম কৌশলের ব্যাখ্যান তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যা – A Study in Methodology। এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা তিনটী খণ্ডে শেষ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে আমি এই আলোচনায় ব্যাখ্যা করিবার প্রচলিত রীতি মানি নাই। ব্যাখ্যার সাধারণ রীতি, কোন বচন আলোচনা করিতে গ্রন্থকারের সেই বচন ব্যবহারের পূর্ব্বের বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা বিধেয়; পরের বচন উদ্ধৃত করা ন্যায় ও যুক্তি-যুক্ত নহে। কিন্তু গীতা বচন বুঝিতে এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গীতা বচনের সঠিক তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে গীতা সত্যই দুইটী অধ্যায়যুক্ত – প্রথম অধ্যায়ে গীতার সূচনা এবং দীর্ঘতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের যাহা কিছু বক্তব্য তৎসম্বন্ধে সূত্রাকারে বিবৃতি। যুদ্ধক্ষেত্রে সারথি হইয়া, তাঁহার সখাকে, রথস্থিত সংমূঢ়চেতা অর্জ্জুনকে, তদানীন্তন অবস্থায় তাঁহার কি শ্রেয়: তাহা বুঝান ও বিগতমোহ করাইয়া তাঁহার বুদ্ধিসঙ্কট মোচন পূর্ব্বক স্বজনবিরোধ যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় করান। আসন্ন যুদ্ধে সূত্রাকারে উপদেশ দেওয়া সমীচীন মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ ব্যবহার করেন। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট;

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাঁহার মোক্ষমবার্ত্তা – "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।" ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভের পর আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না ; "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" কিন্তু পরে দেখিলেন যে অর্জ্জুন তাহার উপদেশের তাৎপর্য্য সঠিক ভাবে গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে পারিলেন না। সংশয়বাদীর ন্যায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদীর ন্যায় আসন্ন কালে যত অল্পে বোঝান সম্ভব সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; কিন্তু তাহাতেও দেখিলেন অর্জ্জুনের reaction, তাঁহার প্রতিক্রিয়া সুবিধাজনক ও favorable নহে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্যাখ্যানের পরম্পরায় অর্জ্জুনের প্রতিক্রিয়া বুঝিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন কি পূর্ব্বে তিনি যাহা বুঝাইয়াছিলেন তাহারও পুনরুক্তি প্রয়োজন মনে করেন। একারণ পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি পরস্পরে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপূর্ণ নহে, neither exclusive nor independent। এক অধ্যায়ের বক্তব্য অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ; তবে সমগ্রভাবে অষ্টাদশ অধ্যায়সমন্বিত এই গ্রন্থ একটী synthetic whole, একটী সুসমন্বয়ী সামগ্রিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে।

এজন্য আমার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর গীতাবচনের পরম্পরা রক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বচন বুঝিবার জন্য সমগ্র গীতাকে একটী মাত্র অখণ্ড অধ্যায় বিবেচনা করিয়াছি। আশা করি সহৃদয় ও সহমর্ম্মী পাঠকগণ আমার ব্যাখ্যার এইরূপ রীতি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশেষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনানুক্রমিক এক শব্দ-সূচী সন্নিবেশিত করিয়াছি, যাহাতে গীতোক্ত শব্দ সমূহ কোন্ কোন্ অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সহজেই নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে এবং বুঝা যাইবে কি প্রসঙ্গে একই

শব্দ (আপাতদৃষ্টিতে তথা-কথিত) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গীতাকার ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

[প্রথম অধ্যায় – ষষ্ঠ অধ্যায়]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন-পদ্ধতি।

গীতার পটভূমিকা : অর্জ্জুনের বুদ্ধিসঙ্কটজনিত মোহ : তন্নিমিত্ত স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে বৈরাগ্য : তাহা (সেই বৈরাগ্য) দূরীকরণার্থ শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পদ্ধতির ব্যাখ্যান – ইহাই আধুনিকতম Theory of Praxiology।

দ্বিতীয় খণ্ড

[সপ্তম অধ্যায় – দ্বাদশ অধ্যায়]

অবতারবাদ – কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ এবং তদ্ভক্তই যোগীশ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্ম-তথা-কৃষ্ণবাসুদেবের স্বকীয় পরিচিতি ও অর্জ্জুনের (অর্থাৎ জীবের স্থূলদেহে) বিশ্বরূপদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ – পরমাগতি প্রাপ্তির জন্য নৈষ্কর্ম্যরূপ কঠোর জ্ঞানতপস্যা অপেক্ষা বিকল্প উপায় – আত্মবিলোপ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই সহজসাধ্য এবং স্থূলভাবে এইরূপে সমাজের সর্ব্বাধিক উৎপাদন সম্ভব – optimised production is possible।

তৃতীয় খণ্ড

[ত্রয়োদশ অধ্যায় – অষ্টাদশ অধ্যায়]

সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টজীবের শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে তাহার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠালাভ এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

প্রথম বিভাগ – সৃষ্টিতত্ত্ব (ত্রয়োদশ অধ্যায় – চতুর্দ্দশ অধ্যায়) ;

দ্বিতীয় বিভাগ – সংসার, জীব এবং পুরুষোত্তম (পঞ্চদশ অধ্যায়) ;

তৃতীয় বিভাগ – সকল সৃষ্ট জীবই দৈবাসুর সম্পদবিশিষ্ট তথাপি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে জনসাধারণের জন্য তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা লাভ এবং শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনগণের জন্য মোক্ষ-তথা-নির্ব্বাণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত (ষোড়শ অধ্যায় – অষ্টাদশ অধ্যায়)।

এই গ্রন্থে প্রত্যেক খণ্ডে প্রতি অধ্যায়ের বিষয় ভিত্তিতে মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া, তাহার অন্বয় এবং অন্বয়ানুগামী বঙ্গানুবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বিবৃত সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ৩-৩৮

বিষাদ যোগ

তৃতীয় অধ্যায় ১১৮-১৭৭

কর্ম্মযোগ

চতুর্থ অধ্যায় ১৭৮-২২২

জ্ঞানযোগ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

[মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা]

প্রথম খণ্ড

[*A Study in Methodology*]

[প্রথম অধ্যায়—ষষ্ঠ অধ্যায়]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা-সাধন-পদ্ধতি।

গীতার পটভূমিকা—অর্জ্জুনের বুদ্ধি সঙ্কটজনিতমোহ—তন্নিমিত্ত স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালনে বৈরাগ্য—সেই বৈরাগ্য দূরীকরণার্থ শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতির ব্যাখান—ইহাই আধুনিকতম বিজ্ঞান : Praxiology।

প্রথম অধ্যায়

বিষাদযোগ

১·০ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ – সঞ্জয়, যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ (সন্তঃ) কিম্ অকুর্ব্বত।

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, যুদ্ধাভিলাষী আমার পক্ষের লোকেরা এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন ?

ব্যাখ্যা—ভীষ্মের পতনবার্ত্তা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে সঞ্জয়কে আদেশ করেন। এই আদেশানুযায়ী সঞ্জয় সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে বর্ণনা করেন ; কিন্তু ভগবদ্গীতা এই যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ নহে। ইহার আঠারোটী অধ্যায়ের বর্ণিতবিষয় অসামান্য এক ঘটনা। যে অমিততেজা ক্ষত্রিয় রাজকুমার জীবনে বহু যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয় সমাজে ও তদানীন্তন ভুবনে মহাযোদ্ধা হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃতীয় পাণ্ডব বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধৃমণ্ডল দর্শন করিয়া একেবারে পঙ্গু ও প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পরম বিষাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সারথি

ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে এবং কি উপায় অবলম্বনে তাঁহার সখার এই বিষাদ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, গীতা তাহারই বর্ণনা।

এক সংমূঢ়চেতা ক্ষত্রিয় রাজকুমার তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সাধারণ লৌকিক ব্যবস্থানুযায়ী কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া যে সর্ব্বনাশা এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিষম অবস্থা হইতে নিবারণ করিয়া তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। এই কাজ করিতে শ্রীকৃষ্ণকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই চেষ্টার ইতিবৃত্তিকাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মতে জীবের কর্ম্ম করিবার যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল তাহা অর্জ্জুনের মাধ্যমে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর জীব যাহাতে তাহার স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্ম পূর্ণভাবে ও সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়, তাহার এক সামগ্রিক কৌশল ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সমাজে ও সংসারে ইহা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি। It is an exposition for optimisation of most human action. It may be called a Study in Methodology.

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষকগণ কখন কখন এই প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হন এবং সাধারণ জীব ও তাহাদের জীবনে সময় সময় নানাপ্রকার বিপদ আপদের সংঘাতে ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হয়, তখন এই সকল ব্যক্তিরা অনুরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন সর্ব্ববেত্তার নির্দ্দেশ অনুশীলন করিতে এবং তাহা তাহাদের জীবনে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে। এ কারণ মনুষ্য সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীতার একটা সার্ব্বজনীন আবেদন আছে।

অকুর্ব্বত—অষ্টাদশঅধ্যায়সমন্বিত ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্ব্বে একশত চব্বিশটী অধ্যায় আছে, তাহার মধ্যে ভগবদ্‌গীতা পঁচিশ অধ্যায় হইতে বিয়াল্লিশ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে অষ্টাদশঅধ্যায় সমন্বিত ভগবদ্‌গীতা প্রায় যুদ্ধ শেষে ভীষ্মের পতনের পর প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয়ের বর্ণনা।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন: আমাদের সেনারা ও পাণ্ডবেরা কী করিয়াছিলেন? এজন্য অতীতকালসূচক বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—মহাভারতের বনপর্ব্বের[১] তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী।"

পরশুরাম এই স্থানে পাঁচটী হ্রদ খনন ও ক্ষত্রশোণিতে সেই সমুদয় পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। বেদের ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণে এই ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধাদি ও অন্যান্য পুণ্যকার্য্যে তীর্থস্মরণে এই কুরুক্ষেত্রের নাম প্রথমেই স্মরণীয় হয়।

"কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থাণ্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তীহ ॥"

এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি তপস্যা করিয়াছেন, কাজেই ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রে। এ কারণ অভিধান সমূহে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিতে কুরুক্ষেত্র বুঝায়।

১। ৮৩ অধ্যায়

১.১ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উভয় পক্ষের সেনানায়কদিগের পরিচয়

সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ – তদা তু রাজা দুর্য্যোধনঃ পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন – তখন পাণ্ডব সৈন্যদিগকে (যুদ্ধে) সজ্জিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকট গিয়া কহিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অন্বয়—আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং পশ্য। অত্র (পাণ্ডবসেনায়াং)

মহেষ্বাসা: যুধি ভীমার্জ্জুনসমা: শূরা: ; যুযুধান:, বিরাট: চ, মহারথঃ দ্রুপদ: চ, নরপুঙ্গব: ধৃষ্টকেতু:, চেকিতান:, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ: চ, শৈব্য: চ, বিক্রান্ত: যুধামন্যু: চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা: চ, সৌভদ্র:, দ্রৌপদেয়া: চ (সন্তি)। (এতে) সর্ব্বে এব মহারথা:। হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টা: (প্রধানা:) মম সৈন্যস্য নায়কা: তান্ নিবোধ (অবগচ্ছ), তে (তব) সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। ভবান্, ভীষ্ম: চ, কর্ণ: চ, সমিতিঞ্জয়: কৃপ: চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ: চ, তথা এব সৌমদত্তি: চ। মদর্থে ত্যক্তজীবিতা: অন্যে বহব: শূরা: চ (সন্তি); (তে) সর্ব্বে নানাশাস্ত্রপ্রহরণা: যুদ্ধ-বিশারদা: (ভবন্তি)।

অনুবাদ—আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহতী পাণ্ডব সেনা সজ্জিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তীভোজ, নরোত্তম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র; এই সকল শৌর্য্যশালী, মহারথ, ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ ইহাদের সেনামধ্যে সন্নিবিষ্ট। হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের যাঁহারা প্রধান ও আমার সৈন্যগণের অধিনায়ক, তাঁহাদিগকে জানুন। আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি। আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সৌমদত্তি এবং আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত এরূপ আরো অনেক বীর আছেন। ইঁহারা সকলেই বিবিধ শস্ত্রধারী ও যুদ্ধবিশারদ।

ব্যাখ্যা—তিন হইতে নয় এই সাতটী শ্লোকে মহাভারতকার পরিষ্কার করিয়া কুরুপাণ্ডবের সেনানায়কদিগের একটী সম্যক্ পরিচয়

দিলেন ও তাঁহাদের নিজ নিজ organisation-এর একটী idea দিলেন। ভাবটী এই যে, এঁদের পরিচালনায় আসন্ন মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ায় অন্যায় ও অধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিবে না, কিংবা অনিবার্য্য কারণে থাকিলেও, অত্যন্ত অল্প। এই বর্ণনা হইতে ইহা পরিষ্কার হইল। এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরে[১] মন্তব্য করিয়াছিলেন,

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

হে পার্থ! আপনা হইতে আগত, বিমুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকেন। মহামতি ভীষ্ম ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।[২] বিবদমান দুই স্বজনগোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক সংঘর্ষ এড়াইয়া একটী শুভ সামঞ্জস্য করিতে কৃষ্ণবাসুদেব আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া সকলকাম হয়েন নাই। বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুযায়ী পাণ্ডবশিবিরে স্থির হয় যে ভয়াবহ পরিণাম হইলেও স্বজনবিরোধ এক যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই অবস্থায় অর্জ্জুন যুদ্ধে স্বজনবধ নিশ্চয় জানিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত চতুর্থ আশ্রমের, ভৈক্ষ্যবৃত্তির আশ্রয় করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বুদ্ধির বিকার উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রণোদিত করেন এবং তাঁহার প্রখ্যাত মতবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়—প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিকতম কর্ম্মকরার পদ্ধতি praxiology-র বীজ বপন করেন ও সেই উত্তম রহস্য উদ্ঘাটন করেন। বর্ত্তমান কালের সমাজ-জীবনে ভগবদ্‌গীতার ইহাই সর্ব্বোত্তম অবদান।

১। ২।৩২ ২। ভীষ্মপর্ব্ব, ১৭শ অধ্যায়

১.২ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীষ্মকে রক্ষার্থে অনুরোধ

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়—ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলম্ অপর্য্যাপ্তং (ভাতি), ভীমাভিরক্ষিতম্ এতেষাম্ (পাণ্ডবানাং) ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তং (প্রতিভাতি)। হি সর্ব্বে এব ভবন্তঃ সর্ব্বেষু অয়নেষু চ যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু।

অনুবাদ—ভীষ্মরক্ষিত আমাদের এই সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত মনে হয়, অপরপক্ষে ভীমরক্ষিত তাঁহাদের সৈন্যবল পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্যশক্তি, ভীমরক্ষিত তাঁহাদের সৈন্যশক্তি অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয়। অতএব আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা—এই প্রসঙ্গে ভীষ্মপর্ব্বের ১৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য সজ্জা সম্বন্ধে সঞ্জয়ের বর্ণনা লক্ষণীয়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন অত্যন্ত সমীচীন, relevant। তিনি প্রশ্ন করেন, "সঞ্জয়, এই একাদশ অক্ষৌহিনী ব্যূহিত হইয়াছে দেখিয়াও যুধিষ্ঠির কি প্রকারে অল্প সৈন্য লইয়া ভীষ্মের বিপক্ষে ব্যূহরচনা করিলেন?" উত্তরে সঞ্জয় কহিলেন, "যুধিষ্ঠির রাজা দুর্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে বলিলেন, 'হে ধনঞ্জয় বৃহস্পতি কহিয়াছেন শত্রু সৈন্য অপেক্ষা নিজ সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত এবং অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে। অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম

করিতে **হইলে** অল্প সৈন্যকে সূচীমুখাকারে সন্নিবেশিত করিবে। আমাদের সৈন্য শত্রুসৈন্য অপেক্ষায় অল্প ; অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ব্যূহরচনা কর।' ধনঞ্জয় কহিলেন, 'মহারাজ। আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণি নির্দ্দিষ্ট বজ্রাখ্য নামে অচল ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি'। এই ব্যূহরচনা এতদূর সফল হইয়াছিল যে কৌরবদিগের যোদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের অতিগভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া ভীতিবশতঃ মলমুত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন।"[১]

অপরদিকে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার পক্ষের ভূপালদিগের সহিত চক্রব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমুদয় সেনা বিধানানুসারে ব্যূহিত ও যুদ্ধার্থে যত্নবান্ হইলে দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন, "তুমি শীঘ্র ভীষ্মের রক্ষাকারী রথসকল যোজনা করিতে ও সেনাগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। চিরাকাঙ্ক্ষিত সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমাগম উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করা ব্যতীত আর কোন কার্য্য নাই। তিনি রক্ষিত হইলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিবেন।"[২]

১.৩ ভীষ্মের শঙ্খনাদ

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

অন্বয়—(ততঃ) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য তস্য (দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং সংজনয়ন্ শঙ্খং দধ্মৌ (বাদিতবান্)।

১। ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায় ২। ভীষ্ম পর্ব্ব ১০শ অধ্যায়

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত ;
স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ।

অনুবাদ—তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেরী (রণডঙ্কা), পণব (ঢোল), আনক (নাগ্‌রা) গোমুখ (শৃঙ্গ) প্রভৃতি রণবাদ্য সকল সহসা বাজিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা—দুর্য্যোধনপক্ষীয় মহীপালগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবার অব্যবহিত পরে ভীষ্ম তাঁহাদিগকে ভাষণ দান করিয়া বলিলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামই স্বর্গ গমনের অনাবৃত দ্বার; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোক গমন কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও মৃগ ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া পরমস্থানে গমন করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বারা গৃহে প্রাণ ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম"।[১]

ভীষ্মের এইরূপ ভাষণ শুনিবার পর মহীপালগণের নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি এবং আনন্দোৎফুল্ল সৈন্যদিগের সিংহনাদ ও ভেরীধ্বনি একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।[২]

স্বীয় অভিমান ও হিংসার বশে রাজা দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকালে শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তদানীন্তন ভুবলয় হইতে সেনাসমুদয় সংগ্রহ করিলে বাল-বৃদ্ধাবশিষ্ট পৃথিবী প্রায় শূন্য হইয়া উঠিল এবং এক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ যোগ দিলেন। ফল যে কি বিষময় হইতে পারে তাহা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসকর্ত্তৃক সমর-পরিণাম বিবরণ[৩]

১। ভীষ্ম পর্ব্ব ১৭শ অধ্যায় ২। ভীষ্ম পর্ব্ব ১৭শ ও ২৪শ অধ্যায়

৩। ভীষ্ম পর্ব্ব ২য় অধ্যায়

শ্রবণ করিয়াও তাঁহার আসুরী-সম্পদসম্পন্ন পুত্রকে নিবারণ না করিয়া মহামতি ব্যাসকে কহিলেন, "হে মহর্ষে ! আমি আপনার ন্যায় স্থিতি ও বিনাশ সম্যক্ বিদিত হইয়াছি। কিন্তু সমুদয় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত, আমি ও সেই লোক মধ্যে পরিগণিত। হে মহর্ষে ! পুত্র সকল আমার বশীভূত নহে"।[১] সঞ্জয় ও তাঁহার বিবরণে বলেন, "কৌরবসেনা অসুরসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।"[২]

ইহা ইহতে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কেন ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগযোগ ব্যাখ্যান কালে মন্তব্য করেন যে,[৩]

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥

আসুর স্বভাব সম্পন্ন লোকগণ ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়; এজন্য তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই।

১.৪ পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খনাদ ও শত্রুদিগের উপর তাহার প্রভাব

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥

১। ভীষ্ম পর্ব্ব ৩য় অধ্যায় ২। ভীষ্ম পর্ব্ব ২০শ অধ্যায় ৩। ১৬।৭

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

অন্বয়—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। পৃথিবীপতে! হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ; কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (দধ্মৌ); নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (দধ্মতুঃ); পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ, সর্ব্বশঃ (সর্ব্বে এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

অনুবাদ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত প্রকাণ্ডরথে অবস্থিত হইয়া অলৌকিক দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন। বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষশঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সুভদ্রানন্দন মহাবাহু অভিমন্যু—ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অন্বয়—তুমুলঃ স ঘোষঃ (শব্দঃ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভ্যনুনাদয়ন্, ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়েৎ।

অনুবাদ—সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ—কৌরব সেনা সেই উভয় শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধ জয়-লক্ষণ বর্ণনাকালে[১] মহামতি ব্যাসদেব পরিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত থাকিলেই শুভ হয়। যোদ্ধগণ সতত প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করে, ইহাই জয়ের লক্ষণ। অন্যথা সৈন্যগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেনা সকল ভগ্ন হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিলে মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গবল (অর্থাৎ অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চারি প্রকার অঙ্গে গঠিত সৈন্য) সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না।

কৌরবদিগের যোদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।[২]

১.৫ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া অর্জ্জুনের ধনু উত্তোলন এবং শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার রথস্থাপন করিতে অনুরোধ

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥

১। ভীষ্মপর্ব্ব ৩য় অধ্যায় ২। ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায়

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩॥

অন্বয়—মহীপতে! অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (সতি) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ। অর্জ্জুন উবাচ, অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথম্ স্থাপয়। অহং যাবৎ অস্মিন্ রণসমুদ্যমে অবস্থিতান্ এতান্ যোদ্ধুকামান্ নিরীক্ষে; কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ (তথা) দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামিনঃ) যে এতে অত্র যুদ্ধে সমাগতাঃ, যোৎস্যমানান্ (তান্) অহম্ অবেক্ষে।

অনুবাদ—হে রাজন্! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া স্বীয় ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ততক্ষণ আমি এই যুদ্ধে অবস্থিত যুদ্ধার্থীগণকে দেখি; কাহাদের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে; এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতকামী যাঁহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, সেই যুদ্ধার্থীদিগকে আমি অবলোকন করি।"

ব্যাখ্যা—প্রথম দুই শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শস্ত্রপাতে প্রবৃত্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের স্বধর্ম্মানুযায়ী নিজেও যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সারথিকে বলিলেন, "উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর।" পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরের আদেশে যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য অর্জ্জুন বজ্রাখ্য নামে

অচল ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এই যুদ্ধ যে ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত তাহাতে তাঁহার তখন কোন সন্দেহ ছিল না।

ধনুরুদ্যম্য—নিজে ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যে রথস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই দুইটী শব্দতে মনে হয়, অর্জ্জুন প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদনে শত্রুকে বধ করিতে শস্ত্রক্ষেপণে প্রস্তুত। রথ একবার সেনামধ্যে স্থাপিত হইলেই হয়! শুধু তাহাই নহে, সেনামধ্যে (অর্থাৎ actual battlefield-এ) রথ স্থাপিত হইলে যদি প্রতিপক্ষ তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, সে নিমিত্ত স্বীয় ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক শত্রুর মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইয়া বাসুদেবকে অনুরোধ করিলেন।

নিরীক্ষেঽহং—অর্জ্জুন কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা মোটামুটি জানেন; কিন্তু সবিশেষ জানিতেন না। তদানীন্তন কালের যুদ্ধ practice অনুযায়ী নিয়মবন্ধন করিতে হইত। এস্থলেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। Actually যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে অপর পক্ষের সৈন্যসমাবেশের কোনরূপ সঠিক idea করা সম্ভব হইত না।[১] সে কারণ অর্জ্জুন উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া যুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ অবলোকন করিতে চাহিয়াছিলেন। কৌরবেরা তাঁহাদের আত্মীয় ও স্বজন, এবং তদানীন্তন নৃপতিগণ প্রায় সকলেই তাঁহাদের শুভার্থী। সে কারণ, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকারী কাঁহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অর্জ্জুন "নিরীক্ষণ" করিতে চাহিয়া বাসুদেবকে উপরি উক্ত অনুরোধ করেন।

১। ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায়

১.৬ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুরুসৈন্য প্রদর্শন

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ—পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—ভারত! গুড়াকেশেন (অর্জ্জুনেন) এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (সম্মুখে) সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, 'পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য' ইতি উবাচ।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন,—'হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে দেখ।'

ব্যাখ্যা—গুড়াকেশেন—জিতনিদ্রেন অর্জ্জুনেন।

সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্—সমুদয় রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্টরথ স্থাপন করিলেন। এই সমুদয় রাজগণ কাঁহারা? ভীষ্মপর্ব্ব হইতে জানা যায় সমস্ত ভুবলয় হইতে সৈন্যগণ আগমন করিয়াছিলেন। বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়া সমস্ত যুবা ও প্রৌঢ়পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইয়াছিল।[১] পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের পৃথিবীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে জানা যায় "সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বীরপুরুষ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।[২] অতএব এই যুদ্ধ বর্ত্তমান আণবিক যুগের যুদ্ধের ন্যায়

১। ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায় ২। ভীষ্মপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়

সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ, global total war এর ন্যায় বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল। গীতাপাঠ কালে এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া মনে না রাখিলে রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক যে অর্জ্জুন খণ্ড খণ্ড বহু যুদ্ধ অভিযান করিয়া সাফল্য-লাভান্তে দর্পভরে নিজের বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে কেন একেবারে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িলেন, তাহা বিচার করা সম্ভব হইবে না।

১৭ অর্জ্জুনের সৈন্য দর্শন

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

অন্বয়—অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োঃ সেনয়োঃ (মধ্যে) অপি পিতৄন্ (পিতৃব্যাদীন্), পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্ পুত্রান্, পৌত্রান্, সখীন্ (মিত্রানি) তথা শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ।

অনুবাদ—অনন্তর অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে উভয় পক্ষীয় সেনামধ্যে পিতৃস্থানীয়, পিতামহস্থানীয়, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর ও সুহৃদয়গণকে দেখিলেন।

ব্যাখ্যা—এই প্রথম অর্জ্জুন চাক্ষুষ তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুদিগকে অবলোকন করিলেন। যুদ্ধার্থে মেদিনীমণ্ডল যেন শূন্য-প্রায় হইয়া উঠিল ; কেবল বালক ও বৃদ্ধ অবশিষ্ট রহিল। এই মহান সৈন্য সমাবেশ চাক্ষুষ দেখিয়া অর্জ্জুনের এক অদ্ভুত অনুভূতি হইল।

১.৮ স্বজন ও বন্ধু দর্শনে অর্জ্জুনের বিষাদ

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥৩২॥
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৩॥
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥৩৪॥
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ (রণস্থলে) অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য (বিশেষভাবেন অবলোক্য) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ (সন্) ইদম্ অব্রবীৎ ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ—কৃষ্ণ ! যুযুৎসূন্ (যোদ্ধুমিচ্ছুন্) ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি । মে (মম) শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে ; হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (অধঃপততি) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব । কেশব ! অবস্থাতুং

চ ন শক্নোমি, মে মনঃ ভ্রমতি ইব চ, বিপরীতানি নিমিত্তানি পশ্যামি চ। আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ (অহং) বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন (কাঙ্ক্ষে)। গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং; যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং, ভোগাঃ, সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং, তে ইমা আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। মধুসূদন! মহীকৃতে কিং নু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি, এতান্ ঘ্নতঃ অপি ন হন্তুম্ ইচ্ছামি। জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—অর্জ্জুন তখন রণস্থলে উপস্থিত সেই বন্ধুগণকে দেখিয়া অত্যন্ত করুণাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন; হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু সমাগত এই আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীর কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হে কেশব! আমি আর (রণস্থলে) থাকিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজনবধে আমি শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না; হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই বা কাজ কি, ভোগেই বা কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি? কেন না, যাঁহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে মধুসূদন, ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি

ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না ; পৃথিবীরাজ্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ হইলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে?

ব্যাখ্যা—তান্ সমীক্ষ্য—সমীক্ষ্য শব্দটীর বিশেষ তাৎপর্য্য। শুধু অবলোকন নহে, শুধু চোখের দেখা নহে, বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মীয়, স্বজন ও বান্ধব। এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ হইলে তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অতীতকালে অর্জ্জুন যে সব যুদ্ধ লড়িয়াছেন, তাহাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে জীব হত্যা হইয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শত্রুস্থানীয়। রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষায় ওই সকল শত্রুবধ প্রয়োজন ; নচেৎ অর্জ্জুনের ন্যায় একজন রাষ্ট্রশাসক তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই আত্মীয়, বন্ধু ও স্বজন। এ ছাড়া, অন্যান্য সকলেই তাঁহাদের পরিচিত প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের সৈন্য। ফলে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিবেশী সর্ব্বজাতীয় মানবগণ সমবেত হইয়াছিল আর বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়া সমস্ত যুবা ও প্রৌঢ় পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইয়াছিল।[১]

কৃপয়া পরয়াবিষ্ট—এ অবস্থায় অর্জ্জুনের ন্যায় একজন রাষ্ট্র-পালকের পক্ষে এই লোকক্ষয়কারী মহাসমরে নিযুক্ত হইয়া তৎকালীন প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সমগ্র পুরুষ সমাজের হননের, গণহত্যার, genocide-এর কারণ হইয়া তিনি সামাজিক ধ্বংশের ও মিত্রদ্রোহজনিত পাপের

১। ভীষ্মপর্ব্ব ১ম অধ্যায়

পাতকী হইতে অস্বীকার করেন। আর এই গণহত্যার অনুচ্ছেদ হিসাবে চিরন্তন জাতিধর্ম ও আশ্রমধর্মের লোপ ঘটাইয়া মহাপাপ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। একারণ অর্জ্জুন অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইয়া পড়েন।

বিষীদন্—অর্জ্জুনের বিষন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি নিজে একজন পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু এবং ক্ষত্রিয় সমাজের আশ্রয় ও নির্ভরস্থল ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে না পারিলে সমবেত ক্ষত্রিয় কুলপতিরা নির্ম্মূল হইয়া যাইবেন।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি—একারণ তাঁহার শরীর অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছিল। অর্জ্জুনের এই যুদ্ধে সমগ্র বিনাশের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। ভীষ্মপর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে ভীষ্ম একা দশ দিনের যুদ্ধে দশকোটী যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় অর্জ্জুনের ন্যায় একজন রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষকের পক্ষে এই বিষাদ ও তজ্জনিত শারীরিক ক্লেদ কি ভ্রান্তিবিলাস?

বেপথুশ্চ শরীরে মে—মনে রাখিতে হইবে যে অর্জ্জুন অতিমানুষ বা অমানুষ ছিলেন না। তিনি "বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ"ও ছিলেন না। অর্জ্জুন অসাধারণ এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার, ইহা স্বীকার্য্য; তাই বলিয়া তিনি যে নিষ্ঠুর, হত্যাকারী, নৃশংস ও অত্যাচারী প্রজাপীড়ক ছিলেন—মহাভারতে তাহা কোথায় দেখা যায় না। এ কারণ এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধের পর অগণিতমৃত্যুজনিত এক শোকছবি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান কালে অর্জ্জুনের তৎকালীন মানসিক অবস্থার একমাত্র সাদৃশ্য ছিল গত ১৯৪৫ সালের ছয়জন আমেরিকান বোমারু সেনার মানসিক অবস্থা, যখন তাহারা জাপানে হিরোশিমায় সর্ব্বধ্বংসী অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শোনা যায়, পরে এই ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং এক জন যুদ্ধে নিহতদিগের অসহায় পুত্রকন্যাদিগের প্রতিপালনার্থ Chesire Home নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহারই কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। হিরোশিমা অবশ্যই লোমহর্ষণ ঘটনা; কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের নিহতের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। তথাপি অর্জ্জুন সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু না হইয়া মৃত্যুর মহাভয়ঙ্কর করাল মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিয়া সাময়িক ভাবে নিজের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হন। পরে শ্রীকৃষ্ণের সহৃদয় যুক্তিপূর্ণ নির্দ্দেশে উৎসাহ পাইয়া স্বকীয় সম্বিৎ ফিরিয়া পান ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ নিজের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালন করেন।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি—অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিপরীত ব্যাপার ঘটিলেই তাহা দুর্নিমিত্ত সূচনা করে। ভীষ্মপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহামতি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সমর পরিণাম প্রকাশকালে, তিনি অশুভ সূচক উৎপাতের উল্লেখ করেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, "হে রাজন্, এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে; দেখ, এক্ষণে ভয়প্রদ দুর্নিমিত্ত সমুদয় উপলক্ষিত হইতেছে। ···হে রাজন! মহৎ ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অর্জ্জুন ও এখানে এই সকল সম্ভাব্য উৎপাতের উল্লেখ করিলেন।

হত্বা স্বজনমাহবে—ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুজ্ঞা করেন; "জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচ কার্য্য;

অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না ; বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

অর্জ্জুন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বজনবধে তাঁহার বিষাদ ও তজ্জনিত শারীরিক অপটুতা ও মানসিক ভারসাম্যের প্রায় বিলোপ ঘটে। অথচ বাসদেবের এই যুদ্ধ-নিবৃত্তির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রদ্ধা ঘটিয়াছিল।

ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন—ক্ষত্রির ধর্ম্মানুসারে ভূপালগণ সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমনপূর্ব্বক সুখভোগ করিবেন এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে দীর্ঘকাল মহাসুখ প্রাপ্ত হইবেন। মহামতি ভীষ্মেরও নির্দ্দেশ[১] "ব্যাধির দ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম ; শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।" অতএব অর্জ্জুনের পক্ষে এইরূপ উক্তি তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার মনের উপর এমন এক অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি করে যে তিনি তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে অবহেলা করেন এবং সাময়িকভাবে তাঁহার বুদ্ধিসঙ্কট, intellectual crisis ঘটে। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার স্বভাব-বিহিত স্বধর্মপালন করাই যে তাঁহার তথা-সর্ব্বজীবের পরম কল্যাণকর ও চরম কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট করিয়াছিলেন। কি উপায়ে ও কি প্রকারে বাসুদেব তাঁহার এই প্রয়াসে সফল হইয়াছিলেন, সমগ্র গীতা তাহারই সাক্ষর। এ কারণ জীবমাত্রেই বুদ্ধিসঙ্কট ঘটিলে তাহা নিবারণ করিবার উপায় গীতায় অন্বেষণ করে। ইহাই গীতার সার্ব্বজনীন আবেদনের প্রধান কারণ।

১। ভীষ্মপর্ব্ব ১৭শ অধ্যায়

১.৯ অর্জ্জুনের মতে এই যুদ্ধ করা পাপ ও সমাজের মালিন্যের কারক

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অন্বয়—মাধব ! এতান্ (আচার্য্যাদীন্) আততায়িনঃ হত্বা অপি

পাপম্ অস্মান্ এব আশ্রয়েৎ ; তস্মাৎ বয়ম্ স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ ; হি (যস্মাৎ) স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। জনার্দ্দন! যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ ন পশ্যন্তি ; কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরা-প্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলং অভিভবতি (আক্রামতি) উত। কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ; বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাষু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। সঙ্করঃ কুলস্য কুলঘ্নানাং (কুলনাশকানাং) চ নরকায় এব (ভবতি) এষাং লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ হি পতন্তি (নরকং গচ্ছন্তি)। কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ, শাশ্বতাঃ (সনাতনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ (বর্ণধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে)। জনার্দ্দন! উৎসন্নকুল-ধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুত-বন্তো বয়ম্)। অহোবত (কষ্টম্), বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ। যদি রণে শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

অনুবাদ—হে মাধব! এই সকল আততায়ীকে বধ করিলে আমাদিগকেই পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমরা নিজেদের বান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে পারি না ; কারণ আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব? যদিও লোভে অভিভূত হইয়া ইঁহারা (দুর্য্যোধন প্রভৃতি) কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছেন না, তথাপি হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের কেন জ্ঞান হইবে না? যেহেতু কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, **ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, অধর্ম্ম অবশিষ্ট সমুদয় কুলকে আক্রমণ করে। হে কৃষ্ণ!**

অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলস্ত্রীরা ব্যাভিচারিণী হয়; হে বাষ্ণেয়! স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। বর্ণসঙ্কর কুলের এবং কুলনাশকগণের নরকেরই হেতু হয়; ইঁহাদের পিতৃকুলপিণ্ড ও তর্পণোদকের লোপহেতু ইঁহারা নরকে পতিত হইয়া থাকেন। কুলঘ্নগণের এই সকল বর্ণসঙ্কর কারক দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম) নষ্ট হইয়া যায়। হে জনার্দ্দন! আর শুনিয়াছি উৎসন্ন-কুলধর্ম্ম মনুষ্যদের চিরদিন নরকে বাস হয়; যাহাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম বিনষ্ট হয় তাদৃশ নরগণের চিরদিন নরকে বাস হয়। হায়! আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; যেহেতু রাজ্যসুখের লোভে আমরা স্বজনবধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ প্রতিকারপরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে বধ করে, আমার পক্ষে তাহা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।

ব্যাখ্যা—পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্—অর্জ্জুনের মতে এই যুদ্ধ করিলে তাঁহাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। কেন?

(ক) হত্বৈতানাততায়িনঃ. (খ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং এবং (গ) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মতে "মহৎ পাপং কর্ত্তুম্", কেন না "রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ"।

(ক) **হত্বৈতানাততায়িনঃ**—শত্রুবধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্ম। শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতনধর্ম্ম। তাহা হইলে অর্জ্জুন এই সকল আততায়ীদিগকে হত্যা করায় পাপ হইবে, এরূপ মন্তব্য কেন করিলেন? তাহার উত্তর: আততায়ী বধ পাপ নহে, ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রাদির ন্যায় গুরু এবং স্বজন ও আত্মীয়-বন্ধু বধ পাপ। মহামতি ব্যাসদেবের ও অনুরূপ মন্তব্য ভীষ্মপর্ব্বে[১]

১। ৩য় অধ্যায়

পাওয়া যায়। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচ কার্য্য। বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু সর্ব্বকালের সমাজব্যবস্থার নির্দ্দেশক মনুসংহিতা বিপরীত বিধান দেন। মনু বলেন [১], "কদাপি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হওয়া ও সম্যক্ প্রজাপালন করা ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের পরমশ্রেয়স্কর। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহ চেষ্টা না করিয়া সাম, দান, ভেদ—এই তিনটি উপায়ের যে কোন একটির প্রয়োগ বা একই কালে সকলগুলি প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষ বিজয়ে যত্নবান হইবেন।" বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ পরিহার করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাসুদেব নিজেও বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই। বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং আত্মীয় স্বজনরূপ আততায়ীবধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রেণিনির্ব্বিশেষে আততায়ীবধ সম্বন্ধে মনুর নির্দ্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন,[২]

> গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
> আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন॥
> নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
> প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি॥

গুরু, বালক বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ—যে কেহ হউক না কেন, বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহাদিগকে বধ করিতে পারে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়িবধে হন্তার কিছুই হয় না; মন্যু মন্যুতেই গমন করে অর্থাৎ ঘাতকের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা হন্যমান ব্যক্তির ক্রোধেই লীন হয়।

১। ৭।১৯৮-১৯৯ ২। ৮।৩৫০-৩৫১

শ্রীকৃষ্ণ এই ঘটনাটী অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিমায় দেখিলেও ফলতঃ অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁহার মতে[১] পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে-পলায়ন-না-করা, দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ এবং আরো বলেন,[২] স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বভাববিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ থাকে না। এ কারণ স্বধর্ম্মের দিক দিয়া বিচার করিলে অর্জ্জুনের বিচলিত হওয়া উচিত নহে যেহেতু ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।[৩]

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বেদব্যাস ও ভীষ্মের এবং শ্রীকৃষ্ণের ও মনুর মত বিপরীত দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদ জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মতে চিত্তের ভারসাম্য না হারাইয়া জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও চরম কর্ত্তব্য। সে কারণ তিনি অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন,[৪] "নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণ করিয়া যখন তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নিশ্চল ও স্থির হইবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।"

(খ) **কুলক্ষয়কৃতং দোষং**—অর্জ্জুন যে নিজে একজন রাজকুমার, রাষ্ট্রশাসন ও সমাজরক্ষা যে তাঁহার অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম তাহা তিনি কখনই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। এই যুদ্ধে যোগ দিলে তদানীন্তন কালের প্রায় সকল ablebodied persons-এর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সে কারণ কুলক্ষয় অনিবার্য্য হইবে। আর কুলক্ষয় হইলে জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম নষ্ট হইবে এবং পিতৃকুলপিণ্ড ও তর্পণোদক লোপ পাইবে। মহামতি ব্যাস ও অনুরূপ মত প্রকাশ

১। ১৮।৪৩ ২। ১৮।৪৫
৩। ২।৩১ ৪। ২।৫৩

করিয়াছিলেন।[১] "যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে নষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে।"

অর্জ্জুন একজন রাষ্ট্রশাসক ও সমাজ রক্ষক। এই লোকক্ষয়কারী মহাসমরে কুরুপাণ্ডবের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল পুরুষেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুন আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ইহার ফলে কুলস্ত্রীরা ব্যাভিচারিণী হইবেন এবং স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মিবে। শুধু তাহাই নহে, তদানীন্তন সমাজসংস্থার এক বিরাট আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা—পিতৃশাসিত সমাজসংস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়া মাতৃশাসিত সমাজে পরিণত হইবে। ইহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড ও তর্পণোদকের লোপ পাইবে এবং কুলঘ্নগণের এই সকল বর্ণসঙ্কর কারক দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে।

(গ) **মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্**—বান্ধবহিংসা ও জ্ঞাতিবধ একই পর্য্যায়ের। আত্মীয়স্বজন-ও-বন্ধুহনন দেখিতে নাই। একারণ ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাস দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা দিতে চাহিলে, তিনি কহিলেন, "হে তপোধন। আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না; আপনার তেজঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ শ্রবণ করিব"।[২]

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্—কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের কেন জ্ঞান না হইবে? এই প্রসঙ্গে মহামতি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। "হে মহারাজ! তুমি এই অনিষ্ট-নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদগণকে

১। ভীষ্মপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়   ২। ভীষ্মপর্ব্ব ২য় অধ্যায়

ধর্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। ···কাল তোমার পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ···তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম, সুতরাং কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কালদ্বারা কুপথে নীত হইতেছ ; স্বয়ং অনর্থ তোমার রাজ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"[১] তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "সমুদয় লোকই স্বধর্মসাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকগণের মধ্যে পরিগণিত। হে মহর্ষে, পুত্র সকল আমার বশীভূত নয় ; অতএব আমার মতে আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন "[২]

অর্জ্জুনের বক্তব্য, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্বার্থে এরূপ বাক্য ব্যবহার করিতে পারেন ; কিন্তু আমরা কেন অনুরূপ ব্যবহার করিব ?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই সব প্রশ্নের কোন উত্তরই দেন নাই। তিনি তাঁহার মতবাদ—গীতার সারকথা, central theme—সর্ব্বশ্রেণীর জীব যাহাতে তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পূর্ণভাবে ও সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়া সমাজে ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয় এবং তাহাই তাহার পক্ষে পরম শুভ ও চরম কর্ত্তব্য মনে করে—অর্জ্জুনের মাধ্যমে এই study in Methodology for optimisation of human operative action প্রচার করেন।

অর্জ্জুনের আর এক প্রশ্ন : "মহৎ পাপং কর্ত্তুং" কেন ? না, "রাজ্য-সুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতঃ"। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে ব্যাসদেব জ্ঞাতিবধ ও কুলধর্ম্মবিনাশকে নিতান্ত নীচকার্য্য বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। বেদ এইরূপ বধকে "অপ্রশস্ত ও অহিতকর" বলেন। অতএব অর্জ্জুনের পক্ষে এই অবস্থায় এরূপ মনোভাব প্রকাশ করা

১। ভীষ্মপর্ব্ব ৩য় অধ্যায় ২। ভীষ্মপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়

অত্যন্ত বিধেয় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে উদ্যোগপর্ব্বে[১] যুধিষ্ঠির অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "আমরা কৌরবগণকে সংহার করিয়া রাজ্য লাভ করিলে ভীষণ কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়।···কুরুবংশীয়েরা আমাদিগের জ্ঞাতি ও সহায়; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমাদিগের গুরুলোক আছেন; অতএব যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে বধ করা নিতান্ত পাপকর।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ বিচার করেন। "মহৎ পাপং কর্ত্তুম্" এর উত্তর তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারিটী[২] শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে একটী শ্লোকে দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার ব্যাখ্যা করা হইবে।

যে ক্ষেমতরং ভবেৎ—অর্জ্জুন রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক; তাঁহার মতে এই "মহৎপাপের" remedy হইতেছে অশস্ত্র ও প্রতিকারপরাঙ্মুখ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগের হস্তে হত হওয়া। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে এইরূপ মনোভাব মনুসংহিতার বিরুদ্ধে। আর শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করা যে শান্তি, সুখ ও পরমাগতি লাভের অন্তরায় সেই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য[৩] স্মরণীয়।

১.১০ অর্জ্জুনের বিষণ্ণ অন্তরে রথোপরি তুষ্ণীভাবে অবস্থান

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ – শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে

১। ৭১ অধ্যায়   ২। ২।৩১,৩৩,৩৮,৪০ ; ৪।৩৭   ৩। ১৬।২৩-২৪

(যুদ্ধে) সশরং (বাণসহিতং) চাপং (ধনুর্গাণ্ডীবং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) রথোপস্থ উপাবিশৎ।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন—শোকাকুলচিত্তে অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া রণস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে বসিয়া রহিলেন।

ব্যাখ্যা—সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ, global total war এ, গণহত্যা ও বিশ্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতি মানব সমাজের এক বিরাট সমস্যা। বর্ত্তমান কালে আণবিকসমর নিবারণে সারা পৃথিবীতে আজ যে উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা, অর্জ্জুনের মতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ছিল, সেইরূপ এক global total war, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ। ইহা মনুষ্য সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া এক প্রলয় ঘটাইবে। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা ওলট পালট করিয়া চিরন্তন জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের লোপ ঘটাইবে। অতএব এইরূপ যুদ্ধ কেবল অপরাধ নহে, শুধু crime নহে; ইহা পাপের পর্য্যায় নামিয়া গিয়াছে এবং মানব সমাজের অত্যন্ত এক জঘন্য ঘৃণার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় অর্জ্জুনের পক্ষে বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের ন্যায় এই লোকক্ষয়কারী মহাসমরে নিযুক্ত হইয়া তৎকালীন প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সমগ্র পুরুষ-সমাজের হননের কারণ হইয়া তিনি সামাজিক ধ্বংসের ও মিত্র-দ্রোহজনিত পাপের পাতকী হইতে অস্বীকার করেন। একারণ তিনি রাজকুমার ও রাজ্যপাল হইয়াও অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষান্নে পরিপোষণ করিতে[১] রাজী, এমন কি, "প্রতিকার পরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র" থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের দ্বারা হত হওয়া অধিকতর মঙ্গলজনক মনে করেন ও বিশেষভাবে শোকাকুল হইয়া পড়েন। ইহাতে অর্জ্জুনের মহানুভবতা ও মহাপ্রাণতা প্রকাশ পায়। তিনি লোভী, স্বার্থপরবশ, আত্মসর্ব্বস্ব

১। ২।৫

ছিলেন না। সর্ব্ব কর্ত্তব্যের উপর তাঁহার কর্ত্তব্য যে সমাজ ও রাষ্ট্ররক্ষা, এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই অবস্থান্তর তাঁহার বুদ্ধি বিকারের ফল বলিয়া মনে করেন। তিনি মনে করেন যে অর্জ্জুন সাময়িকভাবে এক বিরাট বুদ্ধিসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন; আর এই বুদ্ধিসঙ্কটের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বভাববিহিত স্বধর্মত্যাগ ও সমষ্টিভাবে কর্ম্মশক্তির অপব্যবহার, অপচয় ও ক্ষয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের সম্বন্ধে তাঁহার এই মত যে অভ্রান্ত, তাহা "বুদ্ধি যোগাৎ" বিচার করিয়া নিশ্চয় করেন যে ধর্ম্মযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিণাম যাহাই হউক, তাহা তাঁহার (অর্জ্জুনের) বিচার্য্য নহে। এই রূপ ধর্ম্মযুদ্ধে (যাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম) কে মরিল, কে বাঁচিল, জয় হইল, না পরাজয় ঘটিল, লাভ ও অলাভ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্বধর্ম করাই—অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া যাওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। এ যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন হত হইলেন কিংবা কুলক্ষয়জনিত সামাজিক মালিন্য ঘটিল, তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিচার্য্য বিষয় হইতেছে; একজন কৃতবিদ্য ক্ষত্রিয় রাজকুমার সমাজে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার স্বধর্ম্ম, ordained duty পালন করিয়াছেন কিনা? এজন্য কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের মহৎ-পাপের ত্রিবিধ কারণের প্রত্যেকটী মুখ্যভাবে উত্তর না দিয়া স্বধর্ম্ম-পালনের বিষয় বিশদ আলোচনা করিয়া অর্জ্জুন-তথা-জীব স্বকীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সম্পাদন করিবে ও তাহার কর্ম্ম-শক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন করিতে পারিবে, ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মকরার সেই কৌশলের এক উত্তম বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাঁহার সুপরিকল্পিত নির্দ্দেশ দেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়।

ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনের (dialogue-এর) অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায়। ইহাতে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম, গীতা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এক অসাধারণ কথোপকথন, an extraordinary dialogue। গীতা অধ্যয়ন কালে এই কথাই আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার, যাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম রাষ্ট্রশাসন ও সমাজরক্ষা; আর অপরজন শ্রীকৃষ্ণ, সেই রাজকুমারের Friend, Philosopher and Guide। আমরা দেখিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এবং তাঁহার মাধ্যমে তাঁহারই মত যে সকল লোকপাল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রশাসক "বিষমে সমুপস্থিতে" সাময়িকভাবে সংমূঢ়চেতা হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের স্বভাবজাত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে শৈথিল্য দেখান, তাঁহাদিগকে বিগতমোহ করিয়া স্বধর্ম্ম-সম্পাদন করিতে নিয়োগ করাই কৃষ্ণবাসুদেবর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণ গীতার আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কোন কাজে আসিবে কিনা তাহা বিচার্য্য। তাছাড়া, জনগণের উপযোগী নির্দ্দেশ তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে থাকিবার কথা নহে এবং থাকে ও নি। যাহা আছে, তাহা obiter dicta-র ন্যায় প্রাসঙ্গিক ও তুলনামূলক আলোচনার সময়। তবে এই প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবের কর্ম্মকরার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি ও সর্ব্ব-শ্রেণির জীব যাহাতে তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পূর্ণ ভাবে ও সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার এক সামগ্রিক কৌশলের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাই গীতার সার্ব্বজনীন আবেদনের কারণ।

দ্বিতীয়, অর্জ্জুন এক বিষম অবস্থায় পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখীত ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি মহামতি ব্যাসের মতে এই যুদ্ধ অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। তাছাড়া, ইহাও দেখিয়াছি যে কুরুপাণ্ডবের

যুদ্ধ আজকালকার global total war, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের ন্যায় গণহত্যার কারণ হইয়াছিল। এরূপ সর্ব্বনাশা অবস্থায় সাধারণ মানুষ পড়ে কিনা? যদি না পড়ে, তাহা হইলে গীতোক্ত বাণী তাহাদের অনাড়ম্বর জীবন যাপনে এবং সাধারণ বিপদ আপদে কতদূর সহায়তা করিতে পারে – তাহাও বিচার্য্য।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন বুদ্ধিজীবীরা মনে করিতেন যে গীতার এই প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করেন যে প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। গীতাকার কুরুপাণ্ডবের বহু গুণবান ও শ্রদ্ধেয় সেনানায়কদিগের নাম পাঠককে স্মরণ করাইয়া এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে কী ভীষণ রূপ লইতে পারে তাহার এক ইঙ্গিত দিলেন। তিনি এই লোমহর্ষণ বিগ্রহের এমন একটী স্বচ্ছ আলেখ্য অঙ্কণ করিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রের সমগ্র ছবিটী পাঠকের স্থূল চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে এবং পরে অর্জ্জুনের যে হতাশব্যঞ্জক করুণাময়ী উক্তি লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার এক আশ্চর্য্য সূচনা। এ বিষয় স্বীকার করিলেও তাঁহারা মনে করেন যে, যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য এই অধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। শঙ্করাচার্য্যও বোধ হয় এ কারণ এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় কিন্তু মনে হয়, ইহা এক ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম বলিতে আমরা সমগ্র ধর্মনীতি মনে করি; যাহা সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার ব্যবহার সমাজরক্ষার অনুকূল, তাহাই ধর্ম; কেবল সমাজের হানিকর কর্ম অধর্ম। অতএব ইহার অন্তর্গত রাষ্ট্রধর্ম, সমাজধর্ম, সংসারধর্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম। আহার, বিহার, শিক্ষা, বৃত্তি, উপার্জ্জন, স্বজন-পালন, শত্রুদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত ধর্ম্ম এই সামগ্রিক কর্ম্মশক্তির নামান্তর;

এজন্য কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের "মহৎপাপের" ত্রিবিধ কারণের প্রত্যেকটীর মুখ্যভাবে কোন উত্তর না দিয়া জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনের বিষয় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি, আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যান দিয়াছেন এবং সপ্তশতী সমগ্র গীতায় মাত্র বিশটী[১] শ্লোকে এই অত্যন্ত দুজ্ঞের্য় বিষয়বস্তুর বিচার করিয়াছেন।

সমস্ত প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনায় পূর্ণ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতৃগণ ভুলিয়া যান কিংবা না ভুলিলেও গীতাব্যাখ্যা কালে উল্লেখ করিতে চাহেন না যে মহাভারতীয় যুগে রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থায় বিরাট এক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল এবং তখন পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ এই বিপর্য্যয়রোধে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন যে পরবর্ত্তী যুগের বিপর্য্যয় ক্ষেত্রেও সেই সকল উপদেশ প্রযোজ্য। কারণ, ইঁহাদের মতে গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি ইহাতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মানানুযায়ী গীতা সে কারণ শুধু এক বিরাট Operational Research নহে; ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। সমাজের সর্ব্বশ্রেণির জীব যাহাতে তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পূর্ণভাবে ও সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়, সেই কর্ম্মকরার পদ্ধতির এক সামগ্রিক কৌশলের ব্যাখ্যান। It is a study in methodology for optimisation of efficient human action in the society at a given point of time। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা মুখ্যত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে গীতাবচনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন।

১। ২।১১-৩০

এই দৃষ্টিভঙ্গিমায় প্রথম অধ্যায়ের বিশেষ গুরুত্ব ; বিশেষ করিয়া আধুনিক কালে আণবিক শক্তিযুগে। আজকালকার বিশ্বে প্রায় সমস্ত সভ্যজাতি তাহাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে যে আণবিক শক্তির অধিকারী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক হইবার আশা করে, সেই আণবিক শক্তির অপব্যবহারে যে কোন সময়ে বিশ্বের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার প্রতিরোধে বা প্রতিষেধক হিসাবে এই সকল সভ্যজাতি এখনো কিছু স্থির করিতে পারে নাই। আধুনিককালের "বিষমে সমুপস্থিতে" গীতা বচন হইতে কোনরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি না ? এইরূপ অবস্থায়, কুরুক্ষেত্রে কি কারণে সর্ব্বগ্রাসী global total war হইয়াছিল এবং তজ্জনিত অপরিমেয় genocide, গণহত্যা ঘটিয়াছিল এবং সেই বিপর্য্যয়রোধে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার এক সযত্ন বিশ্লেষণের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। আর এই কারণেই সমগ্র গীতায় প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য যোগ

২.০ বিষণ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি মধুসূদনের বাণী সম্বন্ধে সঞ্জয়ের সংবাদ পরিবেশন

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ – মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণা-কুলেক্ষণম্ বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনম্) ইদং বাক্যম্ উবাচ।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, তখন কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ-আকুলনয়ন, বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই কথা কহিলেন।

২.১ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ঃ কি নিমিত্ত কশ্মল ? এই তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হওয়ার অনুজ্ঞা

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, অর্জ্জুন ! বিষমে (সঙ্কটে) কুতঃ অনার্য্যজুষ্টম্, অস্বর্গ্যম্, অকীর্ত্তিকরম্ ইদং কশ্মলঃ (মোহঃ) ত্বা সমুপস্থিতম্ ? পার্থ ! ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্ম গমঃ (মা গচ্ছ) ত্বয়ি

এতৎ ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ন ভবতি)। পরন্তপ ! ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন সঙ্কটকালে কেন মূঢ়জনোচিত, অধর্ম্মজনক এবং অযশস্কর এই মোহ তোমায় আক্রমণ করিল ? হে পার্থ ! কাতর হইওনা ; তোমার ইহা যোগ্য নহে। হে পরন্তপ ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধার্থে) উত্থিত হও।

ব্যাখ্যা—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং—এই প্রশ্নের উত্তর ত প্রথম অধ্যায়েই অর্জ্জুন দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি যে ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] কিন্তু উদ্যোগপর্ব্বে[২] ভীমসেনের মুখে সান্ত্ববাদে শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এক্ষণে নিশ্চয় করিলাম, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির ও চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্য জন্মে।"

এই প্রকার যুক্তি অবতারণা করিলে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্থাপন অযুক্তিকর বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ভীমসেনের সান্ত্ববাদে শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট বিস্ময়বোধ হইয়াছিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া, অর্জ্জুনকে এখন যেরূপ বলিতেছেন, তাঁহার (ভীমসেনের) প্রতি তখনও অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন: "কি আশ্চর্য্য। আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাকে পুরুষত্ববিহীন অনুভব করিতেছেন। আপনি মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন ; তন্নিমিত্তই আপনার মন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, মন বিষণ্ণ হইয়াছে এবং আপনি উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়াছেন, তন্নিমিত শান্তি সংস্থাপনে

১। ১।২৮-৪৪ ২। ৭৪ অধ্যায়

যত্ন করিতেছেন।…এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্ম (স্বভাববিহিত সধর্ম্ম) ও ক্ষত্রিয় কুলজন্ম বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে মনোনিবেশ করুন।"[১]

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে তিনি পাণ্ডবদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ্য ভীমসেন ও তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা, পাণ্ডবপক্ষের অন্য একজন প্রধান রণনিয়ন্ত্রককে সমানভাবে উৎসাহ দিয়া স্বধর্ম্মপালনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরম্‌ং—এই কারণে এইরূপ মোহ অনার্য্যসেবিত, (অর্থাৎ যাহারা জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম পালন করে না) অস্বর্গ্য (অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মের বিপরীত, অতএব অধর্ম্মোচিত, তথা স্বর্গের প্রতিবন্ধক) এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অযশস্কর।

বিষমে সমুপস্থিম্‌—এই শব্দ দুটী বড়ই গোল বাধাইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি অর্জ্জুনের প্রধান যুক্তি—যেহেতু কুরুপাণ্ডবের এই বিগ্রহ সর্ব্বগ্রাসী global total war, এবং ইহার অনুচ্ছেদহিসাবে চতুর্ব্বর্ণ সমন্বিত সমাজসংস্থার সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাইবে, সেহেতু এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই ধর্ম্মানুমোদিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন যে ক্ষত্রিয় রাজ-পুরুষগণ তাঁহাদের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন—ন্যায়যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথে বসিয়া রহিলেন। A complete intellectual crisis—এক অবিচ্ছেদ্য বুদ্ধিসঙ্কট। ইহাপেক্ষা আর কি বিষম অবস্থা হইতে পারে?

অতএব দেখা যাইতেছে কুরুক্ষেত্রে দুই প্রকার ধর্ম্মানুশাসনের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভীমসেন ও অর্জ্জুনের

১। উদ্যোগপর্ব্ব, ৭৪ অধ্যায়

যুক্তির পশ্চাতে মহামতি ব্যাস ও বেদের নির্দ্দেশ। আর ইহাও দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তির সহায়ক মনুসংহিতা। শ্রীকৃষ্ণের মতে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই জীবের পরমকল্যাণকর ও চরম কর্ত্তব্য। অতএব ধর্ম্মযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিণাম যাহাই হউক, তাহা বিচার্য্য নহে। অন্যথা এই স্বভাববিহিত কর্ম্ম না করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পাপভোগী হইতে হইবে। এইরূপ যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন হত হইলেন কিংবা কুলক্ষয়জনিত সামাজিক মালিন্য ঘটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইল কিনা—তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিচার্য্য বিষয় হইতেছে : ক্ষত্রিয় রাজকুমার সমাজে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার স্বধর্ম্মপালন করিয়াছেন কিনা? শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতায় স্বধর্ম্মপালনের বিষয় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। স্বধর্ম্মপালনই তাঁহার প্রখ্যাত মতবাদ। তিনি অর্জ্জুনের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—"পার্থ! পঙ্গু হইও না।" ইহা প্রথম অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকের উত্তর। সমাজরক্ষক ও রাষ্ট্রশাসকের পক্ষে "কোটি কোটি" নাগরিক হত্যার কারণ ও দর্শক হইবার পরও স্নায়ু সুস্থ রাখা স্থিতধীর পক্ষে সম্ভব হইলেও মানুষের পক্ষে, তা তিনি যতই অসাধারণ হউন না কেন, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকা প্রায় অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে আমাদের এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয় নাই—একমাত্র সাদৃশ্য, আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া হিরোসিমার ধ্বংসকাণ্ড। ইহার ফল আমাদের সকলের জানা আছে।

নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে—তোমাতে ইহা শোভা পায় না। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি জনসাধারণের নিকট সত্যই বিভ্রান্তকর। ইহার উপর বাসুদেবের "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং" মন্তব্য অধিকতর অপ্রীতিকর

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত স্মরণীয়। "যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুল্য; কেন না, উহাতে অন্য কর্তৃক অনেক প্রিয় ব্যক্তির প্রাণসংহার হইয়া থাকে। এইরূপে বিজয়ী ব্যক্তির মান,জাতি, বল এবং পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশ নিবন্ধন মহান্ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়।...সংগ্রামে অনাত্মীয় ব্যক্তিগণকে সংহার করিলেও অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। ...শত্রুগণকে সমূলে উন্মূলিত করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত নৃশংসতার কার্য্য "[১] তাহার উপর এই হত্যা যদি গণহত্যা হয় এবং ফলে সমগ্রসমাজ ব্যবস্থা ওলট পালট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার গুরুত্ব যে কত অধিক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ মতের উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম সম্পাদন করার কৌশল। অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁহার প্রখ্যাত অনুশাসন,[২]

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

১। উদ্যোগপর্ব্ব ৭১ অঃ   ২। ১৮।৪৫-৪৮

২.২ অর্জ্জুনের যুদ্ধে বিরত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ এবং যুদ্ধ করিব না স্থির করিয়া হৃষীকেশকে তাঁহার মতজ্ঞাপন

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ – অরিসূদন মধুসূদন ! অহং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি কথম্ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) যোৎস্যামি। মহানুভবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহ (ভূলোকে) ভৈক্ষ্যম্ (ভিক্ষান্নম্) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ ; গুরূন্ হত্বা তু ইহ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরলিপ্তান্) এব অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। যদ্ বা জয়েম যদি বা নঃ (অস্মান্) জয়েযুঃ, নঃ (অস্মাকং) কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ ; যান্ হত্বা ন জিজীবিষামঃ এব, তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মেয়োঃ সন্দিগ্ধচিত্তঃ) (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং মে ব্রূহি ; অহং তে (তব) শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি (শিক্ষয়)। ভূমৌ অসপত্নং (নিষ্কণ্টকং) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং (তথা) সুরাণাম্ অপি আধিপত্যং চ অবাপ্য যৎ (কর্ম্ম) মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (অতিশোষকরং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) নহি প্রপশ্যামি।

সঞ্জয়ঃ উবাচ – পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্রঃ অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা (অহং) ন যোৎস্যে ইতি উক্ত্বা তুষ্ণীং বভুব।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন, হে অরিসূদন মধুসূদন ! রণস্থলে আমি কিরূপে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিব ? (সেকারণ) মহানুভব গুরুদিগকে হত্যা না করিয়া, ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও (ভাল) শ্রেয়ঃ ; অপর পক্ষে গুরুজনদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে ইহলোকে তাঁহাদের শোণিত-লিপ্ত অর্থকামনাযুক্ত ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে হইবে। (এই যুদ্ধে) যদি আমরা (কৌরবগণকে) জয় করি, অথবা (কৌরবগণ) আমাদিগকে জয় করে, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব অধিক, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না ; কেননা যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে উপস্থিত

রহিয়াছে। চিত্তের দীনতা এবং কুলক্ষয়জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত ; যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহা আমায় শিক্ষা দাও। পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধশালী রাজ্য, এমন কি স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য পাইলেও আমি এমন কোন উপায় দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হৃষীকেশ গোবিন্দকে (শত্রুতাপন জিতনিদ্র) অর্জ্জুন "আমি যুদ্ধ করিব না" এই বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

ব্যাখ্যা—প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন তাঁহার যুদ্ধ-না-করা সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুযোগে তাঁহার যুক্তিগুলির সারমর্ম্ম পুনরুক্তি করিলেন। অর্জ্জুনের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ দিবার প্রধান অন্তরায় তিনটি[১] : (ক) রণস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয়ের বিরুদ্ধে কি করিয়া যুদ্ধ করিবেন ? (খ) এই সকল গুরুজনদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া তাঁহাদের রুধিরলিপ্ত অর্থকামনাযুক্ত ভোগ্যবস্তু কি করিয়া উপভোগ করিবেন ? এবং (গ) এতদ্ব্যতীত যুদ্ধে বহু জীবন হননের পর অবশ্যম্ভাবী বর্ণসঙ্করের ফলে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা।

এই ব্যাপারে অর্জ্জুন নিজে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়েন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, সে বিষয় নির্দ্দেশ দিতে অনুরোধ করিলেন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি মহামতি ব্যাস, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ অত্যন্ত নীচ কাজ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মনুসংহিতাও

১। ২।৪-৫

অনুরূপ মত[১] দেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ পরিহার করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবাসুদেব নিজেও বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই। নিজে দৌত্য করিয়াও অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাণ্ডবশিবিরে যুদ্ধ অনিবার্য্য হওয়ার সিদ্ধান্তে যুদ্ধপ্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এ সমস্ত অর্জ্জুনের অজানা নহে। তবে এখন এরূপ যুক্তি তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। গণহত্যা হইয়াছিল, ইহা ঠিক ; কিন্তু কোন উপায় ছিল না। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষভাবে। আর দুইটী প্রশ্নের [(ক) এবং (খ)] উত্তর ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে দেন :

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

কর্ম্ম অকর্ম্ম ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ ; এই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

এই শাস্ত্র কি ? সর্ব্বকালের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় মনুসংহিতা। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি নিজের জীবন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় না থাকিলে বাল, ব্রাহ্মণ ও স্বজনবধে কোন পাপ হয় না! আর যুদ্ধলব্ধ গজঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ণরজতাদি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সকল রাজাকে সমর্পণ করিবে।[২] শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[৩] ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মানুযায়ী "এই যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, আর জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।" অতএব যুদ্ধে

১। ৭।১৯৪-১৯৯ ২। ৭।৯৬-১০০ ৩। ২।৩৭

পাণ্ডবগণ জয়ী হইলে রাজধর্ম্মানুযায়ী তাঁহাদের যুদ্ধলব্ধবস্তুর ভোগ কদাপি দোষদুষ্ট নহে।

ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে—উদ্যোগপর্ব্বে পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য[১] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জানাইয়া দেন। তিনি বলেন, "হে মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ ও প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।"

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ—কার্পণ্য ও দোষ—এই দুইটী শব্দ অর্জ্জুনের চিত্তের দুর্ব্বলতার দুইটী পৃথক পৃথক কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। কার্পণ্য অর্থাৎ কৃপণতা, দীনতা। কেন চিত্তের এই দীনতা? গুরুবধ ও গণহত্যা। আর দোষ বলিতে অর্জ্জুন বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে এই হত্যায় সামাজিক মালিন্য ও তন্নিমিত্ত কুলক্ষয়-জনিত দোষ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

প্রথম কারণটী ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নহে, তাহা পূর্ব্বেই ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কারণের খণ্ডণে শ্রীকৃষ্ণ কোন যুক্তি দেন নাই। সর্ব্বকালেই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রিক বিপর্য্যয়ে সমাজে সম্পূর্ণভাবে ওলট পালট হইবার সম্ভাবনা এবং অতীতে বহুবার এইরূপ সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র-শাসক হিসাবে অর্জ্জুনের পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন তোলা এবং pleading করা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার উপদেষ্টা এইরূপ একটী গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যার কোন আলোচনা করেণ নাই।

১। ৭২ অধ্যায়

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্—ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় পাণ্ডবগণ সত্যই দৈবসম্পদ অধিকারী। সে কারণ এইরূপ বলিলেন।

২.৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

অন্বয়—ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ অর্জ্জুনম্ ইদং বচঃ উবাচ।

অনুবাদ- (সঞ্জয় কহিলেন) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! তখন হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় সৈন্যের মধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন :

২.৩১ আত্মার অবিনাশত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যযোগ বর্ণন

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি-র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥
অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

২.৩.১.১ মৃত্যু সম্বন্ধে লৌকিক ব্যাখ্যা

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতমর্হসি ॥২৬॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিতানাং বাদান্) ভাষসে চ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ (গতপ্রাণান্) অগতাসূংশ্চ ন অনুশোচন্তি। অহং জাতু ন আসম্ ইতি তু ন এব, (তথা) [ত্বম্ আসীঃ, ইতি চ] ন, [তথা] ইমে (পুরোবর্ত্তিনঃ) জনাধিপাঃ (রাজানঃ) [ন আসন্ ইতি চ] ন; অতঃপরম্ সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) চ ন এব। দেহিনঃ (দেহাভিমানিনো জীবস্য) অস্মিন্ দেহে যথা কৌমারং, যৌবনং, জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ [অপি] তথা, তত্র ধীরঃ (বিবেকী) ন মুহ্যতি।

কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ মাত্রাস্পর্শাঃ (তে) তু আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তিনাশশীলাঃ), (অতএব) অনিত্যাঃ ; ভারত ! তান্ তিতিক্ষস্ব (সহস্ব)। পুরুষর্ষভ ! এতে (মাত্রাস্পর্শাঃ) যং সমদুঃখসুখং ধীরং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি হি (ন অভিভবন্তি), সঃ অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)। অসতঃ (মিথ্যাভূতস্য শীতোষ্ণাদেঃ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে, সতঃ (সৎস্বভাবস্য আত্মনঃ) অভাবঃ (বিনাশঃ) ন বিদ্যতে ; তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি ; কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি। নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্নস্য) শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ (নশ্বরাঃ) উক্তাঃ। ভারত ! তস্মাৎ যুধ্যস্ব। যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যশ্চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ ; অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে। অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, ম্রিয়তে, বা ন ভূত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিতা ; অয়ম্ অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ, শরীরে হন্যমানে (অয়ং) ন হন্যতে। পার্থ ! য এনম্ অবিনাশনম্ অব্যয়ং (অক্ষয়ং) নিত্যম্ অজং বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি কং (বা) হন্তি। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় (ত্যক্তা) অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি, তথা দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি (প্রাপ্নোতি)। শস্ত্রাণি এনং (জীবাত্মানং) ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ চ ন শোষয়তি। অয়ম্ (জীবাত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্য, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ (অয়ম্) অশোষ্যঃ চ এব ; অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থিরভাবঃ), অচলঃ, সনাতনঃ (অনাদিঃ)। অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (ইতি) উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি।

[এতক্ষণ সাংখ্যযোগ অনুযায়ী ব্যাখ্যা, এখন লৌকিক ব্যাখ্যা]

অথ চ এনং নিত্যজাতং, নিত্যং মৃতং বা মন্যসে, তথাপি মহাবাহো ! ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি। হি (যস্মাৎ) জাতস্য (প্রাণিনঃ) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) ; মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে (ত্বং) শোচিতুং ন অর্হসি। ভারত ! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, (তথা) অব্যক্ত নিধনানি এব, তত্র (তেষু) কা পরিদেবনা (খেদঃ) ? কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি ; অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, শ্রুত্বা অপি চ কশ্চিৎ এনং নৈব বেদ (সম্যক্ জানাতি)। ভারত ! সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ ; তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ত্বং ন শোচিতুম্ অর্হসি।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন – (হে অর্জ্জুন) যাহারা শোকের বিষয়ীভূত নহে, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতেরা কিন্তু মৃত বা জীবিতদের জন্য শোক করেন না। কেননা, আমি যে পূর্ব্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে ; তুমিও যে ছিলেনা তাহাও নহে ; এই রাজগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে ; এবং পরে আমরা যে সকল থাকিব না তাহাও নহে। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয় জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে মূঢ় হন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখের কারণ ; ইন্দ্রিয়ও বিষয়সংযোগজনিত শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট (অর্থাৎ কখন উৎপন্ন হয়, আবার কখন বিনষ্ট হয়), সুতরাং অনিত্য ; উহা সহ্যকর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সকল সুখদুঃখ যে ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য।

অনিত্য বস্তুর স্থায়িত্ব নাই ; নিত্যবস্তুর বিনাশ নাই ; তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ নিত্য ও অনিত্য উভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। (অতএব) যিনি (পরমাত্মা) এই দেহাদি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই ; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষের বিনাশসাধনে সমর্থ নহে। নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন) ইন্দ্রিয়াতীত দেহীর এই দেহ নশ্বর বলিয়া খ্যাত। হে অর্জ্জুন! অতএব যুদ্ধ কর। যিনি ইঁহাকে (জীবাত্মাকে) হন্তা মনে করেন এবং যিনি ইঁহাকে হত মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই জানেন না – এই জীব-আত্মা হনন করেন না বা হতও হন না। ইঁহার কখনও জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইঁনি অজ (জন্মশূন্য), নিত্য (হ্রাস-বৃদ্ধি শূন্য), শাশ্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ (সনাতন) ; শরীর বিনাশ হইলেও (ইঁনি) বিনষ্ট হন না। হে পার্থ! যিনি ইঁহাকে নিত্য, অজ, ক্ষয়রহিত, অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে বধ করেন, কিরূপে কাহাকেই বা বধ করান? যেমন মানুষ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহে সংগত হন। অস্ত্র সকল ইঁহাকে ছেদন করিতে পরে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে পচাইতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। কেন না, এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য এবং স্থির, অচল ও সদাবর্ত্তমান্। ইঁহকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য (রূপান্তররহীন) বলা হয়। অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিলে অনুশোচনা আসে না।

[এতক্ষণ সাংখ্যযোগ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিলেন, এখন লৌকিক ব্যাখ্যা] হে মহাবাহো! যদি জীব (আত্মা) সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নহে ; কেন না জাত

ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃতব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য ; অতএব এ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে। ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল ; ধ্বংসের পর আবার অপ্রকাশ হইয়া থাকে ; কেবল জন্মমরণের মধ্য-সময়ে প্রকাশিত হয় ; অতএব তদ্বিষয়ে শোক কি ? কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ (ইঁহার বিষয়ে) বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না। হে ভারত! জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা—প্রহসন্নিব—মাত্র অত্যল্পকাল পূর্ব্বে অর্জ্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণ অন্তঃকরণে তাঁহার চিত্তের অবসাদের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছিলেন,[১] "এমন কি স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য পাইলেও আমি এমন কোন উপায় দেখিতেছি না যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে," এবং "আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া মৌনী হইয়া স্তব্ধ হইয়া রথের উপর বসিয়া রহিলেন[২]। এই পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে এবং তাঁহার মাধ্যমে জীবমাত্রকে মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার লোকোত্তর ব্যাখ্যান শুনাইয়াছিলেন।

মৃত্যু মানুষের কাছে পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আবহমানকাল হইতে মানুষ প্রয়াস করিয়া আসিতেছে। As a matter of fact, Death is the greatest challenge to human intellect। আর এই পরম রহস্যময় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সহজভাবে হাসিতে হাসিতে ব্যাখ্যা করিলেন। কারণ, পৃথিবীতে

১। ২।৮ ২। ২।৯

মনুষ্যজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অতিনিশ্চিত যে ঘটনা, সেই মৃত্যুকে অহর্নিশি মানুষ দেখিতেছে, মৃত্যুর বিষয় মানুষ শুনিতেছে এবং তাহার effect অনুভব করিতেছে; তথাপি এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় মানুষ কেন বিচলিত হয়, তাই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া অর্জ্জুনের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই মৃত্যু হইতে বিষাদ ও তজ্জনিত অবসাদ যে তাঁহার উপযুক্ত নহে, তাহাই তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। জাতমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত, অপরিহার্য্য বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ শোক করা শোভা পায় না, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া একেবারেই সাজে না। জীবহত্যায় দেহের বিনাশ, দেহস্থিত জীবাত্মার বিনাশ নাই। তিনি অবিনাশী। অতএব অর্জ্জুন যে গণহত্যার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) যুক্তিতে টিকিতে পারে না।

ইহা কিন্তু সাধারণ বিচার হইতে পারে না। কারণ সমাজে ও সংসারে জন্ম ও মৃত্যু অত্যন্ত এক কঠোর বাস্তব ঘটনা। সংসারে জন্ম হইলে যেমন জীবের আনন্দ, মৃত্যুতে তেমনই তাঁহার দুঃখ ও বিষাদ এবং সংসারে নানাপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি, অনেক সময় যাহা অপূরণীয় থাকিয়া যায়। আর জনসাধারণ এই সকল ক্ষয়ক্ষতি মানিয়া লয় ও আত্মীয়, বন্ধু ও স্বজনের মৃত্যুতে বিয়োগব্যথা সহ্য করে। তাহারা জানে অনাদিকাল হইতে আজপর্য্যন্ত মৃত্যুর প্রতিষেধক হিসাবে কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই; মহান্ কালই একমাত্র ভরসা। শ্রীকৃষ্ণের এই লোকোত্তর ব্যাখ্যা জনসাধারণকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে কিনা তাহা সন্দেহ এবং অপাতদৃষ্টিতে ইহা তাহাদের পক্ষে অবাস্তর বলিয়া মনে হয়।

প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে—"তুমি প্রজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ, অথচ যাহারা শোকের বিষয়ীভূত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ।"

শ্রীকৃষ্ণের এই বিষয়ে বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদি। প্রজ্ঞা বলিতে কি বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] ইহা হইতে বুঝা যায়, যে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি similar বিষয়সমূহ যাহার সহজদিক ছাড়া আর একটি দুর্জ্ঞেয় দিক আছে, যাহা সাধারণের জন্য নহে; কেবল শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনের জন্য — ইহা অর্জুনের মাধ্যমে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। একারণ আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা দুইটী পৃথকস্তরে করিয়াছেন; প্রথমে, সাংখ্যদর্শন ভিত্তি করিয়া এগারো হইতে পঁচিশ শ্লোকে তাঁহার ব্যাখ্যান শুনাইয়াছেন। পরে ছাব্বিশ হইতে আটাশ শ্লোকে মৃত্যুর বিষয় একটী লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যাহাতে জনসাধারণও এই অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে একটী অত্যন্ত গুরুতর বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এছাড়া ইহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে যাহা বিষয়ী লোক সকলের ব্যবহৃত উপদেশস্বরূপ। এমন কি লোকনিন্দাভয়ের প্রসঙ্গও আছে, ইহাকে কোন মতেই ধর্ম্ম বলা চলে না। একারণ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়া যে সকল শ্লোকে "লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ" দেওয়া হইয়াছে — তাহা প্রক্ষিপ্ত।

এরূপ চিন্তাধারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। ইঁহারা ভুলিয়া যান কিংবা না ভুলিলেও মানিতে চাহেন না যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একজন বিশিষ্ট

১। ২।৫৫-৬১, ৬৮

রাষ্ট্রশাসকের Friend, Philosopher and Guide। রাষ্ট্রশাসনে ও সমাজরক্ষাব্যবস্থায় শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান ব্যতীত যে অতিকায় লোকসমাজ আছে—তাহাদেরও সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সমান দায়িত্ব। ইহারা যাহাতে সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে পারে, রাষ্ট্রশাসন ও সমাজব্যবস্থা তদনুরূপ হওয়া উচিত। একারণ শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানদিগের প্রতি তাঁহার প্রখ্যাত অনুশাসন,[১] "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্"।

একারণ শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে[২] ভাগ করিয়াছেন,—শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্ ও জনসাধারণ। ইহাদের প্রকৃতি পৃথক, সুতরাং জীবনযাপন ও কর্মকরার পদ্ধতিও পৃথক। জীবসম্বন্ধে এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ মনে রাখিয়া গীতা পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে গীতায় যে সকল পারস্পরিক বৈষম্য দেখা যায়, তাহার মীমাংসা সহজ হইবে এবং দেখা যাইবে যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা একটী synthetic whole; ইহা একটী সুসমন্বয়ী সামগ্রিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। গীতাবচনে আলোচনার যে ভিন্ন ভিন্ন level দেখা যায় এবং অত্যন্ত baffling বলিয়া প্রতীয়মান হয়—এই শ্রেণীবিভাগ এবং তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ তাহারই কারণ। একটু মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অনুজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের জন্য—সকল শ্রেণীর জন্য নহে।

এ বিষয় পরে আরো বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ—পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতদের জন্য শোক করেন না। কেন করেন না, কারণ মৃত বা জীবিতদের মধ্যে মূলগত

১। ৩।২৬ ২। ৩।১৫-১৭

কোন পার্থক্য নাই। যেমন একই জীবের শৈশব, কৌমার, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সে সেই নির্দিষ্ট জীব, কেবল রূপের ও অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে ; সেইরূপ পণ্ডিতগণ মনে করেন জীবের মৃত অবস্থাও তাহার রূপের ও অবস্থার পার্থক্য। তাহার যে মূল— যাহাকে সাধারণ ভাষায় জীবাত্মা বলা হয়, প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। আর এই জীবাত্মা পরমাত্মার এক সনাতন অংশ যাহা "জীবভূতঃ সন্ প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি",[১] জীবলোকে জীব হইয়া প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে (এই দেহে) আকর্ষণ করে। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে বলিলেন,

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥

আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না, এমন নহে ; তুমি যে ছিলেনা, তাহাও নহে ; আর (তোমার সম্মুখে যে রাজাগণ সমবেত হইয়াছেন, যুদ্ধে যাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে) এই রাজগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে ; এবং ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না তাহাও নহে। অন্য কথায়, in other words, আমি, তুমি ও এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী ; বর্ত্তমান জীবন ধ্বংসের পর সকলেই থাকিব ও থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন ?

ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি—এ কারণ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তিতে (অর্থাৎ মৃত্যুতে) বিবেকী ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না। এখানে লক্ষণীয়, ধীর অর্থাৎ জ্ঞানীব্যক্তি—জনগণ নহে, মূঢ় হয়েন না। অতএব বিশ্লেষণ

১। ১৫।৭

করিলে দেখা যাইবে, দশ হইতে পঁচিশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের জন্য নহে। শুদ্ধচেতাও বিদ্বজ্জনের জন্য। আর জনগণের জন্য তাঁহার লৌকিক ব্যাখ্যা ছাব্বিশ হইতে আটাশ শ্লোকে সন্নিবেশিত।

মাত্রাস্পর্শাস্তু—রূপরসাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই শীত, গ্রীষ্ম, সুখদুঃখ প্রদান করে। অর্থাৎ দেহস্থিত প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখ ভোগ করে। বিদেহীর সে কারণ কোন দুঃখকষ্ট নাই। অতএব—

তান্‌ তিতিক্ষস্ব—যতদিন দেহ থাকিবে, ইহাদের সহ্য করিতে হইবে। দেহাতীত হইলে আর এই সকল সুখ দুঃখ থাকিবে না। সুতরাং ইহারা উৎপত্তিনাশশীল এবং সে কারণ অনিত্য, অল্পকাল-স্থায়ী। অতএব দেহস্থিত দেহীর, দেহধারণকালে, ইহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর নহে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে সোঽমৃতত্বায় কল্পতে—এই সকল অনিত্য সুখদুঃখ যে ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই মোক্ষ-প্রাপ্তির যোগ্য। এখানে "অমৃতত্ব" শব্দটী বিশেষ গোল বাধাইয়াছে। এ যাবৎ যুদ্ধ করা যে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল; কারণ যুদ্ধ না করিলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের ন্যায্য অংশ কোনমতেই পাইবেন না। দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও ইঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় দিবেন না। যুদ্ধে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও গণহত্যা হইবে, সে কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে এবং সে আলোচনার বিশেষ স্থানও আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই আলোচনায় "অমৃতত্বের" স্থান কোথায়?

এই প্রসঙ্গে গীতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যুদ্ধে অন্যায়কারী আততায়ীকে হনন করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করা যাঁহার কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম সেইরূপ একজন ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় রাজকুমারের যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী গণহত্যায় বিষাদে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্যপালনে ও স্বধর্ম্মাচরণে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থাই গীতার পটভূমিকা। আর এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণবাসুদেব কিভাবে ও কি উপায়ে তাঁহার সখা অর্জ্জুনকে তাঁহার শারীরিক অবসাদ ও মানসিক ভারসাম্যের প্রায় সম্যক্ বিনাশ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে তাঁহার স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্ম সম্পাদনায় উদ্দীপনা ও শক্তি যোগাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় করাইয়াছিলেন, তাহাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার পশ্চাতে মহাভারতকারের আর একটী উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ একই পরিবারের বিবদমান দুই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কলহ ভিত্তি করিয়া জীবনের পরম ও চরমতত্ত্ব (ultimate reality) সম্বন্ধে metaphysical আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে তাঁহার স্বকীয়মত প্রতিষ্ঠা করেন। অর্জ্জুনের ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত। শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা জীবনদর্শনের পরম ও চরম তত্ত্ববিষয়ে—যাহা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া মনুষ্যজীবনের সর্ব্বকালের সকলপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ-জনিত অবসাদ ও ভারসাম্যের অভাব দূর করিয়া শাস্ত্রসমূহের পট-ভূমিকায় সৎ-ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া এই সব অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে এবং জীবকে স্বচ্ছন্দে ও মানসিক সাম্যের সহিত শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিতে সাহায্য করে এবং পরিশেষে, যাঁহা হইতে জীব সকলের উৎপত্তি, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে এবং অন্তিমে পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ (অমৃতত্ব) লাভ করিতে পারে। এ কারণ অমৃতত্ত্বের আলোচনা।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্—"যে আত্মা যুদ্ধে হত হইবেন বলিতেছ, বস্তুতঃ তিনি অবিনাশী ও তাঁহার দ্বারা এই সকলেই ব্যাপ্ত।" এই শ্লোকেই প্রথম আত্মাকে (ক) অবিনাশী, (খ) সর্ব্বং ততং, সর্ব্বব্যাপী ও (গ) অব্যয় বলা হইল। লক্ষণীয় যে এই শ্লোকে "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে "তৎ" (তদ্বিদ্ধি) "ইদম্" (সর্ব্বমিদং ততং) এবং "অব্যয়স্য" (বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি) এই তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পর পর শ্লোকে ইহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উক্ত করা হইয়াছে, যথা নিত্য, অজ, শাশ্বত, পুরাণ, সর্ব্বগত, স্থানু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য। আর এই সব বৈশিষ্ট্য থাকায় ইঁনি হনন করেন না বা হতও হন্ না। ইঁহার মৃত্যু নাই, উপচয় ও অপচয় নাই; ইঁনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য অশোষ্য। আর ইঁহার যে আধার ও আশ্রয় এই দেহ, তাহা হত হইলেও ইঁনি হত হন না।

এই পনোরোটী শ্লোকে (১১-২৫) গীতার প্রথম প্রধানতত্ত্ব—আত্মার অবিনাশিতার সম্বন্ধে প্রচার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বিচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কার্য করিবার পদ্ধতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যাহাতে জীব তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়। এই কর্ম্ম প্রচেষ্টার প্রথম বাধা মৃত্যু। একারণ সর্ব্বপ্রথম মৃত্যুসম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখাইলেন, ইহা এক মানসিক ভ্রান্তিবিলাস। ইহাতে জীবের মানসিক কোন ভারসাম্য নষ্ট হওয়া উচিত নহে এবং জীবের তাহার নির্দ্ধারিত স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য। ইহাতেই optimisation of human actions সম্ভব।

এই অবিনশ্বরত্ব তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ্নির্ভর। কঠোপনিষদে[১]

১। ১।২।১৮-২২

যম-নচিকেতা সংবাদে যম লৌকিক মৃত্যুর ব্যাখ্যা করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সংক্ষেপে ইহার পুনরুক্তি করেন এবং এ বিষয় তাঁহার আলোচনা অভিন্ন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ভাষাও অনেক স্থলে অনুরূপ।

উপনিষদ্ বলেন—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং, হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো, নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

আর গীতা বলেন,[১]

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

উপনিষদ্ বলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

আর গীতা বলেন,[২]

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

উপনিষদ্ আরো বলেন,

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

১। ২।১৯ ২। ২।২০

আত্মার মৃত্যু আছে কিনা সে বিষয়ে উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল। দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণের মত ও উপনিষদের মন্ত্র প্রায় অনুরূপ। এমন দেখা যাউক, আত্মার অন্যান্য যে সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে উপনিষদ্‌ তৎসম্বন্ধে কি বলেন। এখানেও প্রায় অনুরূপ উক্তি ও বচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপনিষদ্‌[১] বলেন—

ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌॥

অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী—(পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া) নূতন শরীরে (আত্মা) সংগত হন। বিশেষ একটী দেহে আবদ্ধ থাকিলে আত্মার সম্বন্ধে যে সব বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে ছেদ পড়ে। যথা, আত্মা সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী। একটী শরীরে আবদ্ধ থাকিলে তখন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া সম্ভব নহে।

উপনিষদের মন্ত্র-উদ্গাতা ঋষিরা ইহা জানিতেন। সে কারণ সাধারণের বুঝিবার জন্য একটী বিশেষ শরীরস্থ আত্মাকে জীবাত্মা নামে খ্যাত করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও এই জীবাত্মাকে[২] স্বীকার করিয়া তাঁহার

১। শ্বেতা ৪।১০, ৪।১৪, ৬।১১-১২ ২। ১৫।৭

এক সংজ্ঞা দেন ও তাঁহার আধার (দেহ) ত্যাগের সময় তাঁহার যাহা নিত্যকাজ সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন :

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ—তাহা হইলে এই জীবাত্মা পরমাত্মারূপে নিত্য ও সনাতন হইলেও সর্ব্বগত হন না এবং স্থির ও অচল থাকেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আধার গ্রহণ করেন।[১] এ কারণ সাধরেণের পক্ষে ইহা বুঝিতে বিশেষ গোল বাঁধে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধ মনে হইলেও বিশেষভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে কোন বৈষম্য বা বিপরীতভাব নাই। জীবাত্মাও যিনি, পরমাত্মাও তিনি। ইঁহারা পৃথক নহেন। ভারতীয় ঋষিরা আকাশ অবলম্বন করিয়া একটী রূপকের সাহায্যে এই গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে তাঁহাদের যুক্তি বঙ্কিমবাবুর ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম। "বহু সংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছু মাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক হইলেও জাগতিক আত্মার (পরমাত্মার) অংশ; দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক (পরম) আত্মায় বিলীন হয়।"[২] অতএব জীবদেহস্থিত আত্মা এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন।

১। ৪।৫ ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃঃ ৫২

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে — ইঁহাকে (এই আত্মাকে) অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য (বিকারহীন অর্থাৎ রূপান্তরহীন) বলা হয়। ইহাও উপনিষদের মন্ত্রের অনুরূপ।

উপনিষদ্[১] বলেন,

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং, শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং, বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥

আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচর ও অরূপ হন, প্রশ্ন হইতেছে, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ কি করিয়া ইঁহার ধারণা করিয়া মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করিবে এবং মৃত্যুজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা সহ্য করিবে ?

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্—এ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন। তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী ; তিনি জানিতেন যে এ যাবৎ পনেরোটী[২] শ্লোকে মৃত্যু-বনাম-আত্মার অবিনাশত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিগুণসম্পন্ন বিদ্বানরাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তাঁহাদের বাহিরে সমাজের অতিকায় জনগণ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম নহে। তাহাদের জন্য সে কারণ ছাব্বিশ হইতে আটাশ – এই তিনটী শ্লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে লৌকিক ও সহজ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন,

"যদি জীব নিত্য জন্মায় ও নিত্য মরে" মনে কর, হে মহাবাহো ! তাহা হইলে তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না। কারণ জাত প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের (পুনঃ) জন্মও নিশ্চিত। (ইহা অতি সাধারণ ব্যক্তি অহরহ সমাজে ও তাহার সংসারে দেখিতেছে)। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী বিষয়, তাহাতে তোমার শোক করা উচিত নহে। হে ভারত, ভূত (জীব) মাত্রই জন্মের

১। কৈব্য ১।৬ ২। ২।১১-২৫

পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকতক জন্মগ্রহণ করিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর পুনরায় চক্ষুর অন্তরালে যাইবে, অতএব তখন আর তজ্জন্য শোক বিলাপ কি?

ইহার পর এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় মোক্ষমবার্ত্তা শুনাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আত্মা অবিনাশী হইলেও এবং পণ্ডিতব্যক্তিরা মৃতব্যক্তির জন্য শোক না করিলেও আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয়; তাঁহারা মৃত্যু-বনাম-অবিনাশী আত্মাকে আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবশতঃ তাঁহাদেরও এই ভ্রান্তি। এ কারণ আবার বলি, Death is the greatest challenge to human intellect.

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্—আত্মার অবিনাশত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা কৃষ্ণবাসুদেব বলিলেন, এই শ্লোকে তাহার উপসংহার:

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

হে অর্জ্জুন। সকলের দেহে এই দেহী (আত্মা) সর্ব্বদা অবধ্য, অতএব তোমার এই সকল জীবের জন্য শোক করা উচিত নহে।

মৃত্যু বলিতে সাধারণে বুঝে যে এই স্থূল শরীর তাহাদের আর কোন কাজে আসিবে না। শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও সমাজ ও সংসারের স্বল্প কাজে আসে, তথাপি আত্মীয়স্বজনগণ সেই জরাগ্রস্ত শরীরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যতদূর সম্ভব সেই দেহকে স্বস্তিতে রাখিতে চেষ্টা করে এবং সংসারে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে ব্যাধিগ্রস্ত দেহ দীর্ঘকাল আত্মীয়স্বজনের সেবা ভোগ করিয়া জীবিত থাকে। পরে একদিন জীবের এই দেহ শেষ হইয়া যায়। এই শেষ-হওয়াই জনগণের নিকট মৃত্যু।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে এই শেষ-হওয়া জীবের জীবনে শৈশব-কৌমাররূপ আর এক নবীন অবস্থা। ইহা বুঝিতে সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়, কারণ শৈশব হইতে কৌমার তথা প্রৌঢ়ত্বে স্থূলশরীরের পরিবর্ত্তন হইলেও, তাহার আকৃতির এমন কোন আমূল পরিবর্ত্তন হয় না, যাহাতে সেই জীবকে চিনিতে কোনরূপ অসুবিধা হয়। মৃত্যুর পর শরীরকে হয় দগ্ধ করা হয়, না হয় মাটীর নীচে চাপা দেওয়া হয়, না হয় অন্য কোন ভাবে এই নষ্টদেহকে সংসার হইতে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই দেহ আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আজকাল এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আত্মীয়স্বজন দৃষ্টির বহুদূরে দেশান্তরে বসবাস করে; সেখানে কিন্তু তাহাদের বিষয় শোনা যায়। অপর পক্ষে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাহিরে জীব চলিয়া যায়। অতএব মৃত্যুর অর্থ শেষ। সেকারণ জনসাধারণের শোক দুঃখ ও বিয়োগব্যথা। আর ইহার প্রতিষেধক মহান্ কাল ও সহনশীলতা!

মৃত্যু সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা কিন্তু সনাতন-তথা-হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে গীতায় আত্মার যে অবিনশ্বরতা তত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ্ নির্ভর। উপনিষদ্[১] বলেন,

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

এই আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এই আত্মাতে ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তি বার বার জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

১। কঠ ২।১।১১

স্থূলভাবে আমরাও এক ভেদ লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে,"[১] শরীর বিনাশ পাইলেও, আত্মা বিনষ্ট হন না। শ্রীকৃষ্ণও ভেদ দেখাইয়াছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিয়াছেন যে এই ভেদ তখনই দৃষ্ট ও অনুভূত হয় যখন জীব সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে বিশেষ এক আধারে ধরিয়া রাখিতে চাহে। সর্ব্বব্যাপী আকাশকে একটি বিশেষ ঘটের মধ্যে দেখিলে যেমন ঘটাকাশ – তেমনি সর্ব্বগত আত্মাকে একটা বিশেষ শরীরমধ্যে ধরিয়া রাখিলে তাহা সীমিত আত্মা বা জীবাত্মা; আসলে কিন্তু দুই-ই এক। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঘটস্থিত আকাশের যেমন বিনাশ হয় না, তেমনি শরীর নষ্ট হইলে শরীরস্থ আত্মারও বিনাশ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন।

উপনিষদ তথা শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের প্রশ্ন, ভস্মীভূত দেহের continuity প্রমাণ সাপেক্ষ। ইহার উত্তর, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এক নহে; আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের ভিত্তি আরো দৃঢ়সংস্থাপিত। উপনিষদ্ এই ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন ?[২]

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

তাহা (এই আত্মা) অতি সূক্ষ্ম হেতু অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ এবং গহন। প্রাকৃতপদার্থের জ্ঞানদ্বারা ইঁহাকে জানিতে পারা যায় না। এই আত্ম-পদার্থ বুদ্ধিরূপগুহাতে উপলব্ধ হইয়া থাকেন, ইঁহাকে জানিতে হইলে (গহ্বরস্থিত) বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। যে ব্যক্তি

১। ২।২০, কঠ ১।২।১৮ ২। কঠ ১।২।১২

এই আত্মাকে অধ্যাত্মযোগের শিক্ষার দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি হর্ষ ও শোকাদি অতিক্রম করিয়া থাকেন।

ইহার পর আরো পরিষ্কার করিয়া উপনিষদ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন ;[১]

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥

(আত্মা যদিও দুর্জ্ঞেয় পদার্থ, তথাপি সম্যক্‌ উপায় দ্বারা সুজ্ঞেয় হন, এ কারণ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে) এই আত্মা বহু বেদাধ্যয়ন দ্বারা অপ্রাপ্য। মেধা (শাস্ত্রার্থ ধারণা শক্তি) দ্বারাও জ্ঞেয় নহেন, এবং বহু বেদশ্রবণ দ্বারাও পরিজ্ঞেয় হন না। (কিন্তু সাধক) যে আত্মাকে বাসনা করেন, সেই আত্মাদ্বারাই এই আত্মা জ্ঞেয় হন। কিরূপে আত্মা লভ্য হন, (তাহা বলা হইতেছে) যাঁহারা আত্মকামী, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আত্মা স্বীয় দেহ (অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ) প্রকাশ করেন।

সমগ্র গীতায় সপ্তশত শ্লোকের মধ্যে মাত্র বিশটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরহস্য ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি মৃত্যু কি এবং তাহার সহিত আত্মা ও স্থূল শরীরের কি সম্বন্ধ তাহা সবিশেষ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে বিশেষভাবে লাভবান হয় কিনা, তাহাতে সন্দেহ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাণী সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া শুধু ভারতে নহে, সারা বিশ্বে বিয়োগব্যথায় সান্ত্বনা দেয় ও মৃত্যুর পর কর্ম্ম করিতে পুনরায় উদ্দীপনা যোগায় বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে স্বজনমৃত্যুতে জনসাধারণ ত সামান্য ব্যক্তি, এমন কি বিদ্বান্‌গণও

১। কঠ ১।২।২৩

শোকাকুল হইয়া পড়েন এবং সেই মৃত্যুতে সত্যই যে নবীন প্রাণের সূচনা এই হিসাবে উৎসব করেন না বা উৎসব করিবার মত মানসিক স্থৈর্য্য ও প্রজ্ঞা দর্শন করান না। ইহাই সংসারে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং অর্জ্জুন এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধের পর মৃত্যুজনিত সেইরূপ এক শোকছবি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেলেন ;[১]

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ "প্রহসন্নিব", হাসিতে হাসিতে অবসাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে আত্মার অবিনশ্বরতার বিষয়ে লোকোত্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ করান। শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহারে অর্জ্জুন ব্যথা পাইয়াছিলেন কিনা মহাভারতকার স্পষ্ট করিয়া তাহা লেখেন নাই, তবে অর্জ্জুনের নানাবিধ প্রশ্ন এবং যুদ্ধ আসন্ন জানিয়াও নানাবিধ দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের দ্বারা তাঁহার এই dilatory ব্যবহারে মনে হয় অর্জ্জুন তাঁহার ব্যথিত মনোভাব পরোক্ষভাবে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। আর আমাদের ন্যায় সাধারণ জীব মৃত্যুতে কি প্রকার সান্ত্বনা পাইতে পারে, তাহার উত্তর এই অধ্যায়ের এই বিশটী শ্লোকে কোথাও পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন— পরিণাম যাহাই হউক না কেন ? মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যথা ও ক্ষয়ক্ষতির বাস্তবানুগ কোনরূপ স্থায়ী পরিষেধক বা বর্ত্তমান কালের বীমা জাতীয় কথঞ্চিৎ পরিপূরকের ব্যবস্থা দেন নাই, ইহা বিভ্রান্তকর এক বিরাট জিজ্ঞাসা !

এই প্রসঙ্গে এই সকল বুদ্ধিজীবীরা আরো মনে করিয়ে দেন যে অর্জ্জুন মৃত্যুর যে ভয়াল চিত্র মনশ্চক্ষে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার

১। ১।২৯

শারীরিক অপটু অবস্থা ও মানসিক ভারসাম্যের অভাবের কথা বলিয়া যুদ্ধ না করিতে plead করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই গণহত্যার কোন উত্তর দেন নাই। "শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি" অর্জ্জুন বুঝেন ; তাঁহাদের জন্য তাঁহার কোন শোক নাই। কিন্তু যে সকল যুবক এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধে মৃত্যুর কবলে পতিত হইবেন, তাঁহাদের ত "বাসাংসি জীর্ণানি" নহে। তাঁহাদের তাজা প্রাণ, শক্তিমান্ শোণিত। ইঁহাদের বক্তব্য, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এইরূপ যুক্তি ভ্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই সকল যুক্তির কোন প্রত্যক্ষ উত্তর দেন নাই সত্য ; তবে পরোক্ষে তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। উদ্যোগপর্ব্বে তিনি ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহারা মূর্ত্তিমান অসুর ও দুষ্কৃতিপরায়ণ। অসূয়াপরবশ হইয়া এবং লোভে পড়িয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চনা করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ; একটীতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে দ্যূতক্রীড়ায় কপট পাশার সাহায্যে তাঁহাদের নানাভাবে পীড়িত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের কথামত দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাপন করিয়া ধৃতরাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিলে দুর্য্যোধনের আসুরিক ব্যবহার – বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিব না – কোন মতেই অনুমোদন করা যায় না। এই ব্যবহারকেই শ্রীকৃষ্ণ আসুরী সম্পদের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন [১] এই সব দুষ্কৃতদিগের বিনাশ করা তাঁহার মতে রাষ্ট্রশাসকের পরম কর্ত্তব্য। আর এই কর্ম্ম নির্ম্মমভাবে করিতে হইবে। তাহাতে দয়া নাই, মায়া নাই, লৌকিক

১। ১৬।৭-২১

লজ্জা করিতে নাই। ইহাই রাজধর্ম্ম। অর্জ্জুনের বুদ্ধিসঙ্কট, intellectual crisis, হওয়ায়, তিনি সাময়িক ভাবে ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনকে সমস্ত অবস্থাটী বুঝাইয়া পুনরায় তাঁহাকে সক্রিয় করিতে শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সাধারণ জীবের জীবনেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ বুদ্ধিসঙ্কট ঘটে এবং সে তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারে না; ফলে তাহার উদ্যমের পূর্ণ ফল লাভ ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করার পদ্ধতি এই সকল ব্যত্যয়ের প্রতিষেধক।

আর তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতার হইয়া সকল প্রকার দুষ্কৃতি দূর করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কালে যতপ্রকার অন্যায়, অভিযোগ, লোভ, অসূয়া ও নৃশংসতার সংবাদ পাওয়া যায়, ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগের দুষ্কার্য্য তাহাদের মধ্যে দুষ্কৃতিতম।[১] ইহাদের এই অত্যন্ত অন্যায় কাজ জানিয়াও লোভ পরবশ হইয়া কিংবা পাণ্ডব-ঐশ্বর্য্যে অসূয়াপরবশ হইয়া মেদিনীমণ্ডলের প্রায় সকল রাজাই দুর্য্যোধনের দুষ্কার্য্যে সহায়তা করিতে যত্নবান হয়েন। ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন বিচার করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের কৌরব সভায় দৌত্যকালে তাঁহার উচিতবাক্য শ্রবণের পর যে, কোন ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রশাসক দুর্য্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে – তাহা লৌকিক নিয়মানুসারেও অচিন্ত্যনীয়। তথাপি তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন। আর পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা অর্থের দাস, কৌরবদিগের অর্থ তাঁহাদের বদ্ধ করিয়াছে, তাঁহারা দুর্য্যোধনের অর্থভোগী; সুতরাং তাঁহার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম

১। উদ্যোগ পর্ব্ব ২৮শ অঃ

করিতে হইবে।[১] এ অবস্থায় ইঁহাদের বধ করা কি করিয়া অধর্ম্মোচিত হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত অধিযজ্ঞ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অলৌকিক শক্তির অভিজ্ঞানস্বরূপ বিশ্বরূপদর্শনে দেখাইয়া দিলেন যে সমুদয় রাজগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ তাঁহাদের যোদ্ধৃবর্গ সহ ধাবমান হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্রংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।[২] এই উগ্র মূর্ত্তিধারী কে, অর্জ্জুন তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,[৩]

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

"আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল (মহাকাল); লোক সকলের সংহার করিবার নিমিত্ত এই সময়ে প্রবৃত্ত রহিয়াছি; তুমি হত্যা না করিলেও, প্রতিপক্ষ সৈন্য সকল যাহারা অবস্থিত রহিয়াছে তাহারা কেহই বাঁচিবে না।" অতএব অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা, "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্,"[৪] তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।

এই অভিজ্ঞানে এই দেখান হইল যে অর্জ্জুন এই সকল দুষ্কৃতকারীদিগকে আঘাত না হানিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হনন করিবেন – ইহা তাঁহার অবতারত্বের নিশানা ও কর্ম্ম।[৫] এখন প্রশ্ন: অবতারেরা নিজেরাই প্রয়োজন হইলে সক্রিয় হন, কিন্তু এস্থলে ব্যতিক্রম কেন? ইহার কারণ উদ্যোগপর্ব্বে[৬] শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন দুজনেই দ্বারকায়

১। ভীষ্ম পর্ব্ব ৪০শ অঃ ২। ১১।২৯-৩০ ৩। ১১।৩২
৪। ১১।৩৩ ৫। ৪।৮ ৬। ৬ষ্ঠ অঃ

গমন করেন, এবং নিজ নিজ পক্ষে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি এঁদের দুজনকেই option দেন—একদিকে সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র কৃষ্ণ, অপর পক্ষে তাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদগোপের সৈনিকপদ—ইহাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এবং দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা সংগ্রহ করেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইঁহাদের বধ করেন নাই। অর্জ্জুনের দ্বারা করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যান্ত অর্জ্জুন তাহাই করিয়াছিলেন।

২.৩.২ লৌকিক ভাবে অর্জ্জুনের ক্ষাত্র স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস এবং স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধ করাই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য—ইহা নির্দ্দেশ

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য অপি চ (ত্বং) ন বিকম্পিতুম্ (বিচলিতুম্) অর্হসি ; হি (যস্মাৎ) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়: ন বিদ্যতে। পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ (আগতম্) অপাবৃতং (মুক্তং) স্বর্গদ্বারম্ (ইব) ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (এব) লভন্তে। অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি। অপি চ ভূতানি (জনাঃ) তে (তব) অব্যয়াম্ (শাশ্বতীম্) অকীর্ত্তিং চ কথয়িষ্যন্তি ; সম্ভাবিতস্য (বহুমতস্য) (জনস্য) চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে। মহারথাঃ চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (মন্যেরন্) ; যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সম্মানিতঃ) ভূত্বা লাঘবং (অনাদরং) যাস্যসি। তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি ; ততঃ দুঃখতরং কিং নু। হতঃ বা স্বর্গম্ প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে ; তস্মাৎ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (সন্) উত্তিষ্ঠ।

অনুবাদ—স্বধর্মানুযায়ী যুদ্ধ করিলেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে ; কারণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলতর অন্য কিছুই নাই। হে পার্থ! আপনা হইতে আগত (উপস্থিত) বিমুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরই লাভ করিয়া থাকেন। আর তুমি যদি ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিত্যাগ করিয়া পাপ-ভাগী হইবে। পরন্তু লোকে তোমার চিরকাল অযশ ঘোষণা করিবে ; লোকসমাজে সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষা ও অধিক। মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবেন ; যাঁহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে (এখন) তাঁহাদের নিকট তুমি লঘু হইয়া পড়িবে। এবং তোমার শত্রুগণও তোমার ক্ষমতার নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে ; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর বিষয় আর

কি আছে ? (এই কারণে যুদ্ধ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর) হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, জয় লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।

ব্যাখ্যা—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য—যুদ্ধে জীবহত্যা অবশ্যম্ভাবী এ কারণ অর্জ্জুন অনর্থক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধ না করিতে (অর্থাৎ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে) কৃতনিশ্চয় হইয়া রথের উপর মৌনী হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ বুঝাইলেন যে যুদ্ধে কেহই মরিবে না, কেন না দেহী অমর। নিহত হইবে জীর্ণ দেহ। অতএব স্বজনবধের আশঙ্কায় স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করা উচিত নহে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি—সমগ্র গীতা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শুদ্ধচেতা মনে করিতেন না। সে কারণ, প্রয়োজন হইলে সহজবোধ্য উপদেশ ব্যবহার করিতেন। তাছাড়া অর্জ্জুনের মাধ্যমে যে বৃহৎ গণসমাজকে তাঁহার তত্ত্বাদি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের কথা মনে রাখিয়া সময় সময় লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ দিয়াছেন। এমন কি লোক-নিন্দাভয়ের প্রসঙ্গও আছে। যথা, বর্ত্তমান ৩৪শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে লোকনিন্দাভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। আধুনিক সমাজে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে বহুস্থানে লোকনিন্দাভয় ধর্ম্মানুশাসনের স্থান অধিকার করিয়া prospective criminal-কে অন্যায় ও অধর্ম্মোচিত কাজ হইতে নিবৃত্ত করে এবং প্রকাশ্যে লোক-প্রশংসা জীবকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়। অর্জ্জুন ও সামাজিক জীব, অতএব তাঁহার পক্ষে এইরূপ উপদেশ প্রযোজ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ এই কারণে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মহান্ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বচন ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ কারণ, এই শ্লোকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বা প্রক্ষিপ্ত

নহে। অতএব গীতাবচনের প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ যে এই বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

এছাড়া আর একটী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন। অর্জ্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ দিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের বুদ্ধিসঙ্কট হইয়া মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং শারীরিক অসুস্থতা আরম্ভ হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যদর্শন ভিত্তি করিয়া গভীর তত্ত্ব সকলের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের reaction বুঝিয়া লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ দেন। এ অবস্থায় সাংখ্যদর্শনজাতীয় গভীর দার্শনিক আলোচনা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের যাহা কিছু বক্তব্য তাহা তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্পাদন করেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া শেষ মন্তব্য করেন,

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥

কিন্তু ইহার পর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের প্রশ্নের ভঙ্গিমায় কৃষ্ণবাসুদেব বুঝিলেন যে সূত্রাকারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা যাহা তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ও নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অর্জ্জুনের তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সে কারণ অর্জ্জুনকে বিষয়বস্তু সঠিক বুঝাইয়া পুনরায় সচেষ্ট করিতে শ্রীকৃষ্ণের আরো ষোলোটী অধ্যায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং—এ কারণ, এ শ্লোকে "বিষয়ী লোক যে অসার ও অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশস্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই"—এইরূপ মত ভ্রান্ত। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করা—যুদ্ধে হয় জয়, না হয় পরাজয় কিংবা মৃত্যু। জয়লাভ করিলে

পৃথিবীভোগ, আর হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি—ইহা উৎকোচদানের ন্যায়, স্বকর্ম্ম-সাধিতে কোন bait নহে। ক্ষত্রিয়কে তাহার নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্মের বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে উদ্যোগপর্ব্বে[১] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণবাসুদেবের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ স্মরণীয়। "হে মহারাজ! বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।" মহামতি ভীষ্মও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] তিনি বলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত দ্বার; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। ব্যাধিদ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।"

২.৩.২.১ বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া [শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক] বিচার করিয়া পরিণামনির্ব্বিশেষে লাভ-অলাভ বিবেচনা না করিয়া স্বধর্ম্মপালন অর্থাৎ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

অন্বয়—সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (সমৌ কৃত্বা)

১। ৭২ অঃ ২। ভীষ্মপর্ব্ব ১৭ অঃ

ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (সন্নদ্ধো ভব) ; এবং (সতি) পাপং ন অবাপ্স্যসি । সাংখ্যে (আত্মতত্ত্বে) এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা: (কথিতাঃ), যোগে (কর্ম্মযোগে) তু ইমাং (বুদ্ধিং) শৃণু ; পার্থ ! যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (সন্) ত্বং কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি । ইহ (বুদ্ধিযোগে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারম্ভস্য নাশঃ) ন অস্তি ; প্রত্যবায়ঃ (চ) ন বিদ্যতে ; অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে ।

অনুবাদ—সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় তুল্য মনে করিয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না । সাংখ্য-যোগে (আত্মতত্ত্বে) জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমাকে এই কথা বলা হইল । বুদ্ধিযোগ (কর্ম্মযোগ) বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ; হে পার্থ ! যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে তুমি কর্ম বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে । এই যোগ আরম্ভ করিলে, উহা বিফল হয় না ; ইহাতে বিঘ্ন নাই । এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে ।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কেন যুদ্ধ করিবেন তাহার এক লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন । এখন তাঁহার প্রখ্যাত মতবাদ – (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে) ফলাশাশূন্য হইয়া স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করাই জীবের পরম কল্যাণকর ও চরম কর্ত্তব্য – প্রচার করিতে এই তিনটী শ্লোকে তাহার সূচনা করিলেন ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গীতা মুখ্যত ব্যবহারিক শাস্ত্র । কি করিয়া কর্ম্ম করিলে জনসমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এ কারণ আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা ভগবদ্‌গীতাকে, A study in Methodology হিসাবে, গ্রহণ করে । তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ আধুনিকতম বিজ্ঞান Praxiologyর প্রথম ও

প্রধান প্রবক্তা। এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে তাঁহার বিচারপদ্ধতি আলোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের কথাবার্তায় বুঝিয়াছিলেন যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে, তাঁহার বুদ্ধিসঙ্কট ঘটিয়াছে এবং সে কারণ তাঁহার মতে অর্জ্জুনের মস্তিষ্ক-ধৌতির বিশেষ প্রয়োজন। অর্জ্জুন সাময়িকভাবে সংমূঢ়চেতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে তিনিও (অর্জ্জুন) রাষ্ট্রবিদ্যায় পারঙ্গম এবং অতিশয় বুদ্ধিমান, সে কারণ, তিনি সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যা করিয়া লৌকিকভাবে অর্জ্জুনের ক্ষাত্র স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেও, পরে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত বলিয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি তৎ সম্বন্ধে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরের ১৫টী শ্লোকে[১] এ বিষয় বিশদভাবে বিচার আরম্ভ করেন।

ইহা হইতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোন নির্দ্দেশ বা অনুজ্ঞা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে বলেন নাই। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরে বিষয়বস্তু নিশ্চয় করিতে অনুরোধ করেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে মন্তব্য করেন,[২]

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

ইহার উত্তরে অর্জ্জুন প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিতে চাহেন। এই প্রসঙ্গে দেখা যাইবে সাধারণ ব্যক্তিরা ত দূরের কথা, বিদ্বানের পক্ষেও যে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সুদুষ্কর এবং স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ আশ্রয়ও অসম্ভব, তাহা মন্তব্য করিয়া

১। ২।৩৯-৫৩ ২। ২।৫২-৫৩

সামান্য একটী ইঙ্গিত দেন যে "মাথা যদি ঘামাতে না চাও, ত শ্রদ্ধা সহকারে কোন আপ্তবাক্য আশ্রয় ও উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কাজ কর," "যুক্ত আসীত মৎপরঃ।"[১]

অতএব জীব যখন ফলাফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া একাগ্রচিত্তে বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তখন সে "বুদ্ধিযোগ" অবলম্বন করে। যখন ঐ প্রকারে সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের মত অনুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তখন "সাংখ্যযোগ" অবলম্বন করে। আর যখন জীব মাথা না ঘামিয়ে কেবল শ্রদ্ধাসহকারে কোনও আপ্তবাক্য উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, তখন "ভক্তিযোগ" অবলম্বন করে। অতএব গীতার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করিলেই যোগ হয় না; সুকৌশলে কাজ করিলেও যোগ হয় না; সমত্ব ও ফলাশাবর্জ্জন চাই। ইহাই জীবের পরমধর্ম্ম ও কর্ম্ম করিবার সর্ব্বোত্তম কৌশল।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই সূচনা, introduction হইতে দেখা গেল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মতবাদ বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরন্তু এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলেন, সমগ্র গীতা আলোচনা করিলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের উপদেষ্টার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের একজন ফ্যাসিবাদী কিংবা communist সমাজের একজন সার্ব্বভৌম একনায়ক ছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় অধ্যায়টী বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করেন নাই; এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৭২ শ্লোক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ একবারও "কর্ম্মযোগের" কিংবা "ভক্তিযোগের" উল্লেখ করেন নাই। এই সকল শ্লোকে, "বুদ্ধি-র্যোগে", "বুদ্ধ্যা যুক্তঃ", "বুদ্ধিরেকেহ" "বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্", "বুদ্ধি-

১। ২.৬১

যোগাৎ", "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ", "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা", "বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি", "বুদ্ধিনাশঃ", ইত্যাদি বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ ও উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত তাঁহার মূল বক্তব্য অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া যখন পরের অধ্যায়ে এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রথম "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্"[১] বলিয়া "কর্ম্মযোগ" উল্লেখ করিলেন। তবে একথা ঠিক শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী হিসাবে জানিতেন যে শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান ব্যতিরেকে অতিকায় জনসমাজ মাথা ঘামিয়ে "বুদ্ধিযোগ" অবলম্বন করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য তখন prescribe করিলেন, "যুক্ত আসীত মৎপরঃ।"[২] কিন্তু এখানেও অত্যন্ত সাবধানে; সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা পূর্ণ গীতাবচন বলিলেও চলে, — মাত্র এই একটীবার "মৎপর" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে ফ্যাসিবাদী কিংবা communist সমাজের একনায়ক অভিহিত করা বোধ হয় সমীচীন নহে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা—কর্ম্মের বিষদাঁত হইতেছে কর্ম্মোদ্ভূত জয়-পরাজয়ের অভিমান। সাধারণতঃ যিনি কর্ম্ম করিয়া হারিলেন, তাঁহার হারিবার কারণ সম্বন্ধে দ্বেষ ও ক্রোধ জন্মে। অন্যদিকে যিনি জিতিলেন, তাঁহার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লোভ ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং আরো অধিক লাভের জন্য উৎসাহ বোধ করেন। ফলে উভয়েই মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এজন্য তিনিই সঠিকভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন, যিনি জয়পরাজয়ের অভিমান ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের জন্য কাজ করেন। লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণভাবে সমভাব। তিনি

১। ৩।৩ ২। ২।৬১

কর্ম্মের ফলের দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করেন না। অতএব এই অভিমান ত্যাগই কর্ম্মযোগের প্রথম ও প্রধান সোপান। আনুষ্ঠানিক ভাবে, operationally, জয়পরাজয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে হইবে। এই সমত্বদর্শন ও (অনু) ভাবকেই শ্রীকৃষ্ণ যোগ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। ইহাই যোগের সংজ্ঞা, "সমত্বং যোগ উচ্যতে।"[১]

নৈবং পাপমবাপ্স্যসি—এইরূপে ভাবে (কর্ত্তব্য) কর্ম করিতে পারিলে কোনরূপ পাপই হয় না। ইহা অর্জ্জুনের "মহৎ পাপং কর্ত্তুম্" এর উত্তর।

কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি—"কর্ম্মরূপ বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে" – কি করিয়া? "যে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে এখন আমি ব্যাখ্যা করিতেছি, সেইরূপ ভাবে কর্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" শুধু তাহাই নহে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই ধর্ম্মের (ফলাশাশূন্য হইয়া স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন) অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিলে, উহা বিফল হয় না। তাহাতে বিঘ্ন নাই।

এরূপ সহজভাবে অথচ দৃঢ়তা ও অসমসাহসিকতার সহিত বন্ধু ও সখাকে (তথা সমগ্র জীবকে) কোনও প্রজ্ঞাবান্ উপদেষ্টা এইরূপ উপদেশ ও assurance দিয়াছেন কিনা জানা নাই। কর্ম্মমানেই সমগ্র জীবন[২] ; অতএব সমগ্র জীবন যাপনে জীব সকলের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিকে এরূপভাবে insured করিয়া জীবনদর্শন কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন, কিরূপভাবে জীবন যাপন করিলে অর্জ্জুন (তথা জীবমাত্রই)

১। ২।৪৮ ২। ৮।৩

জিত বা পরাজিত হইয়াও জয়পরাজয়ের বিষদাঁতের আঘাতকে avoid করিতে পারিবেন, তাঁহার কর্ম্মযোগ তাহারই এক বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। ইহাই গীতার greatest contribution, সর্ব্বোত্তম অবদান। মানুষের জীবনের সকলপ্রকার সংশয়ের এক অনবদ্য সমাধান। নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি করা দুরূহ,[১] তাছাড়া রাষ্ট্রে, সমাজে ও সংসারে তাহার application অত্যন্ত সীমিত। অথচ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেব ঘোষণা করেন,[২]

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মব্যস্ত, কাঙ্গাল ও কর্ম্মসর্ব্বস্ব জীবের পক্ষে তাহার স্বকীয় কর্ম্মের মাধ্যমে কত সহজে ও সুলভে সিদ্ধি ও পরমাগতিলাভ সম্ভব।

২.৩.২.২ বৈদিক কাম্যকর্ম্ম বনাম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মপালন

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

১। ১২।৫ ২। ১৮।৪৬

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ।৪৬॥

অন্বয়—কুরুনন্দন! ইহ (ময়োক্তবুদ্ধিযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ এক (একনিষ্ঠা) এব। অব্যবসায়িনাং (ঈশ্বরবিমুখানাং কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ বহুশাখাঃ চ। পার্থ! (যে) অবিপশ্চিতঃ (মূঢ়াঃ) বেদবাদরতাঃ, 'অন্যৎ ন অস্তি' ইতি বাদিনঃ, কামাত্মনঃ, স্বর্গপরাঃ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাং (আপাততোরমনীয়াং) বাচং (স্বর্গাদ্যফলশ্রুতিং) প্রবদন্তি তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃত-চেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (তেষাং) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। বেদাঃ (বেদভাগঃ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (সংসারবিষয়াঃ); অর্জ্জুন! (ত্বং) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কামঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-রহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যশুদ্ধগুণাশ্রিতঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগাৎ উৎপন্নং যৎ ফলং কল্যাণস্বরূপং তদ্রহিতঃ) আত্মবান্ ভব। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (সতি) উদপানে যাবান্ অর্থঃ (প্রয়োজনং), সর্ব্বেষু বেদেষু বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) তাবান্ (অর্থঃ)।

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান একই; আর অব্যবসায়ীদিগের কামনা অনন্ত ও বহুশাখা বিশিষ্ট (অর্থাৎ অন্যবিষয়ে বিক্ষিপ্ত)। হে পার্থ। যে মূঢ় বেদের অর্থবাদে তুষ্ট, যাহারা বেদের কাম্যকর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছুই নাই এইরূপ বলে, যাহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত নানাবিধ কর্ম্মবহুল, এইরূপ আপাততঃ মনোহর বাক্য বলিয়া থাকে, তাদৃশবাক্যে

বিমোহিতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না। বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক (অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক); হে অর্জ্জুন! তুমি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, অবিকল্পিত ও ধীর এবং যোগক্ষেমরহিত ও আত্মনিষ্ঠ হও। [কেন না] সকলস্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু (অর্থাৎ যাবৎ) জলের প্রয়োজন, জ্ঞানীব্রাহ্মণের (পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির) সমগ্র বেদেও ততটুকু (অর্থাৎ তাবৎ) প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত সূচনার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী কর্ম্মকরিবার পদ্ধতি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তদানীন্তন কালে প্রচলিত প্রথানুযায়ী বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুসারে কাম্যকর্ম্ম বলিয়া যে কর্ম্ম পরিচিত হইত, সেই কর্ম্মবিষয় উল্লেখ করেন এবং সেইরূপ কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার পদ্ধতির এক তুলনামূলক আলোচনাও এ ছয়টী শ্লোকে করেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য যে পরে তাঁহার মতানুযায়ী কর্ম্মকরার পদ্ধতি বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা না হয়, কিংবা সে সম্বন্ধে কোন ভুল বুঝা না হয়। এ ছাড়া আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে তিনি যে কর্ম্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা বেদবিরুদ্ধ। অতএব ইহাতে প্রচণ্ড বিরোধ ঘটিবার ও protest হইবার সম্ভাবনা। একারণ প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত বেদবাদ বিশ্লেষণ করিয়া পরে কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রখ্যাত অনুশাসন ঘোষণা করেন,[১]

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

১। ২।৪৭

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ—যাহাদের ঈশ্বরারাধনা বহির্মুখী এবং সকাম তাহাদের কামনা সকল অনন্ত। এই কামনা সকল কি প্রকারের, শ্রীকৃষ্ণ তাহার এক illustrative তালিকা ষোড়শ অধ্যায়ে দিয়াছেন।[১]

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ইহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

বৈদিক কর্ম্ম সকল সঙ্কল্পজাত-সকাম; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মপালন is one single-pointed effort। এইরূপ কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় ফলাকাঙ্খা নাই; সুতরাং এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিশ্চয়াত্মিকা এবং বুদ্ধি একনিষ্ঠা। অতএব ইহা (বুদ্ধি) বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু বেদবাদরতেরা ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের প্রয়াস সফল হইবে, কি-না-হইবে, সর্ব্বদাই এইরূপ এক সংশয়ের মধ্যে থাকায় চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন না এবং এক

১। ১৬।১১-১৬

অনিশ্চয়াত্মিকা অবস্থাজনিত ভয়ের মধ্যে বাস করেন। এই অনিশ্চয়াত্মিকা অবস্থাজনিত ভয়ই জীবের কর্ম্মপ্রয়াসের সর্ব্বাঙ্গীন সুফল লাভের প্রতিবাধক। তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি, যাহা এই ভয় দূর করিতে সক্ষম।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ—অতএব হে অর্জ্জুন! এই ফলাকাঙ্খাহীন কর্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এক। ইহাতে চিত্তের ভারসাম্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আর একারণ এই কর্ম্ম (ধর্ম্ম) যোগের অল্পমাত্র মহাভয় হইতে রক্ষা করে।[১]

প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ—হে পার্থ! অথচ যে মূঢ়গণ বেদের কাম্যকর্ম্মে তুষ্ট, যাহারা বেদে কাম্যকর্ম্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাই এইরূপ বলে, স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ ইত্যাদি সেই সকল ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না (অর্থাৎ তাহারা সংশয়সাগরে হালবিহীন নৌকার ন্যায় ভাসিতে থাকে)।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণ বেদবাদ নিন্দা করেন নাই। তিনি তাহাদেরই নিন্দা করিয়াছেন, যাহারা বেদে কাম্য-কর্ম্মনিদান ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। ইহা হইতে মনে হয়, মহান্ কালের বশে যখন এই কর্ম্ম-যোগ, কদর্থের জন্য বা অন্য কোন কারণে (যেমন জীবের দুর্জ্জয় লোভবশতঃ), বিলোপ পায়, তখন তাহাকে সংস্কৃত করিয়া পুনরুদ্ধার করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন বলিষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মসংস্কারকের বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রখ্যাত ধর্ম্ম—নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই যে সৎধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মাচরণেই কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন ও পরে

১। ২।৪০

পরমাগতিলাভ অত্যন্ত সুলভ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবিচলিত স্থৈর্য্য, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, লোকোত্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি ও স্বকীয় অসীম সাহসিকতার সহিত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, অর্জ্জুনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন,[১]

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥

যাহারা আমার এই মত অসূয়া পরবশ হইয়া অনুষ্ঠানে বিরত হয়, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানে বিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়া জানিবে।

নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহা পুনরায় দৃঢ়ভাবে অর্জ্জুনকে জানাইলেন এবং আরো বলিলেন যে ইঁহারা তাঁহার মতে কৃপণ, দীন; "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ"।[২]

নিত্যসত্ত্বস্থঃ—চিত্তের ভারসাম্যের অভাব জীবের কর্ম্মপ্রয়াসের সকল অসাফল্যেরই কারণ এবং তাহার সকল দুঃখের হেতু। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে কর্ম্মে জয়পরাজয়ের অভিমান জীবের এই ভারসাম্য অভাবের মূলীভূত কারণ। সে কারণ যাঁহারা কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনার্থ কর্ম্ম করেন, সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, they poise themselves in tranquility। কর্ম্মের বিষদাঁত (কর্ম্মফলের মাধ্যমে) তাঁহাদের কোনমতেই আঘাত হানিতে সমর্থ হয় না।

১। ৩।৩২ ২। ২।৪৯

নির্য্যোগক্ষেমঃ—এই নির্দ্দেশ (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ না হইবার এক অত্যদ্ভুত কৌশল। যোগ (অর্থাৎ কর্ম্মযোগ) হইতে উৎপন্ন যে ফল তাহা হইতে শত যোজন দূরে থাকিবে (অর্থাৎ তদ্‌রহিত হইবে)। নির্দ্দিষ্ট কাজ (ordained duty) করিয়া one should take care neither to acquire the benefits thereof nor to hoard them. ইহাই আধুনিকতম সমাজতন্ত্রের প্রধান তত্ত্ব।

আত্মবান্ ভব—আত্মনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ নিজেতে স্থিত হও। কর্ম্মই যখন জীবন,[১] নিজেতে স্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য, নিরন্তর স্বীয় কর্ম্ম-সম্পাদন। স্বীয় কর্ম্ম করার অর্থ, পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন ; ফল যাহাই হউক, জীব সেই ফল সংগ্রহ করিবে না কিংবা সেই সকল সংগৃহীত ফল রক্ষা, protect and hoard করিবে না। অপর পক্ষে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অনুযায়ী কোন একটী বিশেষ কর্ম্মের প্রারম্ভে সঙ্কল্প করিতে হইবে, সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী কর্ম্মই বিহিত কর্ম্ম হওয়ায় বিধি নিষেধ মানিয়া সবিধি সেই কর্ম্ম উদ্‌যাপন করিবার প্রয়াস করিতে হইবে এবং সেই প্রয়াস সফল হইলে কর্ম্মফল নিজের (one's own) বলিয়া জীব তাহা সংগ্রহ করিবে ও তাহা রক্ষা করিয়া লক্ষ্মীর শ্রী, শুচি ও কল্যাণময় ভাণ্ডার না গড়িয়া কুবেরের বহু দ্বারা কৃপণের গুদামে পরিণত করিবে।

একারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে (এবং তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র জীবকে নহে, শুদ্ধমাত্র শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানকে) নির্দ্দেশ দিলেন, "বৈদিক কাম্যকর্ম্মসমূহ কর্ম্মফলপ্রতিপাদক ; তুমি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর।" কিন্তু প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে

১। ৮।৩

কোন মূর্খ ও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। আধুনিক কালের অর্থনীতির প্রথম প্রশ্ন : কাজের motivation কী ? জীব কাজে প্রবৃত্ত হইবে কেন ? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বিহিত কর্ম, অবিহিত কর্ম[১] — এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন ; অতএব যেরূপভাবে কর্ম করিলে, তুমি বিমুক্ত হইবে, তাহা এই : নির্দ্বন্দ্ব হইয়া স্বাভাববিহিত স্বধর্ম পালন কর"। কিন্তু একথা মানিতেই হইবে, এই নির্দ্দেশে সাধারণ ব্যক্তি মনে বিশেষ জোর পায় না এবং তাহারা তাহাদের ordained duty করিতে incentive চাহে। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন ; সে কারণ তাঁহার এই অনুজ্ঞা শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনের জন্য। জনগণের বুদ্ধিভেদ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; 'আপনি আচরি' তাহাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিবার ভার সমাজের শীর্ষস্থানীয়দিগের। সে কারণ পরিষ্কার করিয়া পরে বলিলেন,

"নিত্যসত্ত্বস্থ" হও অর্থাৎ কাম্যকর্ম প্রয়াস সফল হইবে, কি হইবে না, এই অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে যে মানসিক বিক্ষিপ্তি, – তাহা হইতে দূরে থাক এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে – নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে – এই বিচলিতভাব থাকিবার কোন কারণ ঘটিবে না, ফলে তুমি শাশ্বত মানসিক ধৈর্য্য ও শান্তি পাইবে এবং কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন সম্ভব হইবে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও, পরে ব্যঙ্গ করিয়া শেষ কথা বলিলেন,[২]

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে)

১। ৪।১৬ ২। ২।৪৬

যতটুকু (জলের) প্রয়োজন, (অর্থাৎ ব্যাপী, কূপ, তড়গাদিতে কাহারও আর প্রয়োজন হয় না) জ্ঞানী ব্রাহ্মণের, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদে (ritualistic portion of the Vedas-এ), ততটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠের বেদে আর কোন প্রয়োজন হয় না)।

২.৩.৩ কর্মকরার পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন: গীতায় কর্মবাদ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥৪৭॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

অন্বয়—কর্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু (তে অধিকারঃ) মা (অস্তু); [এবং] কর্মফলহেতুঃ মা ভূঃ; অকর্মণি তে (তব) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু। ধনঞ্জয়! সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে। ধনঞ্জয়! হি (যতঃ) বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম দূরেণ অবরং (অধমং); (তস্মাৎ) বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ (প্রার্থয়স্ব); ফলহেতবঃ (সকামাঃ নরাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ)। বুদ্ধিযুক্তঃ

(পুরুষঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি (ত্যজতি) ; তস্মাৎ যোগায় (সমত্ববুদ্ধিস্বরূপায়) যুজ্যস্ব ; যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্টাঃ) মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্তা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ম্ (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং পদং গচ্ছন্তি (লভন্তে) হি।

অনুবাদ—কর্ম্মেই তোমার অধিকার ; কর্ম্মফলে কদাচ তোমার অধিকার নাই ; তুমি কর্ম্মফলের হেতুভূত হইও না ; অকর্ম্মে তোমার যেন রতি না হয়। হে ধনঞ্জয় ! ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া একান্ত মনে (ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া) কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত। হে ধনঞ্জয় ! (এই সমত্বরূপ) বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা (অর্থাৎ ফলাকাঙ্খাবিহীন কর্ম্মযোগ অপেক্ষা) কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট ; অতএব তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর। সকাম মানবেরা অত্যন্ত দীন। যিনি বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি এই সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়ই পরিত্যাগ করেন ; অতএব কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর ; কর্ম্মে কুশলতাই (নিষ্ঠাই) যোগ। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে দুঃখরহিত পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্যাখ্যা—প্রথম শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে : (ক) কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ ; (খ) ফলেষু কদাচন মা ; (গ) কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ ; এবং (গ) অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু। ইহাতে একটী বিধি আর তিনটী নিষেধ বচন।

এই সকল অংশ আলোচনার পূর্ব্বে কর্ম্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার একটী পরিষ্কার ধারণা হওয়ার প্রয়োজন। দ্বিতীয়, এই কর্ম্মের কর্ত্তা কে ? এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর

পাইলে, এই শ্লোকের বিধি বচনের সহিত নিষেধ বচনের একটী সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন[১]: ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ; ভূতভাবের (জীব সকলের অর্থাৎ দেহের) উদ্ভবকর (অর্থাৎ জন্ম, pulsation) হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্গ (অর্থাৎ বিসর্জ্জন, দেহের বিনাশ) পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ক্রিয়া, প্রত্যেকটী activityই কর্ম্ম। কর্ম্ম সম্বন্ধে এই ধারণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ পরে বলিয়াছেন[২] "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"; এমন কি সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলেও শরীর রক্ষা করিতে কর্ম্মকরা অনিবার্য্য।[৩] আবার ইহাও বলিয়াছেন যে "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ," কোনটী কর্ম্ম, কোনটী অকর্ম্ম—এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন।[৪]

কর্ম্মের সংজ্ঞানুযায়ী দেখা যায় যে জীবের (জীবাত্মার) দেহ সৃষ্টি হইলে কর্ম্মের সৃষ্টি এবং সেই দেহ বিনাশ হইলে কর্ম্মের সমাপ্তি। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে দেহ কর্ম্ম করে, দেহস্থিত দেহী নিষ্ক্রিয়? কিন্তু দেহ বলিতে স্থূল শরীর নহে, দেহী ব্যতীত যাহা কিছু শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তৎসমুদয় দেহ। এই দেহকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে[৫] ক্ষেত্র বলা হয়েছে। অতএব দেহ যখন কর্ম্ম করে, সে তখন এই ক্ষেত্র-অন্তর্ভুক্ত ধর্মানুযায়ী কাজ করে। আর এই কাজ করিতে শক্তি যোগান ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহস্থিত দেহী, সীমিত পরমাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা।

এইরূপ বিচারে দেখা যায়, জীবাত্মা শুধুমাত্র শক্তি যোগান[৬];

১। ৮।১ ২। ৩।৫ ৩। ৩।৮
৪। ৪।১৬ ৫। ১৩।২, ৬-৭ ৬। কেনোপনিষদ্

আর কর্মের রূপ প্রভৃতি details (খুঁটিনাটী) তিনিই স্থির করেন, যিনি এই জীবাত্মার সাময়িক আধারের প্রকৃতি। একটী উদাহরণ দিলে সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। জীবাত্মার আধার যদি গরু হয়, ত, গরুর প্রকৃতি সাময়িকভাবে জীবাত্মার কর্মের রূপ, গতি ইত্যাদি নিরূপণ করিবে। যদি আধার শুদ্ধচেতা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়, তাঁহার প্রকৃতি সাময়িকভাবে ওই শুদ্ধচেতার প্রকৃতি হইবে। অতএব দেহীর শুধুমাত্র "কর্মণি", বিশেষ এক প্রকৃতিকে (at a particular point of time and under particular circumstances) বিশেষ কালে ও বিশিষ্ট অবস্থায় শক্তি যোগান দিয়া, তাহাকে function করাইয়া কর্মে নিয়োগ করিবার অধিকার; কর্ম করিবে সেই প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়গণ। এই শক্তি যোগান দেওয়া ব্যতীত দেহীর আর কোন অধিকার নাই। আধারটী বিনাশ হইলে দেহীর (তথা কথিত) কর্মেরও অবসান ঘটে। দেহী কর্ম করিলে কর্মের কখনও বিনাশ ঘটিত না, কারণ দেহী নিত্য এবং তাঁহার কর্মেরও কোন ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারিত না ; যেহেতু তিনি শাশ্বত ও অবিকৃত।

মা ফলেষু কদাচন—দেহীর আধারের প্রকৃতি যখন কর্ম করে, প্রাথমিক দৃষ্টিতে সেই কর্মের ফল, তাহারই প্রাপ্য। ইহাতে যিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিকে শক্তি দেন, সেই কর্মফলে তাঁহার কোন অংশ থাকিতে পারে না—এইরূপ যুক্তি ভ্রান্ত। তবে এই কর্মফল নিরূপণ করিতে, end-product-এর স্বরূপ ও character নির্ণয় করিতে দেহীর কোন হাত নাই। উদাহরণ স্বরূপ, একই Electric শক্তি আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, বড় বড় যন্ত্র চালায়—তাই বলিয়া Electric শক্তির কর্মফল, আলো নহে, পাখাঘোরান নহে, কিংবা বড় বড় যন্ত্র চালানও নহে। আলো দেওয়া, পাখা ঘোরান,

বড় যন্ত্র চালান—সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি ও end-product, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে কাজ করাইতে Electricity শক্তি যোগায়।

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ—অতএব এই সকল কর্মফলের হেতু অর্থাৎ স্রষ্টা দেহী নহেন। Electricity নহে; ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যাহাদের Electricity শক্তি যোগায়।

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি—অকর্মে যেন তোমার রতি না হয়। অর্থাৎ দেহী যেন শক্তি যোগান দিতে অস্বীকার না করেন; তাহা হইলে কর্মলোপ পাইবে আর সমস্ত সৃষ্টি উৎসন্ন যাইবে। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ পরে আরো বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে তাঁহার কোন কর্ম্ম না থাকিলেও, তিনি কর্ম করেন; কারণ তিনি কর্ম না করিলে, জীবের প্রকৃতিকে কর্ম করিতে শক্তি না জোগাইলে, সকল লোকই কর্মলোপবশতঃ বিনষ্ট হইবে।[১] জীবাত্মাই ত পরমাত্মা; অতএব জীবাত্মা যদি তাঁহায় আধারকে কর্ম করিতে শক্তি জোগাইতে রতি না দেখান ত "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ।"

এখন বিচার করা যাউক, কর্মের কর্তা তাহা হইলে কে? উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণে দেখা যায় Electricity পূর্ণ কর্তা নহে; কর্ম-ফলের সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসমূহ, যাহা Electricity-র শক্তিতে ক্রিয়াবান্ হইয়া ফলপ্রসূ হয়। ভূত সকলের পক্ষেও সেই প্রকার—সবিকার ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহীর দেহ কর্মফল সৃষ্টি করে, আর শক্তি জোগান জীবাত্মা। দেহী যখন গাভীর আধারে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন গাভীর প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁহার কার্য্যাদি রূপ নেয়; আবার

১। ৩।২৪

যখন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের আধারে স্বীয় প্রকাশমান হন, তখন সেইরূপ ব্রাহ্মণের প্রকৃতি অনুযায়ী দেহীর কর্ম্ম প্রকাশ পায়। এই দুই ভিন্ন ভিন্ন জীবের মূল শক্তি জীবাত্মা; কিন্তু আধারের পার্থক্যে তাঁহার প্রকাশ ও কার্য্যাবলি সম্পূর্ণ পৃথক। এ কারণ,[১]

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

পণ্ডিতগণ, সাধারণ ব্যক্তি নহে, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত তুল্যরূপ দেখেন।

অতএব দেখা যাইতেছে জীবাত্মা শক্তি না জোগাইলে প্রকৃতিজাত গুণসকল নিষ্ক্রিয়, এবং প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার শক্তি ব্যতিরেকে নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু। অতএব ইহাদের সক্রিয় ও শক্তিমান্ না করিলে কোন কর্ম্মই হয় না। কিন্তু ইহারা সক্রিয় হইয়া যে কাজ করে, তাহা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী; সেখানে জীবাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনি সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা। কর্ম্ম করিলেই তাহার একটী ফল হইবে, effort করিলেই তাহার product ফলিবে, সেই product কাহার ভোগ্য? জীবাত্মা দাবি করিতে পারেন, কারণ তিনি শক্তি জোগান; কিন্তু তিনি "ঠুঁটো জগন্নাথ," তাঁহার হাত নাই, পা নাই; অতএব প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গণ দাবি করিতে পারে, যেহেতু তাহারাই সক্রিয় ও তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ হইতেছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ তথ্য নহে, যেহেতু এই সকল ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার শক্তিতে ক্রিয়াবান, অন্যথা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। অতএব কর্ম্মের কর্ত্তা জীবাত্মা এবং তাঁহার আধারস্থিত প্রকৃতি। কেহ মুখ্য, কেহ গৌণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই জীবাত্মা ও তাঁহার

১। ৫।১৮

আধারস্থিত প্রকৃতি কি পৃথক পৃথক সত্ত্বা? ভিন্ন হইলে কর্ম্মফল একটী যুগ্মফল, Joint Product। আর অভিন্ন হইলে কর্ম্মফল একক, তাহার কর্ত্তা জীবাত্মা ; যিনি কতকগুলি করণের সাহায্যে কর্ম্ম করেন। এ কারণ তৃতীয়া বিভক্তি, "প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"।[১] এ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য "তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্",[২] আমি কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। ইহার তাৎপর্য্য—আমি জীবের কর্ম্ম করিতে তাঁহার প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়গণকে শক্তি জোগাই, অতএব কর্ত্তা। আর বাস্তবভাবে প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্মটী সম্পাদন করে অতএব তাহারই কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, আমি কেবলমাত্র দ্রষ্টা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কর্ম্মফল কেহই—জীবাত্মা কিংবা তাহার প্রকৃতি—একক ভোগ করিতে পারে না। তবে মুখ্য (direct) ও বাস্তবভাবে জীবের প্রকৃতি কর্ম্ম করে, সে কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন",[৩] কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, "আমিই সব"—"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।[৪] অতএব কর্ম্মকর্ত্তা কে—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল এবং তাহা হইলে ফল কে পাবে, তাহাও জানা গেল।

ইহা হইতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের মতে জীব (জীবাত্মা) তাঁহার বিশেষ বিশেষ আধারের প্রকৃতিকে শক্তি যোগান দিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। পরিণাম যাহাই হউক না কেন, তাহা জীবের বিচার করিবার কোন অধিকার নাই। কারণ পরিণাম ও কর্ম্মফল সেই আধারস্থিত প্রকৃতিকে affect করিবে। জীবকে কোনমতেই এই

১। ৩।৫, ২। ৪।১৩ ৩। ২।৪৭ ৪। ৫।২৯

পরিণাম ও কর্ম্মফল affect করিতে পারে না এবং কৃষ্ণবাসুদেবের মতে affect করেও না।

এইরূপ বিচার করিলে প্রাথমিক দৃষ্টিতে একটু ভুলবোঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমরা বলি জীব কাজ করে, জীব ভোগ করে, জীবের স্বভাববিহিত কর্ম্ম করা উচিত ইত্যাদি। কিন্তু উপরি-উক্ত বিচার হইতে দেখিয়াছি যে জীবাত্মা (জীব) শক্তি জোগান অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয়রূপ সবিকার দেহের প্রকৃতিকে সেই প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মে নিয়োগ করেন। অতএব এ বিষয় আরো একটু তলাইয়া দেখার প্রয়োজন।

উপনিষদ্[১] বলেন,—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র অসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১॥
স ইঁমাল্লোকানসৃজত
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমিত্যাদি ॥২॥

কেন এই ভূত সকল সৃজিত হইল তাহার বিশ্লেষণে না যাইয়া ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের ন্যায় একটী সুপ্রাচীন গ্রন্থে উপরি-উক্ত মন্ত্র পাই। আর গীতায়[২] পাই, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—আমারই সনাতন অংশ (এই জীবাত্মা) জীবলোকে জীব হন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জীবলোকে জীব হইয়া কাজ করিতে জীবাত্মার একটী আশ্রয় চাই। অতএব এই দেহ সেই আধার বা আশ্রয়। আর ইহাও দেখিয়াছি যে এই দেহ বিনাশশীল, কিন্তু জীবাত্মা সনাতন। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"[৩]। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে

১। ঐত ১।১-২ ২। ১৫।৭ ৩। ২।২০

জীবাত্মা ও তাঁহার আধার এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া থাকে যে দেহ ও দেহী যে ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ পৃথক তাহা বিবেকী ব্যক্তিরাও ভুলিয়া যান – কা কথা অন্যেষাম্। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও প্রাণিধানযোগ্য ; তাঁহার নির্দেশ[১] মনে রাখিলে কোন confusion ঘটিবার, কোন ভুল বুঝিবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে ইহা পরিস্ফুট যে জীবের (দেহীর) শক্তিতে তাহার আধার যে কর্ম্ম করে তাহাতে কোন খাদ থাকিবার কথা নহে। আর যদি সাংখ্য ও বেদান্ত নির্ণীত কারণগুলি[২] সহায়ক হয় তাহা হইলে আধারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহা সুসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই কারণগুলি উপযুক্তস্থান, (a fitbody) উপযুক্ত কর্ত্তা, (a proper entrepreneur) পৃথক পৃথক উপযুক্ত উপকরণ, (technical equipments) পৃথক পৃথক চেষ্টা (technical knowledge) ও দৈব। অন্য কথায়, in other words, শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত এই গুলিই আধুনিক কালের সুযোগ ও সুবিধা। ইহাদের পূর্ণব্যবস্থায় কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন। ইহার অন্যথা হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাতে, জীবের মানসিক ভারসাম্য অটুট, সুযোগ সুবিধা অক্ষত। এই অবস্থায়, optimisation of operational efficiency is fully guaranteed.

উপরি-উক্ত বিচার মনে রাখিলে কৃষ্ণবাসুদেবের কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে প্রখ্যাত অনুশাসন বুঝিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। আর

১। ৩।২৭-২৮ ২। ১৮।১৩-১৪

আধুনিক যুগের Theory of Praxiology যে কৃষ্ণবাসুদেবের এই কর্ম্মবাদের নবীনতম সংস্করণ, তাহাও অনুধাবন করা সহজ হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অনুশাসন সাধারণের জন্য নহে। তাঁহার মতে, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ [১] জনগণ নিজের কর্ম্মের নিজেই কর্ত্তা ও ভোক্তা — এই মনোভাবপ্রাপ্ত এবং এইরূপ মনোভাব তাহাদের জীবনে, তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় উৎকর্ষ ও সাফল্য আনে। এ কারণ তাহাদের এই মনোভাব বিচলিত করা উচিত নহে।[২] পরন্তু বিদ্বানরা এই সকল অজ্ঞজীবকে বুঝাইয়া বলিবেন যে তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধির জন্য পাঁচটী কারণ আছে।[৩] অতএব এই সকল অজ্ঞজীব, তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতে, "উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত কর্ত্তা, উপযুক্ত পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় ও মন এবং নানাভাবে পৃথক পৃথক চেষ্টা সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া কর্ম্ম করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিবে এই চারিটী ছাড়া আর একটী হইতেছে দৈব, দেবতার আশীর্ব্বাদ।" সে কারণ, ইহাদের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে সকাম দেবতাপূজা অচির কালেই ফল দেয়।[৪]

২.৩.৩.১ শ্রীকৃষ্ণোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝিতে নিশ্চল ও স্থির-বুদ্ধির প্রয়োজন

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

১। ৩।২৬ ২। ৩।২৯ ৩। ১৮।১৩-১৪ ৪। ৪।১২

অন্বয়—যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (দেহাভিমানলক্ষণং) ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তাসি। যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ নানালৌকিক বৈদিকার্থবাদ-শ্রবণৈঃ) (সতি) তে বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা (অতএব) অচলা (স্থিরা) স্থাস্যতি, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি।

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতঅর্থ সম্বন্ধে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। নানা লৌকিক ও অর্থবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অবস্থিত হইয়া নিশ্চল ও স্থির হইবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা—এই দুইটী শ্লোকের বিষয় কঠোপনিষদের মন্ত্রে[১] উল্লেখ আছে। আত্মতত্ত্ব বুঝিতে সাধারণ বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না। প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞানদ্বারা এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। এই তত্ত্ব জানিতে হইলে বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকরিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তিনি এই দুইটী শ্লোকে নির্দ্দেশ দিলেন। এই হেতু অর্জ্জুনের "স্থির বুদ্ধির লক্ষণ কি" প্রশ্ন? এবং তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্ঞার এক সংজ্ঞা দেন ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক কালেও প্রাকৃতপদার্থের জ্ঞান-বনাম-আত্মতত্ত্ব বুঝিতে বুদ্ধির বিষয়, Technocracy vs wisdom-র এক বিশেষ আলোচনার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পরিয়াছে। আজ সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অলৌকিক প্রসার সাধারণ

১। ১।২।১২-১৩

মানুষ কেন, বিদ্বান্‌কেও এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে এই শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা, যাঁহারা জনসাধারণের অনেক উচ্চে, তাঁহারও স্থিরবুদ্ধির, প্রজ্ঞার, wisdom এর কোন সার্থকতা দেখেন না কিংবা দেখিলেও মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বেদবাদরতা, বেদের কাম্যকর্ম্মে বিশ্বাসী। তাঁহারা মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে Bio-Engineering ও Electronics বিজ্ঞানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় Computor-মানব প্রজ্ঞের রূপ লইয়া ক্রান্তদর্শী হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা মানিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায় ও ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গণহত্যা ও গুরুহত্যা অনিবার্য্য বুঝিয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধিসঙ্কট ঘটে। ফলে তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া পড়েন। ইহাতে তিনি শুধু যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তাহা নহে, সাময়িকভাবে শারীরিক অপটু হইয়া প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থা শুধু যে গীতার তত্ত্ববিদ্যা প্রণিধান করিতে সুস্থ ও যোগ্য, তাহা নহে, ইহা জীবমাত্রেরই কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধনের পরিপন্থী। কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ব্যক্তিগত সংস্কার সুবিধা ও আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। "সনাতন ধর্ম্মের যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা প্রতি-নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রতিনিয়ত বর্ণের বিহিত কর্ম্মের নাম স্বধর্ম। এই স্বধর্ম্মের পালন সকলের নিকট অপরিহরণীয়।" ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে সাংসারিক ও সামাজিক মালিন্য ঘটে এবং জীবের কর্ম্মশক্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফুটন সম্ভব হইয়া উঠে না।

২.৩.৪ স্থিরবুদ্ধি কি? প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞার সংজ্ঞা

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

* * *

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ – কেশব। সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা

ভাষা (লক্ষণম্) ; স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত ; কিম্ আসীত, কিং ব্রজেত ?

শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ ! আত্মনি এব (পরমানন্দস্বরূপে) আত্মনা (স্বয়মেব) তুষ্টঃ ; (যোগী) যদা মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ প্রজহাতি (ত্যজতি), তদা (সঃ) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু চ বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে। যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্যঃ) তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি (প্রীতিমনুভবতি), ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। যদা চ অয়ং (যোগী) কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবেন) সংহরতে (প্রত্যাহরতি), (তদা) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জ্জং (রসঃ রাগঃ অভিলাষস্তদ্বর্জ্জনং) বিনিবর্ত্তন্তে (অভিলাষঃ ন তু নিবর্ত্ততে ইতি-ভাবঃ) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) রসঃ অপি পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা (স্বতঃ) নিবর্ত্ততে। কৌন্তেয় ! যততঃ (মোক্ষার্থং চেষ্টমানস্য) অপি বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য প্রমাথীনি (ক্লেশদায়কানি) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (বলাৎ) মনঃ হরন্তি। যুক্তঃ (সমাহিতঃ) তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ (সন্) আসীত (তিষ্ঠেৎ) ; হি (যস্মাৎ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।···তস্মাৎ, মহাবাহো ! যস্য ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব ! সমাধিতে অবস্থিত প্রজ্ঞের স্থিরবুদ্ধির লক্ষণ কি? স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপ বাক্য ব্যবহার করেন, কিরূপ থাকেন ও কিরূপ চলেন ?

শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীভগবান্) বলিলেন—হে পার্থ ! যাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে

তুষ্ট ; (যোগী) যখন সমুদয় মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে ভোগাকাঙ্খা-রহিত, আসক্তিভয়ক্রোধহীন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুনি বলে। যিনি সর্ব্ববিষয়ে মমতাশূন্য এবং শুভ বা অশুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিরক্ত হয়েন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন কূর্ম্ম স্বীয় অঙ্গসমূহকে গুটাইয়া রাখে, সেইরূপ যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই লীন রাখেন, তখনই তাঁহার প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না এমন দেহীর বিষয় সকল (বিষয়ানুভব) রস বর্জ্জন করে অর্থাৎ নিবৃত্তি পায় (কিন্তু ভোগেচ্ছা থাকে) পরন্তু স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরমাত্মাদর্শনে (পরমতত্ত্ব জানিলে) স্বভাবতই নিবৃত্তি পায়, (অর্থাৎ ভোগেচ্ছা থাকেনা)। হে কৌন্তেয় ! দুঃখপ্রদ ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষের জন্য চেষ্টাবান্ বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। যোগীব্যক্তিগণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া যোগযুক্ত (এবং) মৎপরায়ণ হইয়া থাকেন ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।··· অতএব, হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীতিত (আকর্ষিত, সংযত) হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ব্যাখ্যা—এই সাতটী শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণে জীবের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় আর তাহা সমাধিতে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান (এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট মতবাদ) লাভ সম্ভব হয় না। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। অতএব দেখা যায় যে এই অভিমত অনুযায়ী কোটীকে গুটী ব্যতীত তাঁহার মতবাদ কেহ গ্রহণ

করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিবে না। একমাত্র শুদ্ধচেতারা পারিবেন আর অর্জ্জুনের ন্যায় বিদ্বানরা প্রয়াস করিলে হয় ত সফল হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে কেন বিরত হইতে চাহেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া সযুক্তি ব্যাখ্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাষণ আরম্ভ কালে সাংখ্যযোগ বর্ণনপ্রারম্ভে মন্তব্য করেন : – "অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"।[১]

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যযোগ বর্ণনান্তে অর্জ্জুনের প্রশ্ন "স্থিত-প্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদি অত্যন্ত সমীচীন। পরন্তু বহু আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে একেবারে irrelevant। ইহা ভ্রান্ত বিচার। শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে প্রথমে "প্রজ্ঞের ন্যায় ভাষণ দিতেছ" বলিয়া অনুযোগ করেন, তাহার উত্তরে অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন অত্যন্ত সমীচীন। ইহা প্রক্ষিপ্ত নহে এবং হইতে পারে না।

সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্— সমুদয় মনোগত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিলে তবে—

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ— পরমাত্মাতে আত্মা স্বয়ং তুষ্ট হন ও যোগী প্রজ্ঞালাভ করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে[২] স্থূলশরীরের (অর্থাৎ জীবাত্মার আধারের) লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থূলশরীর গ্রহণ করিলেই ওই সকল বিকার জীবাত্মার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইবে। ইহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ইহাই প্রকৃতি। বিকার ও গুণ সমুদয় এই প্রকৃতজাত।[৩] এই প্রকৃতিজাত "সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ" (শরীরজ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা,

১। ২।১১ ২। ১৩।৬-৭ ৩। ১৩।২০

consciousness and resolution) জীবকে বিচারবুদ্ধি দেয় এবং সে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনন দ্বারা কর্ম্ম করে। এ কারণ কার্য্যকরণের কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতিকে মূল বলা হয়।[১] এ অবস্থায় বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া সমুদয় মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় তুষ্ট হইতে সক্ষম হইলে তবেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। এই প্রজ্ঞাই উপনিষদের উল্লিখিত বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিয়া প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে সাহায্য করে। ইহা প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা wisdom, technocracy নহে।

স্থিতধীঃ—যাঁহার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। অতএব সর্ব্বত্র নির্ম্মম ও স্নেহশূন্য; তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে সংহত এবং তাঁহার ভোগেচ্ছাও রহিত হয়। আর স্থিতধী না হইতে পারিলে বিবেকী পুরুষেরও মন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়।

নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ—(৬৮ শ্লোকে)—শুধু ইন্দ্রিয় বশীভূত করিলে চলিবে না; ইন্দ্রিয়সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিমুখ করিতে হইবে। যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ কোন মতেই আর বিষয় ভোগ করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না।

২.৪ স্বভাববিহিত কর্ম্মের বাহিরে বিষয়চিন্তার ফল – বিনাশ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

১। ১৩।২১

অন্বয়—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে ; সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে ; কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (উৎপদ্যতে)। ক্রোধাৎ সংমোহঃ (কার্যাকার্য্য-বিবেকাভাবঃ) ভবতি ; সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (ভবতি) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি) ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

অনুবাদ—বিষয় চিন্তারত ব্যক্তির সেই সকল বিষয়সমূহে আসক্তি জন্মে ; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে ; কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে কার্য্য-অকার্য্য বিবেচনা দূরীভূত হয় ; কার্য্যা-কার্য্য বিবেচনা শূন্য হইলে স্মৃতিভ্রংশ জন্মে ; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—এই দুইটী শ্লোকে কেন বিষয় সমূহে জীবের আসক্তি জন্মে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ জীবমাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই বিষয়চিন্তার ধরণধারণ বিশদভাবে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।[১] বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে these are a great warning। সাধারণ মানুষ ইহা হইতে সত্যই লাভবান হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞের লক্ষণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন কারণ অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে অহরহ বিষয় চিন্তা ও তাহার পরিণামের বিচারস্থান কোথায় ?

স্থিতপ্রজ্ঞের আলোচনা কালে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ "মনোগতান্ সর্ব্বান্" এর উল্লেখ করেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার প্রথম ও প্রধান ধাপ

১। ১৬।১০-১৮

যে সেই সকল বাসনা পরিত্যাগ, তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ দেন। বিষয় বাসনা যে কী ভীষণ ক্ষতিকারক, তাহা এই দুই শ্লোকে বিচার করিলেন। এই বিষয় বাসনায় শেষ পর্য্যন্ত জীবের বিনাশ সম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে প্রয়াস করেন তাঁহারা বিষয়ের ধ্যান হইতে শতযোজন দূরে অবস্থান করিবেন। ইহাই এই দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্য। আর বিষয় বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে রাগদ্বেষবর্জ্জিত হওয়া সুলভ হয় এবং তাহা হইলে সহজেই শাশ্বত শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন :

২.৫ কাঁহারা শাশ্বত শান্তি উপভোগ করেন ?

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

* * * *

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অন্বয়—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (ভুঞ্জানঃ) বিধেয়াত্মা (বশীকৃতান্তকরণঃ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। প্রসাদে (সতি) অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ (বিনাশঃ) উপজায়তে হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু (শীঘ্রং) পর্য্যবতিষ্ঠতে (সম্যক্ স্থিরা ভবতি)। অযুক্তস্য (অসমাহিতান্তঃকরণস্য) বুদ্ধিঃ ন অস্তি; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন (অস্তি); অভাবয়তঃ শান্তিঃ চ ন; অশান্তস্য সুখং কুতঃ। হি (যতঃ) মনঃ চরতাং (প্রবর্ত্তমানানাম্) ইন্দ্রিয়াণাং যৎ অনুবিধীয়তে (অনুগচ্ছতি) তৎ অস্য (যতেঃ) বায়ুঃ অম্ভসি (জলে) নাবং (নৌকাং) ইব প্রজ্ঞাং হরতি। সর্ব্বভূতানাং যা নিশা (আত্মনিষ্ঠা) তস্যাং (আত্মনিষ্ঠায়াং, ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং) সংযমী জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে) যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি জাগ্রতি সা (বিষয়নিষ্ঠা) [আত্মতত্ত্বং] পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা। যদ্ বৎ আপঃ আপূর্য্যমাণম্ (অপি) অচলপ্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্ বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি; ন (তু) কামকামী। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ (সন্) চরতি, স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—যিনি বিধেয়াত্মা (যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন), তিনি অনুরাগ, বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হন এবং আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া শান্তিলাভ করেন। আত্মপ্রসাদ জন্মিলে সকল দুঃখের নাশ হয়। কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থিত হয়। আত্মচিন্তাবিরত ব্যক্তির (অযুক্তের) বুদ্ধি নাই। অযুক্তের

ভাবনা অর্থাৎ চিন্তা নাই (অর্থাৎ চিন্তা করিবার কোন প্রয়াস নাই) অতএব তাহার শান্তি নাই; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুগমন করে, সে চিত্তবায়ু কর্ত্তৃক জলে ইতস্তত: বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার (বিবেক) বুদ্ধিকে বিক্ষিপ্ত করে। অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মদর্শী যোগীদের সেই রাত্রি। যেমন নদী সকলের জলরাশি স্থিরভাবে অবস্থিত সমুদ্রে পড়িয়া বিলীন হইতেছে, সেইরূপ কামনাসমূহ যাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিলীন হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন। কামী ব্যক্তিরা শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, মমতাবিহীন ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া চলেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা—এই সাতটী শ্লোকে অকৃত্রিম প্রসন্নতা লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হইলে প্রসন্নতা লাভের ব্যাঘাত ঘটে, আর জনসাধারণের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ সুকঠিন হয়। অতএব যোগী সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা এই ভারসাম্য যাহাতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। ইহার জন্য মনের এক বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং সেই প্রস্তুতি বিনা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি মানসিক স্বস্তি পাইতে পারা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত শান্তি পাইবার কোন আশা নাই এবং সমাজে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক কর্ম্মশক্তির বিকাশও সম্ভব নহে। শাশ্বত শান্তি পাইবার অধিকারী কাঁহারা—সে সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেব এই সাতটী শ্লোকে তাঁহার মন্তব্য করিয়াছেন।

এই শ্লোককয়টী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, যে ইহা আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের operational research। লক্ষ্য কি? প্রসন্নতা লাভ। কি করিয়া? "সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্" পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ মনের সমুদয় ইচ্ছার মোড় ঘুরাইয়া বিষয় হইতে "অন্তর্নিষ্ঠায়াং" মানসিক প্রতিষ্ঠা। এই মোড় ঘুরাইবার modus operandii কি?

সাধারণতঃ ও স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি বিষয়ভোগে রুচি। কিন্তু মনের সংকল্প বিকল্পাত্মক ধর্ম্মের সাহায্যে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জীব নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। এই process-এ কৃষ্ণবাসুদেবের এই সাতটী শ্লোকের নির্দ্দেশ বিশেষ ফলদায়ক। এতদ্ব্যতীত, এই মন্তব্যটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে বিষয়ভোগে শান্তি পাইবার কোন বাধা ঘটে না। তবে এই ভোগের একটী বিশেষ রীতি আছে। তাহা না মানিলে শান্তিলাভ সম্ভব হয় না এবং বিষয় বিষয়-ভোগীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ কারণ বিষয়ভোগের রীতি: রাগদ্বেষবর্জ্জিত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা বিষয় উপভোগ অর্থাৎ কামনা সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়া ভোগ্যবস্তুর সমুদয়ের উপভোগ। এই তত্ত্ব দুঃখনাশক, সুতরাং সুখবৃদ্ধির উপায়; আর এই অবস্থায় কর্ম্মশক্তির সম্যক্ স্ফুটন অত্যন্ত সহজ হয়। ইহাই উপনিষদের[১] বাণী:

ঈশবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

জগতে যাহা কিছু চঞ্চল, চলমান্, যথা জীবন যৌবন, সম্পদ প্রভৃতি—যাহা সহজে চলিয়া যায়, তৎসমুদয় পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত (অর্থাৎ এই সমস্ত ঈশ্বার দ্বারা controlled, তাঁহার

১। ঈশা ১।

আয়ত্তাধীন) এইরূপ ভাবে ভাবিত হইবে। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং", তিনি একাকী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, অতএব তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই না থাকায় "কস্যস্বিদ্ধনং", আর কাহারও আয়ত্তে (control এ) ধনসম্পত্তি ও উপভোগ্য বস্তু exist করে না।

যদিও এই সম্পদ ঈশার আয়ত্তাধীনে, তৎসমুদয় জীবের ভোগ করিতে কোন বাধা নাই। তবে ভোগ করিবার নীতি তিনি স্থির করিয়া দিয়াছেন। মানুষের ভোগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত কিন্তু লোভের পরিধি সীমাহীন; অতএব efficient living এর জন্য (পরিপূর্ণ জীবনের জন্য) যাহার যতটুকু প্রয়োজন তাহা ভোগ করিবে। তদধিক নিজের আয়ত্তে রাখিয়া অন্যকে তাহার প্রয়োজনীয় ভোগে বাধা ঘটাইবার অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না। প্রত্যেক জীব তাহার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর শ্রী, শুচি ও কল্যাণের দ্বারা সুস্থ ও সুন্দর করিবে, অকারণ সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিয়া কুবেরের বহুদ্বারা ভাণ্ডারের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া লোভোপহত হইয়া কৃপণের গুদামে পরিণত করিবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত সমস্তই ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু আবশ্যক তাহাই ভোগ করিবে। ইহার অধিক লোভ করিবে না। "ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে",[১] "তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত এমন অন্য পথ নাই, যদ্দারা (অশুভ) কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না।" ইহাই সমাজের প্রতিটী জীবের পূর্ণ প্রকাশের পথ আর অমৃতত্ব লাভের উপায়।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং—সাধারণ জীবের পক্ষে যখন রাত্রি, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তখন জাগরিত থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে এই শ্লোক এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আসলে তাহা

১। ঈশা ২।

নহে। যে প্রসঙ্গ লইয়া বিচার চলিতেছে, সেদিক দিয়া ইহার যথেষ্ট প্রাজুয্য আছে। "নিশা" শব্দটি গোল বাধাইয়াছে। প্রসন্নতা ও শাশ্বত শান্তি কী করিয়া সম্ভব? ইন্দ্রিয়াদিকে স্ববশে রাখিয়া পরিণাম-নির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম করিলেই তাহা সম্ভব। অর্থাৎ সম্যক আত্মনিষ্ঠ হইবার প্রয়াস। শব্দাদি বিষয় ভোগে অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়গণ যখন জীবকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে, জীব তখন বুদ্ধির সাহায্যে মনের দ্বারা বিচার করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইলে প্রসন্নতা লাভ করিবে। এইরূপ বিচার না করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ পরিশ্রম না করিয়া ঘুমাইয়া থাকিলে জড়তা ও মোহ ঘুচিবার কোন সম্ভাবনা হইবে না। "নিশা" শব্দে মহাভারতকার তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে—ইন্দ্রিয়াদি প্রাণবন্ত হইলেই তাহাদের কাজ করিবে অর্থাৎ জীবের মনে কামনা বাসনা জাগাইবে—ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু জীব সেই সকল কামনা বাসনাকে ডুবাইয়া দিবে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মসাগরে। স্বভাববিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে কোন সংকল্প নাই; কর্ম্ম ও তথাকথিত ফলের সহিত correlation নাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে এইরূপ কর্ম্মের গতি একনিষ্ঠা; ইহাতে চিত্ত-বিক্ষেপের কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ সম্ভাবনায় ইন্দ্রিয়দিগকে বিরুদ্ধে যাইবার কোন সুযোগ না দিয়া তাহাদিগের সহায়তায় স্বধর্ম্ম-পালন করিতে জীব তৎপর হইলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও মানসিক প্রসন্নতা সম্ভব হইবে এবং সে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইবে।[১]

১। কঠো ১৩।৯

২.৬ ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা কি?

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

অন্বয়—পার্থ! ব্রাহ্মী স্থিতি: (ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা) এষা, এনাং প্রাপ্য (পুরুষঃ) ন বিমুহ্যতি (সংসারমোহং ন আপ্নোতি); (যত:) অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা; এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানুষ মোহগ্রস্ত (লোকের আর সংসার বিষয়ে মুগ্ধ হইতে) হয় না; যিনি মৃত্যুকালে এই অবস্থায় থাকেন, তিনি (ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন) অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পান।

ব্যাখ্যা—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ—এষা অর্থাৎ প্রজ্ঞা, ইহা ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা। আধুনিক কালে এই প্রজ্ঞা (wisdom) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে (science & technocracy)-কে অনেকেই একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাও জ্ঞান; কিন্তু তাহা সংকল্পজাত এবং মানুষের সংকল্প নানাবিষয়ে ও নানাবিধ হওয়ায় তাহা একমুখী নহে এবং তজ্জনিত নিষ্ঠাও one single-pointed নহে, competitive। এ কথাই শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ অধ্যায়ে[১] বুঝাইয়াছেন। পরন্তু প্রজ্ঞা ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা। ইহা লাভ করিলে অন্য কিছু আর জানিবার এবং পাইবার থাকে না।[২] শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই পরে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন[৩]:

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

১। ১৬।১২-১৭ ২। ৭।২ ৩। ৬।২২

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

৩.০ হিংসাত্মক কর্ম্মে নিয়োগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় ও প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিশ্চিত নির্দ্দেশ প্রার্থনা

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—জনার্দ্দন কেশব! চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা, তৎ কিং ঘোরে (হিংসাত্মকে) কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি? ব্যামিশ্রেণ (সন্দেহোৎপাদকেন) ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব; তৎ একং (জ্ঞানং কর্ম্ম বা) নিশ্চিত্য বদ, যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জনার্দ্দন কেশব! যদি কর্ম্ম (যোগ) হইতে বুদ্ধি (জ্ঞানযোগ) তোমার মতে শ্রেয়ঃ মনে হয়, তবে এই হিংসাত্মক ভয়ানক কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ কেন? সন্দেহ উৎপাদক মিশ্রিত বাক্যের (কখনো জ্ঞানের, কখনো কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া, গোলমেলে ভাবের) দ্বারা আমার বুদ্ধিকে প্রায় মোহগ্রস্ত করিতেছ; এখন এমন একটী নিশ্চিত বচন বল যাহাতে মঙ্গল লাভ করি।

ব্যাখ্যা—গীতায় প্রধান দুটী বচন – জীব ও কর্ম্ম – বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যাহাতে জীব তৎকৃত কর্ম্মের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ জানিয়া এবং কৃত কর্ম্মফলে তাহার কতটুকু স্বত্ব ও প্রাপ্য-অংশ তাহা বুঝিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে ও সেইরূপ কর্ম্ম করে।

জীব বলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন – "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"[১] – অতএব জীব অমর। জীবের দেহ ও জীব পৃথক ; "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"।[২] তাহা হইলে জীবের আধার (অর্থাৎ দেহ) অনিত্য, জীব নিত্য – ইহাই প্রখ্যাত আত্মার অবিনাশত্ববাদ। কিন্তু জীব ভিন্ন ভিন্ন আধার গ্রহণ করিতে পারে এবং করে – অতএব জন্মান্তর একটী বাস্তব ঘটনা এবং প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা চিরন্তন ; ইঁহার কোন বিনাশ নাই।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ"।[৩] জীবের pulsation এর বিকাশের আরম্ভ করিয়া pulsation এর নিঃশেষ পর্য্যন্ত প্রতিটী ক্রিয়াই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম জীবাত্মার প্রকৃতি "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"[৪] জাত ও তৎগুণ-সমন্বিত-এবং-নিয়ন্ত্রিতস্বভাব-অনুযায়ী তাঁহার স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি জাত ক্ষেত্র বিশেষের বিশেষ আচরণ)।[৫] অতএব আসলে জীব তাহার কর্ম্ম অবশ হইয়া করে – ইহাতে কামনার স্থান নাই। সাধারণ জীব কিন্তু তাহা জানে না। শুদ্ধচেতা ব্যতীত সকল জীবের কর্ম্ম করা অনিবার্য্য।[৬] শ্রীকৃষ্ণের মতে এই কর্ম্ম বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডানুযায়ী কাম্য কর্ম্ম নহে। ইহা জীবের নিজ স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম–

১। ১৫।৭ ২। ২।২০ ৩। ৮।৩ ৪। ৭।১৪
৫। ১৪।৬-৭ ৬। ৩।৫

পালন এবং তাহাই জীবের পক্ষে পরম কল্যাণকর ও চরম কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবসমূহকে তিনভাগে ভাগ করিয়া – শুদ্ধচেতা, বিদ্বান ও জনসাধারণ[১] – পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবাদের ক্ষেত্র শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনগণ ও জনসাধারণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সীমিত করিয়া দিয়াছেন। স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই ইহাদের কর্ত্তব্য ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্বানরা পারিলেও অজ্ঞব্যক্তিরা এরূপভাবে (অর্থাৎ পরিণামনির্ব্বিশেষে নিষ্কামভাবে) কর্ম্ম করিতে পারিবে না। তাহারা সকাম ভাবে তাহাদের সঙ্কল্পজাত কর্ম্ম করিবে এবং এ বিষয়ে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ,[২] তাহাদের বুদ্ধি ভেদ উৎপন্ন করা উচিত নহে। তাহাদের সম্মুখে থাকিবে শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বানের কর্ম্মকরার আদর্শ।[৩]

এই সকল আলোচনার পটভূমিকা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই দুইটী মুখ্য বচন ব্যতীত গীতায় আরো অনেক গৌণ বচন আছে, যাহার অবতারণা অর্জ্জুনকে মুখ্য বচন বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। এই দুইটী মুখ্য সংবাদ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। সে কারণ ৭২টী শ্লোক সমেত দ্বিতীয় অধ্যায় দীর্ঘতম। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৭৮টী শ্লোক আছে বটে ; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যাহা কিছু বলিবার তৎসমুদয় বলার পর অর্জ্জুনকে ৭২ শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥

অতএব অষ্টাদশ অধ্যায় মূলতঃ ৭১টী শ্লোক সমন্বিত। সেই হেতু ইহা দীর্ঘতম নহে, দীর্ঘতর। ইহা অকারণ নহে। অর্জ্জুন শোকাকুল চিত্তে রণস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে বসিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ

১। ৩।১৬-১৭ ২। ৩।২৬-২৭ ৩। ৫।২১

যে সকল বচন তাঁহাকে শোনান (অর্থাৎ সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়) অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আর সময় লইবার প্রয়োজন হইত না। "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" অর্থাৎ এই ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা হইলে "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি", ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায়। মোক্ষলাভের পর, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অধিক ত আর কিছুই থাকিতে পারে না। উপনিষদ্ বলেন,[১]

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা প্রাপ্তির পর আর কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকিতে পারে না। তথাপি আরো ষোলটী অধ্যায় গীতায় সন্নিবেশিত আছে। ইহা হইতে মনে হয় গীতাকারের পরবর্ত্তী সূরীরা, বিশেষ করিয়া ভক্তিবাদীরা, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে দিয়া এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করান; আর পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় অর্জ্জুন কৃষ্ণবাসুদেবের এই জীবনদর্শন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, ক্রমান্বয় নানা প্রশ্ন তুলিয়া একই বিষয়বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধ আসন্ন, সময় অল্প, শ্রীকৃষ্ণ তখন বাধ্য হইয়া বলিলেন, তোমার আর মাথা ঘামাইতে হইবে না, আমার কথা শুনিয়া, আমি যেরূপ নির্দ্দেশ দিতেছি, সেইরূপ কর; তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইবে। অতএব পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে এই সব বিষয় পারস্পারিক আলোচনা করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের মাধ্যম অপেক্ষা ভক্তির মাধ্যম যে শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিগুণসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যতিরেকে অন্যেতর জীবের পক্ষে কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন ও অন্তে

১। মুণ্ডক ২।২।৮

ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির সুলভ ও প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা নিশ্চয় করিতে প্রয়াস পান।

দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে সমগ্র জীবকে কর্ম্মবাদ বুদ্ধিযোগের সাহায্যে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দেন। সে কারণ, স্বভাববিহিত স্বকর্ম্মকরণ, কর্ম্মত্যাগ ও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকরণের এক বিশদ আলোচনা করিয়া ফলাশা ত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই জীবের ইহলোকে কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠাসাধন সুলভে সম্ভব এবং অন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্তি সহজসাধ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া, কি করিয়া এই যোগ বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তন্নিমিত্ত এক বিস্তৃত অভ্যাস যোগ বর্ণনা করেন। আর মন্তব্য করিলেন,[১]

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥

কিন্তু পরক্ষণেই (বোধ হয় ইহাতে অর্জ্জুনের reaction যথোপযুক্ত favourable না হওয়ায় বুঝিলেন যে অর্জ্জুন তখনও তাঁহার মতবাদ যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, অতএব) আর অন্য কোনরূপ আলোচনার মধ্যে না গিয়া, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন এবং "সুনিশ্চিত" করিয়া নির্দ্দেশ দিলেন,[২]

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

এ কারণ কিয়ৎসংখ্যক আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে তৃতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়—এই ষোলটী অধ্যায় সহস্র সহস্র

১। ৬।৪৬ ২। ৬।৪৭

বৎসর ধরিয়া বহু জ্ঞানী ও গুণীর দ্বারা মূল গীতার সহিত সংযোজিত হইয়া আসিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্য অধুনা আমরা যে গীতাবচন পাই, তাহা স্থিরীকৃত করেন এবং বর্ত্তমান গীতা তাঁহারই সংকলন।

কিন্তু এইরূপ মতবাদ আর এক পক্ষ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে গীতার মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে "ভগবতী-মষ্টাদশাধ্যায়িনীম্"—অষ্টাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিতে অর্জ্জুন যে প্রজ্ঞালাভ করিয়া বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান ভয়াল গণহত্যা নিরোধ (অর্থাৎ লৌকিক-ভাবে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ") অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ—নিজ স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম মাধ্যম—শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রহণান্তর "করিষ্যে বচনং তব"—এইরূপ কোন বচন দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহার করেন নাই। তাছাড়া বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে অর্জ্জুন শুদ্ধচেতা কিংবা শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বান ছিলেন না, অন্ততঃ কৃষ্ণবাসুদেব তাঁহার সখাকে সেরূপ মনে করিতেন না। অতএব যে সব গূঢ়তত্ত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রাকারে আলোচিত হইয়াছে তাহা বিনা ব্যাখ্যায় অর্জ্জুনের পক্ষে বুঝা সহজ হইত না। এ কারণ ইঁহাদের মতে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের প্রশ্ন অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে আচার্য্য শঙ্করের সঙ্কলিত গীতাই যে সম্পূর্ণ গীতাবচন সেই সিদ্ধান্ত ইঁহাদের মতে ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

কর্ম্মণি ঘোরে—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে হিংসাত্মক ভয়ানক এক কর্ম্ম, ভীষণ এক genocide বিচার করিয়া তাঁহাতে যোগদান করিবার শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশকে অর্জ্জুন এইরূপ মনে করিতেছেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মবাদ বুঝিতে পারেন নাই।[১] তাছাড়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান পাওয়া যায় না এবং কেবল কর্ম্মত্যাগ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না—ইহাও অর্জ্জুন জানিতেন না[২]। এতদ্ব্যতীত, জীব ও তাহার কর্ম্মসম্বন্ধে অর্জ্জুনের ধারণা যে সঠিক নহে এবং তাহা ভ্রমাত্মক—তাহাও অর্জ্জুনের এই বক্তব্যে ধরা পড়িল।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন—অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে[৩] নিষ্ঠাবান্ শরণার্থী শিষ্যের ন্যায় যাহা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ আলোচনার পর অর্জ্জুনের পক্ষে এখন "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন" এইরূপ বচন ব্যবহার সত্যই মর্ম্মান্তিক ও দুঃখজনক। এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতেছে অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

৩.১ কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগের পার্থক্য

শ্রীভগবানুবাচ—

> লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
> জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥
> ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—অনঘ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্ম্মযোগেন যোগিনাং (কর্ম্মিণাম্)। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্যং

১। ৩।১ ২। ৩।২-৪ ৩। ২।৭

ন অশ্নুতে (কর্ম্মত্যাগস্য ফললাভং ন প্রাপ্নোতি) ; সন্ন্যাসনাৎ এবং চ (কর্ম্মত্যাগাৎ) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিলেন, হে নিষ্পাপ, এই জগতে দুই প্রকার নিষ্ঠার (সাধনার জন্য আশ্রিত মার্গের) কথা পূর্ব্বে[১] বলিয়াছি। জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের, কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগি-গণের। পুরুষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া (কর্ম্মের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া) নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ (কর্ম্মত্যাগের ফললাভ) করে না ; আবার সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) দ্বারাও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা—সাধনার জন্য আশ্রিত দুই প্রকার বিভিন্ন মার্গের, বিভিন্ন উপায়ের কথা বলা হইয়াছে ; জ্ঞানের মাধ্যম ও কর্ম্মের মাধ্যম। এই দুই উপায়ের, অধিকার ভেদে, যে কোন একটী উপায়ে জীব সিদ্ধিলাভ করে এবং তাহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। এই দুইটী মাধ্যম সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে ; ইহা আধুনিক কালের operations research এর ন্যায়।

কর্ম্মণামনারম্ভাৎ—কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মের বিরতি কখনো ঘটে না ; abstenance from work শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্মবিরতি এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি নহে। কারণ তাঁহার মতে কর্ম্ম "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ"[২] এবং তিনি বলেন "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"[৩] অতএব এমন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে কর্ম্মের বিষদাঁত কর্ম্মীকে আঘাত না করে। ইহা সত্যই এক বিরাট operational research।

১। ২।৩৯ ২। ৮।৩ ৩। ৩।৫

ন চ সন্ন্যসনাৎ—দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মের সম্পূর্ণ ত্যাগ সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত উপায় নহে। কারণ জীবের জীবদ্দশায় কর্ম্মের সম্পূর্ণ ত্যাগ হয় না ; "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।"[১]

৩.১.১ কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

অন্বয়—জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি ; প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সর্ব্বঃ অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ) [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ (বিষয়ান্) স্মরন্ আস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—কোন জীবই (জ্ঞানী বা অজ্ঞ) ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ; স্বভাবজাত গুণ সমূহই (সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ) মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ স্মরণ করে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলে।

ব্যাখ্যা—তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ—কর্ম্ম না করিয়া কোন জীবই থাকিতে পারে না—ইহা শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মের সংজ্ঞানুযায়ী, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ"। অতএব তাঁহার মতে দেহ জন্মিলে কর্ম্মের আরম্ভ

১। ৩।৮,৫।৮-৯

আবার দেহের বিনাশে কর্ম্মেরও সমাপ্তি। দেহাতীতের কোন কর্ম্মই নাই। পূর্ব্বে কর্ম্মকরার পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন আলোচনা কালে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম—এই মতের অনুচ্ছেদ (corollary) হিসাবে বলিতে হয় যে দেহের জন্মের সঙ্গে যখন কর্ম্মের জন্ম, তখন জীবের দেহের, তাহার ক্ষেত্রের স্বভাবজাত গুণ সমূহই মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়; দেহী নিষ্ক্রিয়। তিনি কেবল শক্তি যোগান। কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার pattern, তাহার end-product ইত্যাদি সব কিছুই দেহীর আশ্রয়ের, তাঁহার আধারের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত স্বভাবজাত স্বধর্ম্ম। দেহী আশ্রয় গ্রহণ করিলেই দেহীর শক্তিতে এই সবিকার ক্ষেত্র ও তাহার গুণাবলী (qualities and characteristics) ক্রিয়াবান্ হইয়া তাহাদের স্বভাবানুযায়ী কাজ করিতে থাকে[১] আর দেহী সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় অবস্থান কারন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মতে জীব অবশ হইয়া কর্ম্ম করেন। তাঁহার (অর্থাৎ জীবের) কিছু করিবার থাকে না—তাঁহার আশ্রয়ের প্রকৃতি—সব কিছু করে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অসীম সাহসিক এক মতবাদ, a most bold statement। এই মতবাদ গ্রহণ করিলে বিচারে দেখা যাইবে যে এই প্রকার কর্ম্ম অতিশয় শক্তিমান্, গতি ইহার অমোঘ[২] এবং ইহার বেগ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না; এমন কি জীবদেহে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও না।[৩] অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মসাধনে ব্যস্ত থাকেন। উপনিষদ্ বলেন,[৪]

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

১। ১৩।২-৭ ২। ৪।১৭ ৩। ৩।২২-২৪ ৪। কঠো ২।৩।৩

এই মতবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, জীব সকলেই যখন স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মসাধনে ব্যস্ত, তখন যদি এই কর্মের কোন প্রেরণা, কোন incentiveর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা জীবের প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব সকাম, নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া জগতে যাহা খ্যাত, তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই, তাহার কোন সার্থকতা নাই। ইহা steam rollerএর ন্যায় জীবের চলার পথ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং জীব সকল তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য—ইহার কোন অন্যথা হইতে পারে না এবং হয় না।[১]

এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। আজকালকার বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে ফলাশা ত্যাগ করিলে কাজ করিবার motivation থাকিবে না, মানুষকে দিয়া কোন কাজই করান যাইবে না। এ কারণ এই সকল বুদ্ধিজীবীদের বিচারানুযায়ী effort-cum-product বিশেষ প্রয়োজন এবং তন্নিমিত্ত remuneration is a Must। Effort নানা জাতীয়, product ও সেকারণ নানা রকমের, অতএব পুরস্কারও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত। এবং কর্ম্মের কর্ত্তার এই পুরস্কার পাওয়া আবশ্যক এবং সমাজের এই বিধি পোষণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন যে effort করিলে product জন্মিবে তবে তজ্জনিত একটী পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নাই এবং এই কর্ম্মফলের জন্য কর্ম্মকর্ত্তার কোন বাহাদুরী নাই; সে অবশ হইয়া কাজ করে আর তাহার প্রকৃতিজাত গুণসমুদয় প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কাজ করিয়া চলে। গতি ইহার অমোঘ এবং ইহার বেগ কেহই রোধ

১। ১৮।৫৯

করিতে পারে না। স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনের জন্য কোন প্রকার motivationএর প্রয়োজন নাই। Motivation Theory with all its corollaries is a myth। শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাঁহার এই মতানুযায়ী জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন সম্ভব; কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিগত ফললাভের আকাঙ্খা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মের, ordained dutyর অনুষ্ঠান করিবেন এবং তাহাতেই সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ।

য আস্তে মনসা স্মরন্—অনেকের ধারণা শারীরিক কোন কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিলে কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত। দেহস্থিত কর্ম্মেন্দ্রিয় সংহত হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসংজ্ঞার বিরুদ্ধে। মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণও কর্ম্ম। সর্ব্বতোভাবে শূন্য মন হইলে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয়। এইরূপ শূন্যমন যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু তাহা জীবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বর্ত্তমান লেখকের এইরূপ শূন্য মনের, vacant mindএর এক উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মহামতি রমণ মহর্ষি এইরূপ এক জীব ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যাইত যে তিনি ব্যবহারিক জগতে থাকিয়াও ইহার উর্দ্ধে থাকিতেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সম্মুখে দর্শনপ্রার্থী এই লেখকের দীর্ঘ পাঁচঘণ্টার অবস্থান সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গোচরের বহিভূত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ মানসিক শূন্যতা কোটিকে গুটীর। সে কারণ কৃষ্ণবাসুদেবের অভিমত, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ স্মরণ করে. সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলে।

৩·২ কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যান

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! যস্তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য (সমঙ্ নিরুধ্য) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুতিষ্ঠতি) অসক্তঃ (ফলাভিলাষশূন্যঃ) সঃ বিশিষ্যতে। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু; হি অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ; অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য) তে শরীরযাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ (ভবেৎ)। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ, কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ (সন্) তদর্থং কর্ম্ম সমাচর।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি ফলাভিলাষশূন্য; তিনিই প্রশংসার যোগ্য। (এ কারণ) তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিও, কারণ কর্ম্ম-না-করা অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ; সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর রক্ষা হইবে না। যজ্ঞার্থে (স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে) কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্যকর্ম্ম করিলেই মানুষ কর্ম্মে বদ্ধ হয়; হে কৌন্তেয়! অতএব (বিষয়) আসক্তি ত্যাগ করিয়া তৎ[১] (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভের জন্য কর্ম্ম করিও।

১। ২।৭২

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য—এই তিনটী শ্লোকের প্রাথমিক বিচারে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ জীবের তাহার কর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ইন্দ্রিয়সকল সংহত করিয়া কর্ম্মের মোড় ঘুরাইবার শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ বিচার পূর্ব্বমতের বিরুদ্ধ। "কার্য্যতে হ্যবশ: কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ"[১] তাহা হইলে কিরূপে সম্ভব হয়?

বিশেষ বিচারে দেখা যাইবে যে আপাতদৃষ্টিতে বিষম এই দুইটী বচন পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। যাঁহাদের অতি আধুনিক কালের computor যন্ত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন যে প্রত্যেকটী computor—তাহা যতই বিশাল ও শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন—তাহাকে একটী system of organisation, একটী বিশেষ computor designএর মধ্যে কাজ করিতে হয়। Computorটী সেই computor-designকে, সেই sytem of organisationকে অতিক্রম করিতে পারে না; তাহার গণনাশক্তি ও অন্যান্য কার্য করিবার শক্তি সেই design ও systemএর মধ্যে সীমিত। ঠিক অনুরূপ ভাবে জীবের দেহ—সবিকার ক্ষেত্র, তাহার গুণসমন্বিত (qualities and characteristics সমন্বিত) পরিবেশের মধ্যে[২] কার্য্য করে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই পরিবেশের মধ্যে সাধন করিতে হইবে।

আধুনিক কালে giant computor প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ ভাবে সে এমন একটা নূতন কিছু করিয়াছে যাহা তাহাকে অতিমানুষের পর্য্যায় লইয়া গিয়াছে এবং সে অচিরাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে (through Science and Technocracy) বিশেষ করিয়া Bio-Engineering ও Electronics বিজ্ঞানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিরাট এক

১। ৩।৫ ২। ১৩।৬-৭

Computor-মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্রান্তদর্শী করিবে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ আধুনিককালের একজন system organiser ছিলেন ; তিনি ইহাই প্রকৃষ্টভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সবিকার ক্ষেত্র, দেহীর শক্তির সাহায্যে, তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিজাত গুণ-(qualities and characteristics) সমন্বিত পরিধির মধ্যে কার্য্য করিতে পারিবে। এই পরিধির মধ্যে প্রকৃতির গুণানুযায়ী কাজ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার এই সবিকার ক্ষেত্রের—এখানেই তাহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ; এই বেষ্টনরেখাই শেষ সীমান্ত—ইহার মধ্যে ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার উদ্যম ও চেষ্টা এবং তাহার ফলে নব নব আবিষ্কার ও সৃষ্টি। আধুনিক যুগের A. M. Turing এর ন্যায় পণ্ডিতেরাও ইহা স্বীকার করিয়া বলেন, "no automata can produce anything original. Artificial intelligence is limited by its creator। শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।[১] এখানেও সবিকার ক্ষেত্র প্রকৃতিজাত গুণসমন্বিত পরিধির মধ্যে স্রষ্টার (system organiser) সাহায্যে porgrammer হইয়া ইন্দ্রিয়াদিকে চালনা করিয়া ইচ্ছামত ফলপ্রসূ হয়।[২]

এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া অর্জ্জুনকে পরে বুঝাইয়াছিলেন।[৩]

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥

কৃষ্ণবাসুদেবের এই মন্তব্যটী স্মরণ রাখিয়া পরের কয়েকটী শ্লোকে সবিকার ক্ষেত্রের বিষয় মনে রাখিলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বচনের মধ্যে কোনরূপ পারস্পরিক বিরোধ লক্ষিত হইবে না। দেহী কেবল দৃষ্টি

১। ১৩।৩ ২। কঠো ১।৩।৩-৬ ৩। ১৩।৪

দেন, শক্তি জোগান ; আর দেহ তাহার বিশেষ গুণানুযায়ী আধুনিক কালের এক অতিকায় computor এর ন্যায় কাজ করিয়া যায়।

অতএব দেহ জীবাত্মার শক্তির সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে মনের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক গুণের দ্বারা সংহত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করিতে পারে—অবশ্য এই সমস্ত দেহগত মূল প্রকৃতির অব্যক্তের চৌহদ্দির মধ্যে।[১]

অসক্তঃ স বিশিষ্যতে—Computorএর উদাহরণে এই **বচনটী** ঠিক বুঝা যায় না। Computor তাহার design, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে; ইহাতে কোন কামনার স্থান নাই। একটী নিশ্চিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কাজ ও সেইমত হইয়া যাইতেছে। ইহা পূর্ব্বকথিত steam roller কৃত চলার পথে জীবের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া এ স্থলে অসক্তের স্থান কোথায়?

একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, কোন কোন দেহ-ক্ষেত্রে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এরূপভাবে কাজ করিতে পারে ও করে যে সেই দেহ-computor, শক্তি থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধমাত্র যোগবিয়োগ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিশেষ কাজ করে না। অতএব নির্দ্দিষ্ট design ছাড়া আর অন্য কোনরূপ end-product এর দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইরূপ বিচারে মনে হইতে পারে যে তাহা হইলে এই সকল দেহ-computorএর নিজস্ব (artificial) intellect ও personality (বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ব্যতীত সেই শক্তি আছে যাহা কেবল জীবাত্মায় সম্ভব।[২] এ বিষয় লইয়া পশ্চিম দেশে আধুনিক কালে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এই সব পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিশালকায়

১। ১৩।৬-৭ ২। Norbert Wiener-Cybernetics

computor এরও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের ঊর্দ্ধে এরূপ স্বকীয় কোন বিচার শক্তি নাই।[১]

কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ – কর্ম্ম-না-করা অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়: ; এই মন্তব্যটী আর এক নূতন গোল বাধাইয়াছে। পূর্ব্বে[২] শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এখন বলিতেছেন কর্ম্ম-না-করা অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়:। তাহা হইলে মনে হয় কর্ম্ম-না-করা সম্ভব ; কিন্তু কর্ম্ম-না-করা ত শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে। দেহ ধারণ করিলেই কর্ম্ম করা অপরিত্যজ্য, inevitable।

দেহ ধারণ করিলেই যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা দৈহিক। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলেও শরীর রক্ষা হইবে না। এই প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জৈবিক কর্ম্ম ব্যতীত জীবের সংসারজীবন আছে ; সেই জীবনযাপনে যে কর্ম্ম করিতে হয় শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাহারই উল্লেখ করিলেন : সংসারজীবনে কর্ম্ম-না-করা অপেক্ষা তাঁহার মতানুযায়ী স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনরূপ কর্ম্ম করা জীবের পক্ষে শ্রেয়: এবং তাহা হইলে কর্ম্মের বিষদাঁতের অমোঘ আঘাত হইতে জীব রক্ষা পাইতে পারে।[৩] সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কীরূপে কর্ম্ম করা সত্ত্বেও কর্ম্মের আঘাত হইতে জীব নিজেকে বাঁচাইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আর এই সকল নির্দ্দেশ নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টাই বিরাট এক operational research।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র – দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকরার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, এই শ্লোকে

১। A. M. Turing ২। ৩।৫ ৩। ৪।১০-১২

তাহার পুনরুল্লেখ করিলেন। তাঁহার মতে একমুখী (অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন) কর্মপ্রচেষ্টা সর্বোত্তম; বহুমুখী (বেদের কর্মকাণ্ডানুযায়ী) কর্মপ্রচেষ্টা কামনাপরায়ণ, অতএব "কর্মবন্ধন।" এ কারণ

মুক্তসঙ্গঃ সমাচর—আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরিণামনির্ব্বিশেষে কর্ম কর। স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন করিলে আসক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না, তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। দেহ ধারণ করিলে কর্ম না করা অসম্ভব। দৈহিক কর্মব্যতীত সমাজসংস্থার অন্তর্গত যে বর্ণাশ্রমধর্ম, যে সাংসারিক কর্ত্তব্য জীবের করিতে হয়, তাহা একটী বিশেষভাবে সম্পন্ন না হইলে জীবের বন্ধনের কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ: পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন করা। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডানুযায়ী কর্ম করিলে বন্ধন অতিনিশ্চিত, কারণ সেই সকল কর্ম সঙ্কল্পজাত।

ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিহিত স্বধর্ম ধর্মযুদ্ধ। ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়াও অর্জ্জুন তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, তজ্জন্য নানাবিধ কারণ দেখান এবং স্বভাববিহিত কর্মত্যাগ করিয়া রথের উপর তুষ্ণীভাবে বসিয়া থাকেন। অর্জ্জুনের এরূপ ব্যবহার যে অধর্মোচিত ও অশাস্ত্রীয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। অর্জ্জুন তাঁহার কৃতকর্মের ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা ভ্রমাত্মক বিচার; এরূপ বিচার পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালনের বিরুদ্ধ। অতএব জীব "মুক্তসঙ্গ" হইয়া স্বধর্মপালন করিবে।

৩.২.১ জনসাধারণের জন্য কর্ম্মবাদের বিশেষ বিশ্লেষণ

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

অন্বয়—পুরা প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং (বৃদ্ধিং লভধ্বং); এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুষ্মাকং) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু। অনেন (যজ্ঞেন) [যূয়ং] দেবান্ ভাবয়িত। (আপ্যায়িতান্ কুরুত); তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (সংবর্দ্ধয়ন্তঃ) পরং শ্রেয়ঃ (অভিষ্টমর্থম্) অবাপ্স্যথ। দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ (যুষ্মভ্যং) দাস্যন্তে হি; (অতঃ) তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (অন্নাদীন্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় যঃ (স্বয়ং) ভুঙ্‌ক্তে, সঃ স্তেনঃ (চৌরঃ)

এব। যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ (বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে; যে তু আত্মকারণাৎ (আত্মনঃ ভোজনার্থং) পচন্তি, তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপং) এব ভুঞ্জতে। অন্নাৎ ভূতানি (প্রাণিনঃ) ভবন্তি (জায়ন্তে), পর্জ্জনাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ, পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি (উৎপদ্যতে), যজ্ঞঃ তু) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্মণঃ উৎপন্নঃ)। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবং (পরব্রহ্মসমুৎপন্নং), তস্মাৎ সর্ব্বগতং নিত্যং (অবিনাশি) ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যঃ ন ইহ অনুবর্ত্তয়তি, পার্থ! অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ সঃ মোঘং জীবতি।

অনুবাদ—পুরাকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভিষ্টপ্রদ হইবে। এবং এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। দেবগণও যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল তোমাদিগকে প্রদান করিবেন; তাঁহাদের প্রদত্ত সেই ভোগ্য বস্তুসকল তাঁহাদিগকে না দিয়া যে নিজে ভোগ করে সে চোর। জীব যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করিয়া (অর্থাৎ দেবগণকে দিয়া যিনি খান) সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল আত্মকারণে, কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য পাক করে, সেই পাপীগণ দুঃখভোগ করে। প্রাণীগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ (বৃষ্টি) হইতে অন্ন হয়; যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং সমুদয় যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। এবং ওই কর্ম্ম ব্রহ্ম (বেদ) হইতে উদ্ভূত জানিও, ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর (পরমাত্মা) হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্ব্বগতব্রহ্ম (বেদ) যজ্ঞে নিত্য

প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকার প্রবর্ত্তিত চক্র (cycle) যে ইহলোকে অনুসরণ করে না, হে পার্থ, সেই পাপজীবী ইন্দ্রিয়সেবী বৃথা জীবিত থাকে।

ব্যাখ্যা—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা—পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্ম যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর, —অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্—যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রত্যেক জীব সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন করিতে তাহাকে অনুজ্ঞা করেন এবং বলেন যে এইরূপ কাজ করিলে জীব বৃদ্ধি পাইবে ও অভীষ্ট লাভ করিবে। He created all men to each his duty. "Do this", he said and "you shall prosper."

এই শ্লোকে ও ইহার পর কয়েকটী শ্লোকে যজ্ঞ শব্দের অর্থ এবং নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। দশ হইতে পনেরো শ্লোকে যজ্ঞ বলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম বুঝাইতে চাহিয়াছেন; আর নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থ বলিতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কর্ম্ম বুঝাইয়াছেন। ওই শ্লোকে "তদর্থং" শব্দ ইহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

নবম শ্লোকে কর্ম্ম করিবার কৌশল ও অনুজ্ঞা শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের জন্য আর বর্ত্তমান কয়েকটী শ্লোক জনসাধারণের জন্য। এই প্রসঙ্গে গীতাবচন বুঝিতে একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; নচেৎ গীতাবচনের মধ্যে বহুবিধ পারস্পরিক বিরোধ ও contradiction দেখা দিবে। শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে ভাগ করিয়াছেন[১]; শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্ ও জনসাধারণ।

১। ৩।১৬-১৭

শুদ্ধচেতা—ইঁহারা ত্রিগুণের অতীত এবং বিচার আলোচনার বাহিরে ; ইঁহারা জ্ঞানী। শরীর রক্ষা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে কেবলমাত্র লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন, যথা নিমি, জনকাদি ঋষিরা ; ইঁহারা কোটিকে গুটী।

বিদ্বান্—ইঁহারা প্রকৃতিস্থ গুণত্রয় দ্বারা অভিভূত। জীবের প্রকৃতিস্থ সত্ত্বাদি গুণানুযায়ী ইঁহাদের ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ এবং সামাজিক স্তর ও তদনুযায়ী বৃত্তি স্থিরীকৃত হয়। সামাজিক স্তর, বৃত্তি ও আশ্রম ভেদে কর্ম্মও ভিন্ন এবং সেইরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা। ইঁহারা নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রানুমোদিত স্বধর্ম্মানুযায়ী প্রয়াস ও কর্ম্ম করার অভ্যাস করেন। পরে ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসাধনা ও "আপনি আচরি" লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। "তদেকচিত্ত" হইলে এই ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসাধনা সহজ হয় এবং অন্তে তদাশ্রয় ও নৈষ্কর্ম্ম্য সুলভ হয়। ইঁহারা লোকপাল, রাষ্ট্রশাসক, সমাজরক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক।

সাধারণ জীব—ইহারা দৈবাসুর মিশ্রপ্রকৃতির স্বভাবপ্রাপ্ত। নিজের কর্ম্মের নিজেই কর্ত্তা ও ভোক্তা—এই মনোভাবপ্রাপ্ত ; এইরূপ

মনোভাব ইহাদের জীবনে ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় উৎকর্ষ ও সাফল্য আনে। তজ্জন্য ইহাদের এই মনোভাব বিচলিত করা উচিত নহে। ইহাদের সংসার বাস অপরিত্যাজ্য এবং তজ্জন্য সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণী-বিভাগ অনিবার্য্য। এই সমাজব্যবস্থানুযায়ী স্ব স্ব কর্ম্ম করিলে তাঁহারই অর্চ্চনা করা হয় এবং তদ্দ্বারা ইহারা সিদ্ধিলাভ করে। এ ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিরা তাহাদের ইষ্ট দেবতার মাধ্যমে তাঁহারই পূজা করে আর প্রচলিত বিবিধ দেবদেবীর পূজা ইহাদেরই ইষ্টদেবের পূজা। এইরূপে মোক্ষলাভ সম্ভব, কিন্তু চাই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। অতএব সাধারণ জীবও মোক্ষলাভ করে, কিন্তু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতি, modus operandii পৃথক।

জীব সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ মনে রাখিয়া গীতা পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে গীতায় যে সকল পারস্পরিক বৈষম্য দেখা যায়, তাহার মীমাংসা সহজ হইবে এবং আরো দেখা যাইবে যে ইহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অনুজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের জন্য — সকল শ্রেণীর জন্য নহে।

যজ্ঞঃ—গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান[১] যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এমন কি বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ — স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ[২]। আবার সংযমঅগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি, অপানে প্রাণ-আহুতি ও কুম্ভকাদি প্রক্রিয়াও যজ্ঞ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন "নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।"[৩] অযজ্ঞের ইহকাল, পরকাল নাই। অতএব তাঁহার মতে সকলেরই কোন ও না কোন যজ্ঞ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞ মনীষীদিগের চিত্তশুদ্ধিকর,[৪] "পাবনানি মনীষিণাম্।" অতএব জীবের অধিকার ভেদে জীবের প্রকৃতির পার্থক্য

১। ৪।২৫-৩০ ২। ৪।২৮ ৩। ৪।৩২ ৪। ১৮।৫

অনুযায়ী যজ্ঞের রূপেরও বিভিন্নতা—অনেকে অনেক প্রকার যজ্ঞ করেন—দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রাণ ইত্যাদির আহুতি, দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ, কুম্ভক প্রাণায়ামাদি যজ্ঞ। এই প্রকার অনেক যজ্ঞই ব্রহ্মার মুখে বর্ণিত হইয়াছে।[১] শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজের মত না বলিয়া ব্রহ্মার মুখের কথা অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ—যজ্ঞ সমাধা করিতে দেহের প্রয়োজন; অতএব পঞ্চমহাভুত ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা।[২] জীব ও প্রকৃতির যুগ্ম প্রচেষ্টায় জীবের বৃদ্ধি ও প্রকৃতির, (nature, বহিঃ প্রকৃতির) পঞ্চ মহাভূতের (ইন্দ্রাদিদেবগণের) সংবর্দ্ধন। সংসারে ও সমাজে প্রতিটী কর্ম্মফলই (end-product) এই যুগ্ম প্রচেষ্টায় সম্ভূত। অতএব জীব এই endproduct হইতে প্রকৃতিকে (ইন্দ্রাদিদেবগণকে) তাহায় ন্যায্য অংশ না দিয়া সমস্তই নিজে ভোগ করিলে তাহার পক্ষে চৌর্য্যাপরাধ হইবে।[৩] একটী সহজ উদাহরণে বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। প্রকৃতি (ক্ষিতি) জাত অরণ্য—মানুষ যদি এই অরণ্য সম্পদ endproduct তৈয়ারী করিতে ব বহার করে, কিন্তু তাহার পুনরাবাসনের (affrostationএর) ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে অচিরাৎ মানুষ এই বিশেষ ক্ষিতিজাত সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে। [ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Nature never forgives, nor forgets] অতএব আদান প্রদানের বিশেষ প্রয়োজন। একটী উদাহরণ[৪] দিয়া এক হইতে অপরের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাই মন্তব্য[৫] করিয়াছেন,

---

১। ৪।৩২ ২। ১৩।৬ ৩। ৩।১২ ৪। ৩।১৪-১৬ ৫। ৩।১৬

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মত – এই আদানপ্রদান চক্রের অনুসরণ যে না করে, সে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম; তাহার জীবনই বৃথা। তবে যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সংসার ও সমাজ-জীবনের একটী অতিশয় fundamental সমস্যার সংশয়হীন সমাধান করিয়াছেন। সমাজ ও সংসার জীবনে প্রায় সব কিছুই যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল। তাহা হইলে সমস্যা: কী ভাবে এই যুগ্মকর্ম্মীদিগের মধ্যে কর্ম্মফল সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায়। আবহমান কাল হইতে সমাজরক্ষকরা তাঁহাদের নিজনিজ মতানুযায়ী ইহার এক ন্যায্য ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রচারিত এই সকল বণ্টন ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই; আর আধুনিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতের কাছে এই সমস্যা এক অতি গুরুসমস্যা। বর্ত্তমান জগৎ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃ শিল্প নির্ভর (industrial) হইয়া পড়িতেছে এবং যন্ত্রের প্রয়োগে এই যুগ্মপ্রচেষ্টার রূপও প্রায় সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া অত্যন্ত complex হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। আর বণ্টনব্যাপারটী জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। বাস্তববাদী শ্রীকৃষ্ণ সমাজের এই সমস্যার কথা জানিতেন এবং ব্যবহারিক জীবনে ইহার সুষম এক বণ্টন না হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে বুঝিয়া দৃঢ়তার সহিত উপরি-উক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।[১]

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

১। ৩।১৩

শুধু তাহাই নহে, এই নির্দ্দেশে আর একটী শাশ্বতবাণী প্রচার করিয়াছেন। সমাজে শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনগণ ব্যতীত যে দুর্ব্বল অতিকায় জনসাধারণ আছে তাহারা অপর দুই শ্রেণীর দ্বারা যাহাতে নিষ্পেশিত কিংবা পীড়িত হইতে না পারে তজ্জন্য এক বৈজ্ঞানিক সমাজসংস্কার ব্যবস্থা করেন[১] এবং এই শ্লোকে অনুজ্ঞা করেন যে, যে সকল জীব আত্মকারণে, কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য পাক (ধনোপার্জ্জন) করে, সেই পাপীগণ দুঃখভোগ করে। ইহার তাৎপর্য্য, প্রত্যেক সাংসারিক জীব নিজেকে রক্ষা করিতে কর্ম্ম করিবেনই, তদ্ব্যতীত পরার্থেও ধনোপার্জ্জন করিবেন। তাহা না হইলে সমাজের যে অংশ কোনরূপ অর্জ্জন করিতে পারে না, কিংবা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে তাহাদের সংসার যাপন সম্ভব হয় না, তাহারা সমাজের গ্লানি হইয়া সমাজজীবনের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকিবে। একারণ পরার্থে কিয়দংশ নিজ শক্তি-অনুযায়ী পৃথক করিয়া রাখা সাংসারিক জীবের পক্ষে অবশ্য করণীয়—to set apart a portion of one's own income for others is a Must। আর পল্লীসমাজ যখন অতিকায়রূপ গ্রহণ করে—যেমন আধুনিক কালের রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রশাসক জনগণের উপার্জ্জনের এক অংশ সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যবহার করিবেন। এইরূপে সমাজে আদানপ্রদানের চক্র প্রবর্ত্তিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের মতে এই প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তী যে না হয়, সে জীব পাপাত্মা ; সে চোর এবং তাহার জীবনই বৃথা। অপরপক্ষে যাহারা যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করে (অর্থাৎ ভোগ করে) তাহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদের পক্ষে শান্তিলাভ ও সমৃদ্ধিলাভও সুনিশ্চিত এমন কি ব্রহ্মলাভও সুলভ।[২]

১। ৪।১৩ ২। ৩।১৩

এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের Tax-Evasion-এর, কর ফাঁকী দেওয়ার বিষয় বিচার করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববিচারে দেখা গিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রত্যেক সামাজিক জীবের উপার্জ্জনের এক অংশ অন্যের জন্য – অতএব যুগ্ম প্রস্তুতকারকের জন্য (কারণ বর্ত্তমান সমাজ-জীবনে প্রত্যেকই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল) পৃথক করিয়া রাখিবে। সমাজ যখন অতিকায় রূপ নেয় – যেমন আধুনিক রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রই করের মাধ্যমে এই পৃথক ভাগ সংগ্রহ করিয়া আদান প্রদান চক্র চালু রাখে। অতএব যাহারা এই কর না দেয় কিংবা যাহারা যাহার যাহা দেয় তদপেক্ষা কম দেয়, তাহারা অতি নীচ এবং শ্রীকৃষ্ণের মতে স্তেন – চোর। কৃষ্ণবাসুদেব এই সকল কর-ফাঁকীদারদিগের সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।[১] "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" – যাহারা কেবল আপনার জন্য, কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য পাক করে তাহারা পাপই ভোজন করে।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—কর্ম ব্রহ্ম (বেদ) হইতে উদ্ভূত জানিও। যজ্ঞাদি সমুদয় কর্ম্ম বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী কর্ত্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সংসার ও সমাজের কার্য্য-অকার্য্য ব্যবস্থার (নির্ণয়ের) জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রই যে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যনির্ণায়ক, তাহা বিশেষভাবে মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, শাস্ত্রে যে বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়া ইহলোকে জীবের কর্ম্মকরা উচিত[২] অতএব দেখা যাইতেছে কৃষ্ণবাসুদেবের মতে যজ্ঞ সমুদয় বেদানুযায়ী এবং বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী অক্ষর যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সরল কথায়, বেদোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিলে জীবের পরম কর্ত্তব্য পালন করা হইবে এবং সে ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে

১। ৩।১৩ ২। ১৬।২৪

সমাজের প্রতিটী শ্রেণী—শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্‌ও জনসাধারণ—অনাসক্ত হইয়া সতত করণীয়কর্ম্ম সবিধি সমাচরণ করিলে, পরমাগতি পায়।[১]

৩.৩ তিনপ্রকার জীব: শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্‌ ও জনসাধারণ

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

অন্বয়—সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি। যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব চ আত্মতৃপ্তঃ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।

অনুবাদ—হে পার্থ! সেই (আদান-প্রদান চক্র যে ইহলোকে অনুসরণ না করে) পাপজীবী ইন্দ্রিয়সেবী বৃথা জীবিত থাকে। কিন্তু যে মানব আত্মরতি, (আত্মজ্ঞানে অনুরক্ত) এবং আত্মতৃপ্ত এবং আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকে (অর্থাৎ বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ থাকে) তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

ব্যাখ্যা—**ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং জীবতি**—এই দুই শ্লোকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুই প্রকার জীবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে তিন প্রকার জীবের কর্ম্মকরা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে; যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অর্থাৎ বিজ্ঞজন ও জনসাধারণ, আর যাহারা আত্মরতি। আত্মরতিরা শুদ্ধচেতা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ১৭,১৮ ও ২০শ শ্লোকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; পূর্ব্বেই ১০ হইতে

১। ১৩.১৯

১৬ শ্লোকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবের কর্ম্মকরা সম্বন্ধে আলোচনান্তে এবিষয়ে তাঁহার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। বিদ্বানরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ইঁহারা প্রকৃতিস্থ গুণত্রয়দ্বারা অভিভূত। কিন্তু তাঁহারা স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালনে প্রয়াসী অর্থাৎ নিষ্কামভাবে পরিণামনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের কর্ত্তব্যকরণে সচেষ্ট। কিন্তু জনসাধারণ সকাম ও ফলাভিলাষী কর্ম্মী। অতএব সাংসারিক জীব তিন প্রকারের। ইহাদের মধ্যে শুদ্ধচেতাদিগের

কার্য্যং ন বিদ্যতে—শুদ্ধচেতার কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। কেবলমাত্র শরীর রক্ষা করিতে জৈবিক কর্ম করেন। আর করেন লোকসংগ্রহার্থে, লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া।[১]

৩.৪ শুদ্ধচেতার কর্ম্ম করার পদ্ধতি নির্দ্দেশ

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতো জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

অন্বয়—ইহ (জগতে) কৃতেন তস্য (আত্মবিদঃ) অর্থঃ নৈব (অস্তি); অকৃতেন চ (কর্ম্মণা) কশ্চনঃ (প্রত্যবায়ঃ) ন (অস্তি); অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধঃ) ন (অস্তি)।

১। ১৩।২০

তস্মাৎ অসক্তঃ (সন্) সততং কার্য্যম্ কর্ম্ম সমাচর ; হি (যস্মাৎ) অসক্তঃ (সন্) কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরম্ (মোক্ষম্) আপ্নোতি। জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিং (মোক্ষং) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ; লোকসংগ্রহং (লোকস্য স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং) এব সম্পশ্যন্ অপি (ত্বং কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ অর্হসি [ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—ইহলোকে তাঁহাদের (আত্মরতিদিগের) কর্ম্ম করিবার অর্থ (প্রয়োজন ও সার্থকতা) নাই ; না করিলেও কোনও ক্ষতি নাই ; তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অপরের উপর কোনও নির্ভর নাই (অর্থাৎ যে মানুষ আত্মরতি, তাঁহার যজ্ঞ করা-না-করা সমান)। জনকাদি কর্ম্মদ্বারা সংসিদ্ধি পাইয়াছিলেন। লোক সকলের স্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার (অর্জ্জুনের) কর্ম্ম করা উচিত।

ব্যাখ্যা—লোকসংগ্রহম্ সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি—শুদ্ধ-চেতাদিগের "কার্য্যং ন বিদ্যতে"[১] ; তথাপি তাঁহারা কেন কাজ করেন তাহার কারণ এই প্রসঙ্গে আলোচনা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ : স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন জীবের পরম কর্ত্তব্য। যেহেতু সাধারণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তির অনুকরণ করে, সে নিমিত্ত এই বিশেষ শ্রেণীর জীবের কার্য্য-কর্ম্ম না থাকিলেও স্বধর্ম্মপালন করা উচিত। পরবর্ত্তী ২১ হইতে ২৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার নিজেরও মানবশরীরে যে কর্ম্মকরার প্রয়োজন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। যেহেতু অর্জ্জুন লোকপাল, রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম—ধর্ম্মযুদ্ধ করা, পরিণাম যাহাই হউক না কেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের মতে সাধারণ সংসারেও

১। ৩।১৭

পিতামাতা তাহাদের সংসারের ও নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া একটী বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিবে যাহাতে তাহাদের সন্তান সন্ততি সেই আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া তথাকথিত কুতার্কিক সমাজবিপ্লবীর catching phraseএ মোহিত হইয়া না পড়ে এবং শাশ্বত সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিয়া তাহাদের সংসারের পরম কল্যাণ সাধন করে ও অবশেষে পরমাগতি লাভ করে। একারণ জনসাধারণের পক্ষে গীতার বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে এবং গীতায় সর্ব্বকালের উপযোগী জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের নিমিত্ত কর্ম্মকরার পদ্ধতি সত্যই শ্রেষ্ঠ সাধনাপদ্ধতি। It is for optimisation of human actions in the society

অসক্ত : সন্—অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা সহজ নহে ; জনসাধারণের পক্ষে ইহা শুধু অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও বটে। এ প্রসঙ্গে **প্রশ্ন :** যাহারা নিকট ফল দৃষ্ট হয় না, তাহার পক্ষে কি করিয়া কর্ম্মের বিধান ফলিত হওয়া সম্ভব ? প্রয়োজন না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম্ম করিয়া থাকে ? লৌকিক ভাবে, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে" ; বিদ্বানের কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজন বোধ না থাকিলে কোন মূর্খও কাজে প্রবর্ত্তিত হয় না।

এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। মনের এরূপ অবস্থা অজ্ঞ-ব্যক্তির ; সাধারণে তাহাদের কর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, sensitive। এ কারণ, তাহারা কোন কর্ম্ম করিয়া জয়ী হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং পরাজিত হইলে মুহ্যমান্ হইয়া প্রায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা কিন্তু স্বধর্ম্মপালনের উদ্দেশেই কর্ম্ম করেন আর কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে নিবেদন করেন। তাঁহারা ফল ভাল হইলে আত্মহারা হয়েন না কিংবা ফল মন্দ হইলে একেবারেই বিচলিত হন্

না। কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের মানসিক ভারসাম্যের কোনরূপ বিকার ঘটে না। তাঁহারা জানেন যে স্বধর্মানুযায়ী কর্ম করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন এবং তাহা যথাযথ ভাবে করিতে অসমর্থ হইলে কিংবা কর্ত্তব্যপালনে কোনরূপে অবহেলা করিলে পাপভাগী হইবেন।

এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

কিন্তু এই অনুশাসন পণ্ডিতদিগের জন্য। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন ;

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"[১]

কর্ম্মসঙ্গী (ফললোভে কর্ম্মাসক্ত) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ (নিজ আচরণের দ্বারা লৌকিক কর্ত্তব্যকর্ম্মে সংশয়) জন্মাবেন না। আর শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনকে সাবধান করিয়া অনুজ্ঞা করিলেন,[২]

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥

অবিদ্বান্‌রা যেমন কর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমনি লোকসংগ্রহার্থে (লোকশিক্ষা-তথা-লোকরক্ষার্থে) অভিলাষী হইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবেন। এইরূপ না হইলে, কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হইবে এবং জনসাধারণ একটী সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানকালে সমগ্র জগতে, কি উন্নত, কি উন্নতশীল কিংবা কি

১। ৩।২৬ ২। ৩।২৫

অনুন্নত দেশে একদল তথাকথিত সমাজবিপ্লবীরা তাহাদের কুতর্কের সাহায্যে জনসাধারণকে শাশ্বত সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া বিরাট এক নৈরাজ্যের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই ভয়ঙ্কর সামাজিক অবস্থায় কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশ বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবে কিনা প্রণিধান করা উচিত।

পরমাপ্নোতি পুরুষঃ—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অসীম সাহসিক statement এর পুনরুক্তি করিলেন। মন্তব্য করিলেন যে জীব মাত্রই যদি তাহার স্বভাবহিত স্বধর্ম্ম পালন করে তাহা হইলে পরমপদ (মোক্ষ) পাইবে। পূর্ব্বেই বিচারে দেখা গিয়াছে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে কোন আসক্তির, কোন কামনার স্থান নাই ; অতএব পরিণামনির্ব্বিশেষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে সকল জীবই পরমাগতি পাইবে। প্রশ্নঃ, স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম কি? তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় এবং তাহা যথাযথ নির্দ্ধারণ করিলেও মানব-জীবনে কীরূপে তাহাকে রূপায়িত করা যায়—ইহা এক বিরাট operational research এবং অতি আধুনিক praxiology বিজ্ঞান তাহার ব্যবস্থা করিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছে। আর কৃষ্ণবাসুদেব বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত এক সমাজসংস্কার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গুণান্বিত কর্ম্মব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন আর বিশদ ব্যবহারের ও আচরণের জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন,[১]

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

১। ১৬।২৪

৩.৪.১ শ্রেষ্ঠব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তি তাহাই অনুসরণ করে

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

অম্বয়—শ্রেষ্ঠ (জনঃ) যৎ যৎ (কর্ম্ম) আচরতি, ইতরঃ (অজ্ঞঃ) জনঃ তৎ তৎ (কর্ম্ম আচরতি) ; সঃ (শ্রেষ্ঠঃ জনঃ) যৎ (কর্ম্মশাস্ত্রং) প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ (জনসাধারণঃ) তৎ অনুবর্ত্ততে।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর (সাধারণ) জনও সেই সেই কর্ম্ম আচরণ করে ; মহৎ ব্যক্তিরা যাহা প্রমাণ করেন (পালনীয় বলিয়া গণ্য করেন, অথবা প্রমাণ স্থাপন করেন, lays down as standard of conduct) সাধারণ ব্যক্তিরা তাহার অনুবর্ত্তী হয়।

ব্যাখ্যা—স যৎ প্রমাণং কুরুতে—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গীতা উপনিষদ্ নির্ভর। বহুস্থলে বিবিধ উপনিষদের বাণী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ কারণ মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে "সর্ব্বোপনিষদো গাবো" এবং "দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ"। বর্ত্তমান শ্লোক তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রথম বল্লীর অন্তর্গত একাদশ অনুবাকের ধ্বনি।

এ ছাড়া বাস্তববাদী শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে সংসার ও সমাজে শুদ্ধচেতা কোটিকে গুটী এবং বিদ্বজ্জনও মুষ্টিমেয়। কিন্তু তাঁহারাই সমাজ পরিচালনা করেন এবং অতিকায় জনগণ তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। এ কারণ শুদ্ধচেতারা লোকশিক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ স্বজাতীয় সামাজিক রীতি অনুযায়ী

কর্ম্ম পালন করিয়া এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিবেন যাহাতে এই অতিকায় মানবসমাজ সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ মার্গ অনুসরণ করিতে পারে।

এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও মানবদেহে তাঁহার কর্ত্তব্য করেন।

৩.৫ শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্য কিছুই নাই : তথাপি তিনি কাজ করেন

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অন্বয় পার্থ। মে কর্ত্তব্যং নাস্তি (যতঃ) ত্রিষু লোকেষু (মম) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্তম্) অবাপ্তব্যঞ্চ (প্রাপ্যঞ্চ) কিঞ্চন অস্তি (তথাহি অহং) কর্ম্মণি বর্ত্তে এব। পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) (সন্) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম, (তদা) হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে। চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং; (তর্হি ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ, অহং চ সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্; ইমা প্রজাঃ উপহন্যাম্।

অনুবাদ—হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। কারণ, হে পার্থ! যদি আমি কখনও অনলস হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিত। যদি আমি কর্ম্ম না

করিতাম, এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইত ; আমিও শৃঙ্খলানাশের কর্ত্তা হইতাম আর এই সকল প্রজা নষ্ট করিতাম।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ—শুদ্ধচেতাদিগের কাম্যকর্ম্ম কিছুই নাই; শ্রীকৃষ্ণও নিজে একজন শুদ্ধচেতা। তাঁহারও কাম্যকর্ম্ম কিছুই নাই তথাপি তিনি নিজে অতন্দ্রিত হইয়া, অনলস হইয়া বিধিবদ্ধ নিজের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনি ইহার কারণ দেখাইয়াছেন যে সাধারণ মনুষ্যগণ অনুকরণশীল, তাহারা শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা করেন তাহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে, সে সমাজ অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ তখন সামাজিক কোন স্তরে আর শৃঙ্খলাবোধ থাকিবে না; সঙ্করের আবির্ভাব হইয়া সমুদয় প্রজা বিনাশের দিকে চলিতে থাকিবে। অতএব অর্জ্জুন একজন রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক হিসাবে এই বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

আধুনিক কালে পশ্চিমবঙ্গে ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া কেন্দ্র-তথা-রাজ্য পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলিতে কর্ম্মকরার পদ্ধতি পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রায় সর্ব্বত্র এক বিরাট বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এক শ্রেণীর শাসকবর্গের অতিকায় লোভ ও তন্নিবন্ধন জনগণের যথাযথ উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয় শোষণ আর এক শ্রেণীর নেতার সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। এই নবনেতৃবর্গ জনগণকে শাশ্বত সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া তথাকথিত এক লোভহীন, কর্ত্তব্যপরায়ণ সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর, চিত্তবিমোহনকারী, নানাবিধ পুষ্পিত-

বাক্য ও catching phrase-যুক্ত তর্কের অবতারণা করিয়া নব সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার প্রয়াস করিয়া এক বিরাট বিশৃঙ্খলার দিকে সমগ্র সমাজকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সংসারের ও সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য করায় পূর্ব্বের বলিষ্ঠ আদর্শ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সকল তথাকথিত "শ্রেষ্ঠ" ব্যক্তিরা নিষ্কামভাবে ও নির্ভয়ে তাঁহাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না কিংবা করিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ পরে[১] আমাদের এইরূপ অবস্থার কথা মনে রাখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে "কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ।" ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত এমন কেহই নাই যিনি কৃষ্ণবাসুদেবোক্ত[২] সমাজসেবী কিংবা রাষ্ট্রশাসকের গুণে গুণান্বিত।

> যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
> হর্ষামর্ষাভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
> অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
> সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
> শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
> তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

ভারতবর্ষে এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা রোধ করিয়া পুনরায় এক সুষ্ঠু

১। ৪।২ ২। ১২।১৫-১৯

ও প্রকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দ্দেশ কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

৩.৬ শুদ্ধচেতা লোকসংগ্রহার্থ কার্য্য করিবেন

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

অন্বয়—ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা (কর্ম্মাণি) কুর্ব্বন্তি, বিদ্বান্ (অপি) অসক্তঃ (সন্) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছুঃ) তথা কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—(অতএব) হে ভারত! অজ্ঞেরা (অবিদ্বানরা) যেমন কর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকরে, বিদ্বানগণ তেমনই লোকসংগ্রহে (নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষার ও তাহার শিক্ষার) অভিলাষী হইয়া অনাসক্ত ভাবে সেইরূপ করিবেন।

ব্যাখ্যা — অসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"[১] সকলকেই – শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্ ও জনসাধারণকে (অজ্ঞ) – কর্ম্ম করিতেই হইবে। তাঁহার নির্দ্দেশ, শুদ্ধচেতার কাম্যকর্ম না থাকিলেও সাধারণজীবকে সামাজিক আদর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তন করিতে নিজেরা "অসক্ত" হইয়া কার্য্য করিবেন। এইরূপ কর্ম্মকরাকে জনগণ, এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও, নিষ্কামভাবে কর্ম্মকরা আখ্যা দেন। অতএব ইঁহাদের কর্ম্মকরা "সর্ব্বভূতায়, বহুজনহিতায়"। ইঁহারা

১। ৩।৫

সমাজরক্ষার অনুকূল কর্ম্ম করেন এবং স্বকীয় ব্যবহারে এমন এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন যাহাতে জনসাধারণও সেই আদর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিতে প্রলুব্ধ হইয়া সমাজরক্ষায় সহায়তা করে।

একটী উদাহরণে বিষয়টী পরিষ্কার করা যায়। একজন সাধারণ জীব যদি পিতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে, গৃহকর্ত্তা হিসাবে সাংসারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ অনুযায়ী জীবনযাপন করেন তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহার কর্ম্ম সকাম হইলেও তাহা সত্যই নিষ্কাম। নিজেকে সুস্থ রাখা সকাম কর্ম্ম নহে ; কারণ সমাজে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য লইয়াই নাগরিক স্বাস্থ্য। সেইরূপ যদি পিতা হিসাবে একজন জীব তাহার পুত্রকন্যাকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করিয়া উত্তরকালে সুস্থ, সবল, সভ্য ও সার্থক নাগরিক করিয়া তুলিতে পারেন, তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহাই হিন্দু সমাজের আদর্শ। এ কারণ হিন্দুর সংসারের নির্দ্দেশ, পুত্রকে বালগোপাল ও কন্যাকে উমারূপে সেবার দ্বারা লালন পালন করা। সংসারে ও সমাজে তাহার অন্যান্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই বিধিসম্মত হওয়া প্রয়োজন ; "যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয়চিত্তম্" — কালোবাজারে অর্থোপার্জ্জন নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। কোন জীব যদি যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য সবিধি সমাজরক্ষার অনুকূল কর্ম্ম করে এবং তাহার ফলে সে স্বয়ং উপকৃত হয়, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম। এ কারণ সনাতনধর্ম্মনির্ভর হিন্দুসমাজ চিরকাল লক্ষ্মীর শ্রী ও শুচিতা এবং কুবেরের বহুর মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য দেখিয়া আসিয়াছে এবং নির্দ্দেশ দিয়াছে যে গৃহস্থ তাহার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর শ্রী ও শুচির দ্বারা সুশ্রী, সুন্দর ও কল্যাণময় করিয়া তুলিবে ; অকারণ সঞ্চয় ও সংগ্রহ দ্বারা নিজের ভাণ্ডারের সৌন্দর্য্য ও শুচিতা নষ্ট করিয়া লোভোপহত হইয়া সেই ভাণ্ডারকে কুবেরের বহুদ্বারা কৃপণের গুদামে পরিণত করিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের ভোগের

ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ; কিন্তু লোভের পরিধি সীমাহীন। এ কারণ ভোগের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ ; "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"

অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম লক্ষ্যহীন কর্ম্ম নহে। "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে" — এ কথা অজ্ঞের। মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম্ম বিনা উদ্দেশ্যে করিতে পারে না — সে কারণ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা, পরিণাম-নির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জন এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিয়া সমাজে কর্ম্ম করার একটী শাশ্বত, সুনির্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ, সুগমমার্গ প্রতিষ্ঠা করিবেন যাহাতে জনসাধারণ সেই পথে চলিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন করিয়া তাহাদের সংসারের পরম কল্যাণ ও শেষে পরমাগতি লাভ করিতে পারে।

৩.৬.১ অজ্ঞব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

অন্বয়—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (নোৎপাদয়েৎ); (অপি তু) বিদ্বান্ (স্বয়ং) যুক্তঃ (অবহিতঃ) (সন্) সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ (কর্ম্মণি) যোজয়েৎ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ

কর্ম্মাণি (লৌকিকানি বৈদিকানি চ) ক্রিয়মাণানি ; (কিন্তু) অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (জনঃ) "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে। তু মহাবাহো ! গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ (স্বরূপবেত্তাঃ) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে (নতু অহং) ইতি মত্বা ন সজ্জতে (কর্তৃত্বা-ভিনিবেশং ন করোতি) ।প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণৈঃ সংমূঢ়াঃ) (যে জনাঃ) গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে ; কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দমতান্) ন বিচালয়েৎ।

অনুবাদ—কর্ম্মাসক্ত (ফললোভে আসক্ত) অজ্ঞব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ (নিজ আচরণ দ্বারা লৌকিক কর্ত্তব্যকর্ম্মে সংশয়) জন্মাইবেন না (অর্থাৎ কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হইয়া কর্ম্মফল নিষ্ফল প্রমাণ করিলে তাহাদিগের (অজ্ঞব্যক্তিদিগের) বুদ্ধি বিচলিত হইবে)। বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি সাবধান হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন। (তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে বিদ্বানরা কর্ম্ম করেন না) প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সকল প্রকার কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত পুরুষ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে। কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মা যে পৃথক—এই তত্ত্ব যে জানেন সেই তত্ত্ববিৎ (শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান) ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে (আমি নিঃসঙ্গ) জানিয়া কর্ম্মের জন্য কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করেন। (অপরপক্ষে) প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া অজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ আমারই গুণ, আমারই কর্ম্ম এই ভাবে); (এ কারণ) সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে বিচলিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা—২৭, ২৮ ও ২৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম কে করে—তাহা

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। কর্মের real (সত্যকারের) কর্তা যে জীবের প্রকৃতির গুণসমূহ এবং সেই গুণসমূহ দ্বারা সকল প্রকার কর্ম ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে—ইহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে না। তাহারা জানে যে তাহারাই তাহাদের কর্মের কর্তা ও তাহাদের সেই কর্মের ফল তাহারাই ভোগ করিবে। "যেমন কর্ম তেমনি ফল" ইহাদের মজ্জাগত ; জীবমাত্রই যে প্রকৃতিদত্ত নিজ-গুণাবলীর বশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও জীবনযাপন করে—এই চরম সত্য তাহারা জানে না এবং তাহাদের এই পরমতত্ত্ব বলিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী ; সে কারণ শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান্‌দিগকে সাবধান করিয়া নির্দ্দেশ দিলেন যে "তোমরা নিজের আচরণ দ্বারা লৌকিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে জনগণের সংশয় জন্মাইবে না ; তোমরা কর্মযোগযুক্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম সবিধি সমাচরন করিয়া লোক-সেবা করিবে এবং জনগণের জন্য সঠিক কর্মকরণের এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই অসীম সাহসিক কর্ম্মবাদ আধুনিক কালের motivation ও incentive একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।" সর্ব্বকালে সকল প্রকার সমাজ ব্যবস্থায় দেখা গিয়াছে লাভ অলাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এক শ্রেণীর জীব কর্ম করিয়া যায়—কি তাহাদের প্রেরণা, কি তাহাদের incentive ? তাহারা স্বীয় প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া কাজ করিয়া থাকে। অতএব আধুনিক কালের effort-cum-product সত্য হইলেও, product-cum-remuneration is really a myth। সর্ব্বকালেই বিশেষ করিয়া আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজজীবনে এক শ্রেণীর লোভী সমাজমুখ্যরা নিজেদের স্বার্থে, লোভাপহত হয়ে দুর্ব্বলচিত্ত জীবকে লোভ দেখাইয়া, incentive

দ্বিয়া, অধিক product ফলাইয়া তাহাদিগের নিজের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার চেষ্টা করে। ইহারা সমাজের কলঙ্ক, সংসারের শত্রু "সংসারেষু নরাধমান্।" শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মনোভাব ষোড়শ অধ্যায়ে[১] অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। Karl Marx প্রভৃতি সামাজিক আদর্শবাদীরাও মনে করেন যে নির্ভেজাল, অকৃত্রিম communistic (perfect communistic order-এ) সমাজব্যবস্থায় remuneration এর concept demolition হইয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় লক্ষ্যণীয়। শ্রীকৃষ্ণ জীবের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কর্মের কর্তৃত্বেরও একটী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের আট হইতে ষোল পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রজাপতি প্রবর্ত্তিত কর্মচক্র সাধারণ ও বিদ্বানের জন্য নির্দ্দেশ দেন। সেখানেও "অসক্ত" হইয়া কর্মকরার একটী ইঙ্গিত আছে এবং সেইরূপে কর্ম করিতে পারিলে কর্মের বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—ইহাও ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু সত্যই কে কর্ম করে, তখন কর্মের কর্তৃত্বের কোন বিশ্লেষণ করিলেন না, কারণ এই বিশ্লেষণ এই সকল জীবের পক্ষে বুঝা শক্ত। ইহার পর মন্তব্য করিলেন যে শুদ্ধচেতার কোন কর্মের প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রজাশাসনের জন্য জনকাদি কর্ম করিয়া সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ দিলেন, "তোমারও সেরূপভাবে কাজ করা উচিত, কারণ তুমিও সমাজরক্ষক এবং রাষ্ট্রশাসক। যেহেতু সাধারণ জীব অনুকরণশীল, জ্ঞানীও নিজ-আচরণের দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা ও তাহার শিক্ষার অভিলাষী হইয়া অসক্ত হইয়া কাজ করিবেন। তাহা না হইলে জনসাধারণ একটী সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে পারিবে না এবং

১। ১৬।৭-১৯

কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত হইবে। অতএব বিদ্বানব্যক্তি কর্ম্মযোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম সমাচরিত করিয়া লোকসেবা করিবেন ; "বহুজনহিতায়, বহুজনসেবার্থৈঃ।"

প্রশ্ন : শুদ্ধচেতার ন্যায় বিদ্বজ্জনও 'অসক্ত' হইয়া লোক সংগ্রহার্থ কাজ করিবেন কেন ? তাহার কারণ দেখাইয়াছেন সাতাশ হইতে উনত্রিশ শ্লোকে। এই তিনটী শ্লোকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কৃত কর্ম্মের আসল কর্ত্তা কে ? দেহী, না দেহস্থিত প্রকৃতি ? ক্ষেত্রজ্ঞ, না সবিকার ক্ষেত্র ? তাঁহার দৃঢ় সিদ্ধান্ত : "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।"

বহু আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বলেন এই তিনটী শ্লোক এখানে অপ্রাসঙ্গিক, অতএব প্রক্ষিপ্ত। তাঁহাদের যুক্তি, যদি জীবের প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্ম্ম-সকল ক্রিয়মাণ হয়, তাহা হইলে সদাচার, code of ethics, দোষী-নির্দ্দোষের স্থান কোথায় ? এই মত সমাজে ও সংসারে প্রতিষ্ঠা পাইলে, সমস্ত সংসার ও সমাজে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটিবে এবং বাস্তবভাবে সমাজে বাস করা অসম্ভব হইবে। এই অধ্যায়ে আলোচিত শ্রীকৃষ্ণের জীবের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম করার পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এইরূপ যুক্তি ভ্রমাত্মক। এই তিনটী শ্লোকে উক্ত মন্তব্য কেবলমাত্র বিদ্বজ্জনের জন্য। অর্জ্জুন শুদ্ধচেতা হইলে এইরূপ বচনের প্রয়োজন হইত না, কারণ শুদ্ধচেতারা জানেন "কে কাজ করে ?" আর জনসাধারণ কোনক্রমেই এই মন্তব্যের হদিশ করিতে পারিবে না, ইহা তাহাদের সর্ব্বাবগতির বাহিরে। অতএব এই তিনটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ত নয়ই, বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত relevant।

৩.৭ শ্রীকৃষ্ণোক্ত কর্ম্মবাদানুযায়ী কর্ম্ম করার কৌশল

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

৩.৭.১ শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ উক্তি : তাঁহার কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধবাদীরা বিমূঢ় ও নষ্ট

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

অন্বয়—অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমর্প্য) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (বিগতশোকঃ) (সন্) যুধ্যস্ব। যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ (সন্তঃ) মে ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে। যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ (সন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি, অচেতসঃ তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—(অতএব) আমাতে (পরমেশ্বরে) সমস্ত কর্ম্ম (ফল) সমর্পণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা (বিচার করিয়া) [প্রকৃতি দত্ত গুণাবলীর বশে জীবমাত্রেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ ভাবিয়া] নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর (স্বীয় স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালন কর)। যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইয়া (এই উপদেশের মিথ্যা ছিদ্র অনুসন্ধান না করিয়া) আমার অনুমোদিত এই বিধি নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন) হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা অসূয়া পরবশ

হইয়া (বেদের প্রাধান্যহানির ভয়ে বিদ্বেষগ্রস্ত হইয়া) আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়া জানিবে।

ব্যাখ্যা—ময়ি সন্ন্যস্য – এই শব্দ দুটী বিশেষ গোল বাধাইয়াছে। পূর্ব্বে[১] শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্ঞাবানদিগের লক্ষণ বিশ্লেষণ করিতে "যুক্ত আসীত মৎপরঃ "বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন—অর্জ্জুন তখন তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য, import বুঝিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরুপাণ্ডবের গৃহবিবাদে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যাহা কিছু বক্তব্য তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে অর্জ্জুন তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণোক্ত) বিষয়বস্তু সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তখন আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার শেষ ধন্বন্তরী হিসাবে shock therapyর ব্যবস্থা করিতে একটী মৃদু আঘাত, a mild shock হানেন। তিনি নিজে যে কে এবং এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কী part লইতেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একষষ্ঠী শ্লোকে তাহার এক সামান্য ইঙ্গিত, a slight hint প্রথমে দেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে কেবল যুক্তির দ্বারা, বিচারের মাধ্যমে অর্জ্জুনকে সত্যবস্তুর ধারণা করান সম্ভব হইবে না এবং অর্জ্জুনের অহঙ্কার নিবন্ধন "মাথা না ঘামিয়ে" তাঁহার বচন, আপ্তবাক্য হিসাবে, গ্রহণ করাইয়া তন্নির্দ্দিষ্ট উপদেশমত কার্য্য করানও অর্জ্জুনের অহমিকার জন্য সম্ভব হইবে না। কিন্তু এইরূপ একটী মৃদু আঘাতেও কাজ হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নির্দ্দেশের বিশদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বিচারের সঙ্গে সঙ্গে যে এইরূপ আঘাতেরও বিশেষ প্রয়োজন, পরে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে[২]।

১। ২।৬১ ২। ২।৬৯, ৩।৩০, ৪।১০-১১, ৫।২৯, ৬।৩১,৫৭

কিন্তু বহু বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য নির্দেশ অপেক্ষা তাঁহার উপর নির্ভরকরাকে উৎসাহ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা উল্লেখ করেন[১] "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ"। "তানি (সকল ইন্দ্রিয়কে) সংযত করিয়া যোগীগণ যোগযুক্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের বিধি অনুযায়ী কাজ না করিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়া মদ্ভক্ত অনুজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করিবে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া কার্য্য কর্ম্ম করিবে।" এইরূপ বাক্য শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে[২] পুনরুক্তি করিলেন : "আত্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা আমাতে সর্ব্ব কর্ম (ফল) সন্ন্যস্ত করিয়া, নিরাশী (ফলাশা শূন্য) হইয়া মমতা ও শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" তাঁহারা আরো বলেন যে ইহার পরে[৩] দুইটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে "তাঁহার মত, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবাদ অনুবর্ত্তন করিলে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় আর যাহারা বেদের প্রাধান্যহানির ভয়ে বিদ্বেষগ্রস্ত হইয়া তাহা করে না সেই সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় চৈতন্যহীন মানবগণকে নষ্ট বলিয়া জানিবে।"

এরূপ যুক্তি ভ্রমাত্মক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনচল্লিশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া তিপান্ন শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথাও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে বলেন নি। সর্ব্বত্রই "বুদ্ধিযোগাৎ" কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। যখন দেখিলেন অর্জ্জুন তাঁহার উপদেশ ও অনুজ্ঞার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছে না, তখন এই অধ্যায়ের শেষের দিকে[৪] "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই নির্দ্দেশ দিলেন। ইহার অর্থ, "অর্জ্জুন, তুমি বেদবিরুদ্ধ, মদ্ভক্ত কর্ম্মবাদের import, তাৎপর্য্য, বিবেকবুদ্ধি দ্বারা

১। ২।৬১ ২। ৩।৩০ ৩। ৩।৩১-৩২ ৪। ২।৬১

বিশ্লেষণ করিয়া "মৎপরঃ" হও।" তৃতীয় অধ্যায়ে সেই অনুজ্ঞারই পুনরুক্তি, "ময়ি সন্ন্যস্য"। ইহা তাঁহার উপর অন্ধবিশ্বাস রাখিবার আজ্ঞা বা উপদেশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে। গৌণ উদ্দেশ্যও তাঁহার একটী ছিল। তিনি এই সুযোগে জীবন-দর্শনের চরম ব্যাখ্যাও করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ ভাবে বিদিত ও পণ্ডিতজন দ্বারা স্বীকৃত যে শ্রীকৃষ্ণের সময় সমাজে বেদের প্রাধান্য challenge করিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না। সে কালে বৈদিক কাম্যকর্ম্ম পালনই সৎধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত ছিল। ইহাই বেদবাদ এবং এই বেদবাদের বিরুদ্ধে কেহই কোন মতবাদ প্রচার করিতে সাহস করেন নাই। এমন কি সাংখ্যকার কপিলের ন্যায় বলিষ্ঠ একজন প্রতিভাধর দার্শনিক চিন্তাবিদ্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহজেই অস্বীকার করিলেও বেদবিরুদ্ধ কিছু বলিতে সাহস পান নাই। শ্রীকৃষ্ণই প্রথম বৈদিক কাম্যকর্ম্ম ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মপালনের এক তুলনামূলক আলোচনা[১] করিয়া তাঁহার প্রখ্যাত মতবাদ—নিষ্কামভাবে স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্ম পালনই যে সৎধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মাচরণেই পরমাগতি লাভ অত্যন্ত সুলভ—তাহা প্রচার করেন এবং অবিচলিত স্থৈর্য্য, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, লোকোত্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি ও স্বকীয় অসীম সাহসিকতার সহিত তাহা অর্জ্জুনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন,[২]

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥

১। ২।৪১-৪৬ ২। ৩।৩১-৩২

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে জীবের কর্ম্ম শক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের বীজ এবং রহস্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মযোগে উপ্ত ও অভিব্যক্ত।

৩৮ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়মত : সকল জীবই স্বীয় প্রকৃতিঅনুযায়ী কর্ম্ম করে : অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে। (যথা) ভূতানি প্রকৃতিং (এব) যান্তি (স্বভাবমেবনুবর্ত্তন্তে); (অতঃ) (ইন্দ্রিয়স্য) নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং) অর্থে (স্বস্ববিষয়ে) রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ; তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ; তৌ হি অস্য (কৃষ্ণানুমোদিতমার্গস্য) পরিপন্থিনৌ।

অনুবাদ—জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী (প্রকৃতিজ নিজ গুণাবলীর বশে) চেষ্টা করেন (কার্য্যে প্রবৃত্ত হন); (যেমন সাধারণ) প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। (তাহা হইলে ইন্দ্রিয়) নিগ্রহ আর কি করিবে? (সবলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল ও বৃথা)। প্রতিটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ে (অর্থাৎ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই) রাগ (প্রীতি, সুখ) দ্বেষ (অপ্রীতি, কষ্ট) ব্যবস্থিত (সংলগ্ন) আছে। সেই সকল অনুভূতির (রাগ দ্বেষের)

বশে আসিবে না ; কারণ তাহারা এর (আমার অনুমোদিত মার্গের) পরিপন্থী।

ব্যাখ্যা—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—সংসারের ও সমাজের একটী উচ্চস্তরের অনুশাসন, "সংযম করিতে চেষ্টা কর।" বিচার বুদ্ধির দ্বারা (সবলে) ইন্দ্রিয়সংযম করা প্রয়োজন এবং তাহা উচ্চস্তর জীবনযাপনের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহাই লৌকিক নিয়ম ও সামাজিক বিচার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন, "সবলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নিষ্ফল ও বৃথা"। কারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি হউন, সাধারণ জীব হউক, সকলেই স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতির নিজগুণাবলীর বশে অবশ হইয়া কার্য্য করেন।[১] অতএব পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রচেষ্টায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই সুখ দুঃখ থাকিবে, তাহা ইন্দ্রিয়গত—জীবাত্মার আধারের। জীবাত্মা যতদিন এই আধার আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিবেন, ততদিন এইরূপ রাগ দ্বেষ ঘটিতে থাকিবে। অতএব এই সকল রাগ দ্বেষকে recognise করা, আমল দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই।

৩.৯ সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সকলাঙ্গসংপূরণেন কৃতাৎ) পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ (কিঞ্চিদঙ্গশূন্যঃ) (অপি) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ ; স্বধর্ম্মে নিধনং (অপি) শ্রেয়ঃ, (তু) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ॥

১। ৩।৫

অনুবাদ—স্বধর্ম্ম (নিজ স্বভাবের অনুযায়ী কর্ম্মসংবলিত ধর্ম্ম) বিগুণ হইলেও (অঙ্গহীন অর্থাৎ অপর ধর্ম্মের তুলনায় তাহাতে কোন বাঞ্ছিতগুণের অভাব থাকিলেও) সু-অনুষ্ঠিত (লৌকিক দৃষ্টিতে সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত) পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয় (অধিকতর হিতকর)। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ [স্বপ্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিপৎ-সঙ্কুল, risky and allergic]।

ব্যাখ্যা—শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দেহ থাকিলে কর্ম ; দেহাতীতের কোনরূপ কর্ম্ম নাই। আর জীবাত্মার শক্তিতে তাঁহার আধার স্বীয় প্রকৃতি ও তজ্জাত গুণত্রয়দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জীবমাত্রই তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতির নিজ গুণাবলীর বশে অবশ হইয়া কাজ করে। শুধু তাহাই নহে, জীবের সকল অবস্থাতেই তাহার ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, সামাজিক স্তর ও তদনুযায়ী বৃত্তি এই গুণানুসারে স্থিরীকৃত হয়[১]—ইহা শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিয়া দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিলেন,[২] যে ভূলোকে এবং স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের মতে, সৃষ্টি হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত জীবের আজীবন প্রতিটী ক্রিয়াই (activity) কর্ম্ম[৩] এই অবস্থায়, জীবের প্রতিটী ক্রিয়া যদি তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তাহার জীবনকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিয়া পূর্ণস্ফুটন করা ত দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই তাহার পক্ষে এক বিরাট বিড়ম্বনা হইয়া উঠিবে। প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভূমিকার অভিনয় দু'চার দিন চলিতে পারে। সারাজীবন স্বীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভূমিকার অভিনয় করা এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা। Dr.

১। ১৮।১৯-৩৯ ২। ১৮।৪০ ৩। ৮।৩

Jekyll and Mr. Hyde হওয়া দু'চার বৎসর সম্ভব ; স্বীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করিলে সমস্ত জীবনে এক অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ও তন্নিমিত্ত ক্ষত স্বকীয় সত্তাকে শেষ করিয়া দিবে।

এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় নির্দ্দেশ, স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন কর। তাহাই জীবের পক্ষে বাস্তব এবং ইহাই জীবকে চরম কল্যাণ ও পরমাগতি লাভে সহায়তা করিবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার এই স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইহা অত্যন্ত বাস্তব। এই প্রসঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার একটী বিশেষ অবদানের কথা স্মরণীয়। আজকাল প্রায়শঃ রোগীকে বাহির হইতে রক্ত তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে রোগের সহিত যুঝিতে শক্তি যোগান হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া তাহার রক্তের প্রকৃতি জানিয়া সেই প্রকৃতির রক্তই ব্যবহার করেন। নচেৎ শুনিয়াছি অন্য কোন গ্রুপের রক্ত ব্যবহার করিলে একটী বিজাতীয় আঘাতে (shock-এ) রোগীর মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে Pope Innocent VIII এর জীবনের এক ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন রোমে যুবকের রক্ত শক্তিহীন শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া নষ্টযৌবন লাভ করার এক বিচিত্র প্রথা চালু ছিল। এই অষ্টমপোপ যৌবন পুনরুদ্ধারের জন্য তিনজন যুবকের রক্ত নিজের দেহে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া কিন্তু প্রাণ হারান। কারণ মহামান্য পোপের সময় রক্তের জাতিগোত্রের কথা জানা ছিল না; ফলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করায় পোপের এই দুরদৃষ্ট ঘটে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশ কতদূর

বাস্তবানুগ। কিন্তু প্রশ্ন: প্রাত্যহিক জীবনে স্বভাববিহিত কর্ম্ম, স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্ম কি প্রকার, তাহা কি করিয়া সঠিকভাবে জনগণের পক্ষে নির্ণয় করা যায়? ইহা সত্যই এক বিরাট operations reserch; আধুনিক praxiology বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোটামুটি সূত্রাকারে তাহার এক ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে[১] পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

৩.১০ অর্জ্জুনের প্রশ্ন: অনিচ্ছুক জীবকে পাপাচরণে কে প্রবৃত্ত করায়?

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেৰ্য় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—বাষ্ণেৰ্য়, অথ কেন প্রযুক্তঃ (সন্) অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি?

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে বাষ্ণেৰ্য়! তাহা হইলে কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই পুরুষ (আধারধারী-জীবাত্মা) অনিচ্ছুক হইয়াও সবলে নিয়োজিতের তুল্য পাপাচরণ করে?

ব্যাখ্যা—অনিচ্ছন্নপি—অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন একেবারেই সাধারণ জীবের প্রশ্ন। জনসাধারণের মধ্যে বহুলোকেই লৌকিকভাবে নিষ্পাপ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করে,—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের এই সাধুচেষ্টা বিফল হইয়া যায়? ইহার কারণ কি?

১। ১৮।৪৩-৬৮

বলাদিব—লৌকিক বিচারে জীব সাধুপ্রচেষ্টা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত্যাগ করে না ; তাহাকে বাহিরের কোন শক্তি বলপূর্ব্বক এই সাধু চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত করায়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন : কে এই বহিঃশক্তি, ইহার প্রকৃতি কিরূপ ?

৩১১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর : কে এই শক্তি এবং কিরূপ চেষ্টায় (ইহার প্রভাব হইতে) এই পাপাচরণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

অন্বয়—(সঃ) রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা ; এনম্ ইহ বৈরিণম্ বিদ্ধি। যথা ধূমেন বহ্নিঃ চ মলেন আদর্শঃ আব্রিয়তে, যথা উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্। কৌন্তেয়, এতেন নিত্যবৈরিণা কামরূপেন দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানিনঃ চ জ্ঞানম্ আবৃতম্। ইন্দ্রিয়ানি, মনঃ, বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে।

এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য এষঃ দেহিনং বিমোহয়তি। তস্মাৎ, ভরতর্ষভ, ত্বম্ আদৌ হি ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ এনং পাপ্মানং প্রজহি।

অনুবাদ—(ইহা, এই বহিঃশক্তি) রজোগুণসমুদ্ভব এই কাম (কামনা), এই ক্রোধ (কামনা প্রতিহত হইলে যাহা উৎপন্ন হয়) মহাভোজী (সর্ব্বগ্রাসী) মহাপাপের মূল; তাহাকে ইহলোকে বৈরী বলিয়া জানিও। যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নি এবং মলের (ময়লার) দ্বারা দর্পণ (আরশি) আবৃত হয়, যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ (ভ্রূণ) আবৃত থাকে, সেইরূপ কামক্রোধ দ্বারা এই সকল প্রাণিগণ আবৃত আছে। হে কৌন্তেয়, এই নিত্যবৈরী, কামরূপ দুষ্পূরণীয় অনলদ্বারা জ্ঞানিগণেরও জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ইহার (কামের) অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এই কাম দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান (পরোক্ষ বা শাস্ত্রাদিলব্ধ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষ বা নিজ-অনুভবলব্ধ জ্ঞান) নাশক এই পাপকে বিনাশ কর।

ব্যাখ্যা—ইতিপূর্ব্বে[১] শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন আর তাঁহার এই মত—স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই—কর্ত্তব্যকরণে শ্রেষ্ঠমার্গ to achieve optimisation of human actions; অতএব সবলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ বৃথা। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই প্রীতি অপ্রীতি সংলগ্ন আছে, তাহাদের বশে

১। ৩।৩৩-৩৪

আসা উচিত নহে, কারণ তাহারা (শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত) সঠিক মার্গের পরিপন্থী। সকল প্রাণীই যখন স্বভাবের অনুবর্ত্তী, এমন কি জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁহার স্বভাবজাত গুণসমূহকে উৎক্রমণ করিতে সমর্থ হন না, স্বীয় প্রকৃতি তাঁহার স্বভাববিহিত কর্ম্মে নিশ্চয়ই নিয়োগ করিবে এবং স্বীয় প্রকৃতিনির্দ্ধারিত স্বভাবজাত কর্ম্ম হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"। এ অবস্থায় "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" নিশ্চিত করিয়া পরিণামনির্ব্বিশেষে নিজস্বভাবজাত স্বধর্ম্মপালন করাই সর্ব্বোত্তম কর্ম্মকুশলতা।

এইরূপ উক্তিতে অর্জ্জুনের প্রশ্ন: "অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জ্জুন তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য, import, সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পাপপুণ্যকার্য্যের এক লৌকিক ব্যাখ্যা দিলেন। অতএব ৩৭ হইতে ৪৩, এই সাতটী শ্লোকে যে অনুজ্ঞা তাহা শুদ্ধচেতাদিগের জন্য নহে। মুমুক্ষু বিদ্বজ্জনগণ—যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞা (wisdom) লাভের জন্য অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য।[১] এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-মন্তব্য,[২] "হে কৌন্তেয়! যত্নপরায়ণ পণ্ডিত পুরুষেরও মন প্রমথনকারী (বিক্ষোভকর) ইন্দ্রিয়গণ সবলে হরণ করে। তাহাদের সকলকে (সকল ইন্দ্রিয়কে) সংযত করিয়া যোগযুক্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইহা স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ব্বের অবস্থার জীবের জন্য অভ্যাসযোগ প্রসঙ্গে। শুদ্ধচেতা ও মুক্তপুরুষের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত

১। কঠো ১।৩।০-৬ ২। ২।৬০-৬১

অবস্থার কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদের বিচারে লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সুখদুঃখ, সৎ-অসতের কোন স্থান নাই, সবই তুল্যমূলক।

মহাশনো মহাপাপ্মা—শ্রীকৃষ্ণের মতে পরমাত্মা তাঁহার প্রকৃতির সহায়তায়[১] সৃষ্টি করিয়া জীবকে কামাদির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ আত্মা বদ্ধ থাকিতে অস্বীকার করেন এবং কামাদির জাল ছেদ করিতে অহরহ অবিরাম চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহাই সৃষ্টি রহস্য ও লৌকিক দৃষ্টিতে প্রাণ। Operationally এই জাল ভেদ করিতে কি করণীয় সে বিষয়ে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[২]

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য—এই দুষ্পূরণীয় কাম কি করিয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং দেহীকে বিমোহিত করে? জীবের ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধি দ্বারা।

ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য—এ কারণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন যে সাধারণ জীব প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবে। তাহা হইলে জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই পাপকে বিনাশ করা সম্ভব হইবে। এই নির্দেশ পালন এক বিরাট operational research।

৩.১১.১ দেহাদি হইতে কি শ্রেষ্ঠ? আত্মার একটী সংজ্ঞা

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

১। ৯।৭-৮ ২। ৩।৪১,৪৩

৩.১২ আত্মবোধের দ্বারা কামরূপ শত্রুকে বধ করা যায়

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ ; মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ চ পরম্, বুদ্ধিঃ মনসঃ তু পরা ; যঃ বুদ্ধেঃ তু পরতঃ সঃ (আত্মা)। মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং (তং) বুদ্ধা আত্মনা আত্মনং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় হইতে (দেহাপেক্ষা সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ) উপরিস্থ ; মন ইন্দ্রিয়গণের উপরে, বুদ্ধি মনেরও উপরে ; যিনি বুদ্ধিরও উপরে তিনিই (আত্মা)।

৩.১২ হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধির যিনি উপরিস্থ তাঁহাকে (অর্থাৎ সেই আত্মাকে) বুঝিয়া নিজের (নিজে কি সেই জ্ঞানের অর্থাৎ নিজের পরিচয়ে) দ্বারা আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া (অর্থাৎ আত্মস্থ হইয়া) কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর।

ব্যাখ্যা—এখানে একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যদর্শন মানিতেন এবং বহুস্থলে সেই দর্শনোক্ত মত উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা (সূক্ষ্ম মহাভূত), দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্থূল মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে।[১]

অতএব দেহস্থিত কামাদিকে সংযত করিতে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি

১। ১৩।৫

ও অহঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা স্বাভাবিক। পরে এ বিষয় আরো বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ—বুদ্ধির অতীত যিনি তিনিই আত্মা। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্থূল-মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম মহাভূত) ও মহৎ (বুদ্ধি) উৎপন্ন হইয়াছে।[১] পুরুষ বা আত্মা যখন মহতের অংশ আপনাতে আরোপিত করিয়া গুণান্বিত এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা কল্পিত করে, তখন অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। আত্মা সম্বন্ধে এখানে বলা হইয়াছে যে যিনি বুদ্ধিরও পরে, তিনি (আত্মা)। পূর্ব্বকথিত সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত মহতের এক স্বতন্ত্র সত্ত্বাই অহঙ্কার। তাহা হইলে তিনিই অহঙ্কার। ইহাই প্রখ্যাত "সোহং"তত্ত্ব, ইহাই প্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" মন্ত্র। এই মন্ত্রের সাহায্যে অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানিতে পারিলে আত্মার (বদ্ধ অবস্থার) বিষয় জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে (জীব) আত্মা সম্বন্ধে একটী ইঙ্গিত মাত্র দিলেন ; যিনি অবাঙ্‌ মনসোগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে নির্ণয় সহজ নহে, সুদুষ্কর।

কামরূপং দুরাসদং—তাঁহারই মায়ার দ্বারা সৃষ্ট কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে হনন করা দুষ্কর। প্রকৃতির মায়ার সুদৃঢ় জালভেদ করা সহজে সম্ভবপর হয় না। ইহা সুদুষ্কর, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। অভ্যাসের দ্বারা

আত্মানমাত্মনা—"আত্মনা" নিজের (পরিচয়ের) দ্বারা 'আত্মনং'-নিজেকে নিশ্চল করিয়া (অর্থাৎ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া) এই মায়ার জাল ভেদ করা সম্ভব।

১। ১৩।৫

জহি শত্রুং দুরাসদম্—দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে হনন কর। দুরাসদম্ কেন? কারণ ইহা পরমাত্মার প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, অতএব প্রচুর শক্তিমান্। ইহা অত্যন্ত বাস্তব নির্দ্দেশ। তবে পালন করা সুদুষ্কর; কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রথম ৪৩ শ্লোকে জীবের নিজের পরিচয়ের বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং একটী বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটাইলেন। উপনিষদ্ বলেন[১] "ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ॥ স ইমাঁল্লোকানসৃজত।" সৃষ্টি করিলেন, কি করিয়া? নিজের মায়ায় নিত্যমুক্ত আত্মাকে, নিজেকে বদ্ধ করিলেন। বিস্তীর্ণ অসীম আকাশ ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ হইয়া সীমিত হইলেন। পরমাত্মা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ"[২] হইয়া দেহের (ঘটের) মধ্যে সীমিত থাকায় নিজের স্বরূপ জানিতে পারিতেছেন না। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবকে (জীবাত্মাকে) নির্দ্দেশ দিলেন, "বুদ্ধির যিনি উপরিস্থ তাঁহার পরিচয়ের দ্বারা নিজেকে আত্মস্থ করিলে, নিশ্চল করিলে, এই প্রজ্ঞা লাভ করিলে মায়ার জাল ভেদ করা, কামরূপ দুরাসদনকে হনন করা সহজ হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হন। এইরূপে বহু বিতর্কিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধের এক সহজ সরল মীমাংসা করিলেন।"

১। ঐতরেয়ো ১।১-২ ২। ১৫।৭

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

৪.০ শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীভগবান্) জ্ঞানযোগের পরম্পরাপ্রাপ্তি, বিস্তার ও পরে বিলোপের বিষয় বলিলেন

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ ॥২॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – অহম্ ইমম্ অব্যয়ং (অক্ষরং) যোগং বিবস্বতে (সূর্য্যায়) প্রোক্তবান্ ; বিবস্বান্ মনবে (স্বপুত্রায়) প্রাহ, মনুঃ ইক্ষাকবে (স্বপুত্রায়) অব্রবীৎ। (হে) পরন্তপ, এবং পরম্পরা-প্রাপ্তং ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ ; ইহ (অস্মিন্ লোকে) স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ। ত্বং মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি ময়া তে অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য প্রোক্তঃ ; হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি এই অব্যয় (অপরিবর্ত্তনীয়) যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য (নিজ পুত্র) মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু (তাঁহার পুত্র) ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগবৃত্তান্ত (নিমি প্রভৃতি) রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন ; সেই যোগ মহাকালের বশে ইহলোক হইতে বিলুপ্ত

হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ আজ আমার দ্বারা তোমাকে উক্ত হইল; কারণ ইহা অতি উত্তম রহস্য।

ব্যাখ্যা—ইমং যোগং – এই যোগ কি? 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে', নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে জীবের অধিকার।' "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।"[২] পরে এ বিষয় আরো পরিষ্কার করিয়া দৃঢ়তার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ;" "যেন সর্ব্বমিদং ততং, স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"[৩] মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করে ও তদ্দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ এই কথা অর্জ্জুনের মাধ্যমে মনুষ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাই অব্যয়, অপরিবর্ত্তনীয়, মহান্ যোগ। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"[৪], এই ধর্ম্মের (যোগের) অতি অল্পও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। সিদ্ধি লাভ করিতে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস – যাহা নাকি অসাধারণ যোগিদিগের পক্ষে সম্ভব হইলেও দুর্লভ – ছাড়া এমন একটা কিছু আছে যাহা এই গোটীকয়েক বিশেষ মানুষ ব্যতীত সমাজের অতিকায় অংশ, সাধারণ মানুষের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমাজ আদর্শ অনুকরণ করিয়া অভ্যাস করা সুলভ। তাহাই এই মহান্ যোগ – স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন। সাধারণ লোকের গীতা পাঠে ইহাই সার্থকতা। অপর পক্ষে ইহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান।

পরম্পরাপ্রাপ্তম্—বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই

১। ২।৪৭ ২। ৩।৩৫ ৩। ১৮।৪৫-৪৬ ৪। ২।৪০

নিখিল পুরুষার্থসাধন ব্রহ্মবিজ্ঞান গুপ্ত আছে। ইহাই প্রাচীন বাক্য। গুরুদেব এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্যকে সমর্পণ করিবেন। ইহা উপনিষদের মন্ত্র।[১] শ্রীকৃষ্ণ সেই গুরুপরম্পরার কথাই পুনরুল্লেখ করিলেন এবং impress করিতে চাহিলেন যে তাঁহার এই নির্দ্দেশ নূতন কিছু নহে; ইহা অব্যয় ও পুরাতন এবং অতি উত্তম রহস্য, লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত।

রাজর্ষয়োবিদুঃ—নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। রাজর্ষিদিগের উল্লেখ করিলেন কেন? না, পূর্ব্বেই[২] শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর (সাধারণ) ব্যক্তিরা সেই সেই আচরণের অনুকরণ করে। সমাজে রাজর্ষিগণই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারা এই মহান্ যোগ জানিয়া অভ্যাস করিতেন। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণের অনুকরণ করিয়া সাধারণ জনগণও এই যোগ অনুযায়ী জীবন যাপন করিত।

ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ—ইহলোকে এই যোগ মহাকালের বশে বিলোপ পাইয়াছে। কোন নির্দ্দেশ নষ্ট হয় না, বিনা ব্যবহারে তাহার বিলোপ ঘটে। নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালন যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল। স্বর্গলোভী বেদবাদীদিগের ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুষ্পিতবাক্য শুনিয়াও যাহারা নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালন করিতে থাকে, তাহারা সংখ্যায় কোটিকে গুটী এবং পরে কালবশে একবারে শূন্য হইয়া যায় আর এই মহান্ যোগ বিলুপ্ত হয়। ফলে সমাজ ও সংসার কামনা-

---

১। শ্বেতা ৬।২২ ২। ৩।২১

মগ্ন হইয়া "মহাশনো মহাপাপ্যা" কামের সম্পূর্ণভাবে বশে যাইয়া বিনাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রীভগবান্ বিশেষ কোন এক মানবদেহ আশ্রয় করিয়া নিজেকে[১] সৃষ্ট করিয়া পুনরায় এই লুপ্ত যোগকে প্রাণবন্ত করেন। সে কারণ এই

যোগঃ পুরাতনঃ—পাছে অর্জ্জুন ভাবেন শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দ্দেশ, যাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিতভাবে বেদবিরোধী ও নূতন একটা কিছু, যাহার ব্যবহারে তদানীন্তন কালে সমাজ ও সংসারে প্রচণ্ড এক আঘাত আসিতে পারে এবং (অর্জ্জুনের বিচারে) গণহত্যা ও সামাজিক মালিন্য অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে, সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন যে এই যোগ পুরাতন ও অতি শ্রেষ্ঠ রহস্য, দীর্ঘ কালক্রমে (অনভ্যাসে বা কদভ্যাসে) ইহলোকে বিলোপ পাইয়াছে। যেহেতু অর্জ্জুন, তাঁহার ভক্ত ও সখা, বর্তমানকালে বুদ্ধিসঙ্কটরূপ মহাবিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেজন্য অর্জ্জুনকে ও তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার ভক্তগণের অনুরূপ বিপৎকালে ইহা অত্যন্ত বিধেয় বলিয়া নিশ্চিত করিলেন।

৪.১ অর্জ্জুনের প্রশ্ন : এই পরম্পরাবিষয় শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীভগবান্) কি করিয়া নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন?

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

১। ৪।৬-৮

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ – ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্ ; ইতি ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্ এতৎ কথং বিজানীয়াম্ ।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন আপনার জন্ম পরে হইয়াছে কিন্তু বিবস্বানের জন্ম বহুপূর্ব্বে । অতএব আপনি যে প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কি করিয়া জানিব ?

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে অর্থাৎ পুরাকালে জন্মগ্রহণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট এই জীবন ব্যবস্থা যে ব্যাখ্যা করিতে পারেন – তাহা তখন অর্জ্জুনের বোধগম্য হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যে অর্জ্জুন হতভম্ব হইয়া যান । ইহা হইতে আরো বুঝা যায় যে অর্জ্জুন জাতিস্মর ছিলেন না ; এ বিষয়ে তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় ব্যবহার করেন ।

৪.২ এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর :

৪.২.১ জন্মান্তর বাদ

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি) ; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, পরন্তপ ! ত্বং ন বেত্থ (বেৎসি) ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন : হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে ; আমি সে সমুদয় জানি ; তুমি তাহা জান না ।

ব্যাখ্যা—বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি—বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। একথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তিন তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন।[১] অর্জ্জুনের তাহা স্মরণ থাকিলে পুনরায় তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন না।

সনাতন—তথা—হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী বিশেষ আশ্রয় continuity of প্রাণ। আর প্রাণের এই continuity কোন একটী বিশেষ আধারকে আশ্রয় করিয়া। এই আধার বিনাশশীল কিন্তু প্রাণ অবিনাশী। জীবলোকে এই প্রাণ জীব হইয়া তাহার আধারের প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে (সংসারে) আকর্ষণ করে।[২] আধারের বিনাশ হইলে প্রাণ মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি সঙ্গে নিয়ে যায় ও নবীন আধারে তাহাদের স্থাপন করে। ইহাই সাধারণের নিকট মৃত্যু ও জন্ম। সে কারণ সাধারণের নিকট জন্মান্তর। আসলে প্রাণ এক ও অনন্য, চিরন্তন প্রবহমান। তাহার কোন ছেদ নাই, ভেদ নাই, বিকার নাই। তাহা জীবলোকে পুনঃ পুনঃ নবীন আধারভূত হইয়া তথাকথিত নবজন্ম গ্রহণ করে।[৩]

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আধারের বিষয় জ্ঞাত আছেন। অর্জ্জুন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আধারের কথা স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। It is, therefore, a question of memory। বাস্তবজগতে ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সংসারে দেখা যায় যে কতক জীবের অতি প্রখর ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, তাহারা শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবনের প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটীর বিষয় নিভু'ল মনে রাখে অথচ

১। ২।১২,২২,২৭ ২। ১৫।৭-৮ ৩। ২।২০-২২

এমন অনেকে আছে যাহাদের স্মরণশক্তি এত সামান্য যে স্বল্প কাল আগের ঘটনা তাহাদের স্মৃতিপটে থাকে না। এইরূপ যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল যেমন জাতিস্মর কিংবা যাঁহারা যোগবলে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন যেমন সিদ্ধযোগী তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাসকল সবিশেষ অবিকল ও সঠিক মনে রাখেন এবং পুনরুক্তি করিতে পারেন। ইহার কারণ, একটী আধারের বিনাশান্তে প্রাণ মনও জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি সঙ্গে লইয়া যায় এবং নবীন আধারে তাহাদের স্থাপন করে।

অবতারবাদ

৪.২.২ শ্রীভগবান্ নিজেও পুনঃ পুনঃ মানবদেহে জন্মান ঃ কখন এবং কোন অবস্থায় ?

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।৬॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

অন্বয়—অজঃ সন্ অপি, অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি (অহং) স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ, অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি। সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায়, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় চ (অহং) যুগে যুগে সম্ভবামি।

অনুবাদ—জন্মরহিত হইয়াও, অবিনশ্বর স্বভাব এবং প্রাণিগণের

ঈশ্বর (নিয়ন্তা) হইয়াও, আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আপনার মায়াবলে সম্ভব হই (জন্মগ্রহণ করি)। হে ভারত! যখন যখন ধর্মের হানি হয়, অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (জন্মগ্রহণ করি)। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ব্যাখ্যা—অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা—ষষ্ঠ শ্লোকে অজ ও অব্যয় আত্মার সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়াছে। অজ ও অব্যয়ের সৃষ্টি—আপাত-দৃষ্টিতে এক contradiction; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এখানে এই অব্যয়াত্মার মানুষীদেহে জীবরূপে জন্মাইবার ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে—কি করিয়া? প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়। ইহা আর এক গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছে। অজ ও অব্যয়ের প্রকৃতি—সে আবার কি? শুধু তাহাই নহে। স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ। এই মায়াবলই বা কি? ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

অব্যয় (পরম) আত্মা জীবরূপে কিভাবে ইহলোকে জন্মান সেই modus operandii সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অব্যয়াত্মা "স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায়," আপনার প্রকৃতিকে kinetic (সচল) করিয়া, স্থূলভাবে তাহাকে নিজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেকে সৃষ্টি করিলেন।[১] এখানে প্রশ্ন: কাহার শক্তিতে, কাহার মাধ্যমে? "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া," আপনার মায়াবলে, আপনার মায়ার মাধ্যমে। পরমাত্মার এই মায়াকে উপনিষদ্ তাঁহার এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। এই মায়ার স্বরূপ শ্বেতা শ্বেতরোপনিষদ্ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] "যস্তূর্ণনাভ

১। শ্বেতা ৪।১০ ২। শ্বেতা ৬।১০

ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥" ইহা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান কালে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে potential energyকে (নিষ্ক্রিয় শক্তিকে) kinetic (সচল ও ক্রিয়াবান্) করার ব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অব্যয়াত্মার শক্তিরূপে নিজেকে সৃষ্টির এই ব্যাপার আধুনিক কালের আণবিক শক্তি সৃষ্টির মূল সূত্র।

এ বিষয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে করা হইবে।

ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্—লৌকিক সৃষ্টি হইলে সেই সৃষ্টি সীমিত হয় ও তাহা নানানিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরমাত্মা সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া জন্মগ্রহণ সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহা আর এক riddle!

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় আমরা মহাভারতের মূল ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এতএব গীতাকার গীতা রচনাকালে মহাভারতের সাধারণ ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন এবং মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত গীতার শ্রীকৃষ্ণের সংগতি রক্ষা করিয়াছেন। একারণ গীতাকার তাঁহার দুরূহ প্রসঙ্গের অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য পৌরাণিক রীতিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্র সেইরূপ এক উদাহরণ। ইহা লৌকিক ব্যাখ্যা। আর অন্যরূপ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতে চাহিয়াছেন যে পরমাত্মা সীমিত দেহ গ্রহণ করিলে ক্ষরের সমস্ত ধর্ম্মানুযায়ী ওই জাগতিক দেহ governed, পরিচালিত হইবে। উহার আধি-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ-বোধ থাকিবে; ইহার কোন অন্যথা হইবে না এবং

হয়ও না। সে কারণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও সীমিত ক্ষেত্রে ভূতগণের আধিপত্য ও আনুগত্য মানিয়া চলাই নরদেহের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল মন্তব্য অবতার-বাদের সূচনা।

ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে পরমাত্মা সময়ে সময়ে মানবদেহ ধারণ করেন; কারণ বিলুপ্ত মহান্ যোগকে (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনকে) প্রাণবন্ত করিয়া তাঁহার (ঈশ্বর সৃষ্ট) মানবসমাজ ও তদন্তর্গত জীবকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করিতে শ্রীভগবান্ নিজে মানবদেহ আশ্রয় করিয়া নিজেকে সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য? কখন? কোন পরিবেশে? সপ্তম শ্লোকে সেই সকল অনুকূল অবস্থা ও সময়ের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। দুইটী অবস্থার সমাবেশ হইলে তাঁহার মানুষী সৃষ্টি সম্ভব হয়। একটী ধর্ম্মের গ্লানি, অপরটী "অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য"। শুধু কেবল ধর্ম্মের গ্লানি হইলে হইবে না, অধর্ম্মস্য অভুত্থানের প্রয়োজন। আর এই দুই অবস্থাই simultaneously, একই সময়ে সহাবস্থান করিবে। তবেই পরমাত্মার জীবদেহে আবির্ভাবের সম্ভাবনা।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে চাহিয়াছিলেন; সাধারণতঃ যাহা অবলম্বন করিয়া ইহলোকে জীব বসবাস করে, তাহাই ধর্ম্ম। কৃষ্ণবাসুদেব এই বিষয়ে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিয়াছেন:[১]

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

কার্য্যাকার্য্য অবস্থা নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্র (অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র) তোমার

১। ১৬।২৩-২৪

প্রমাণ, কর্ত্তব্যনির্ণায়ক, authority। শাস্ত্রবিধানোক্ত, শাস্ত্রে যে বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়া ইহলোকে তোমার কর্ম্ম করা উচিত। যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ ও পায় না এবং পরমাগতিও লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু এই নির্দ্দেশ সকলের জন্য নহে। কারণ শাস্ত্রার্থ-নির্ণয় করা কঠিন এবং অর্থাদি নিরূপণ করিতে পারিলেও তাহার যথাযথ প্রয়োগ সুদুষ্কর। একারণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ,[১]

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

এই সকল শাস্ত্রবিধান যখন সাধারণ জীবন আর নিয়ন্ত্রন করে না, জীব যখন এই সকল বিধানোক্ত কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হয় কিংবা স্বার্থবশে তাহার ব্যতিক্রম করে, তখনই ধর্ম্মের গ্লানি আরম্ভ হয়। আর ধর্ম্মের গ্লানি সমাজে ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইলে অধর্ম্ম মানবজীবনকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে এবং সময়ে সংসার ও সমাজকে প্রায় ধ্বংস করে। তখনই দেখা গিয়াছে স-পরিষদ এক লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা কবিকল্পনা নহে; ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়।

আত্মানং সৃজাম্যহম্—এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় লক্ষণীয়। স ইমাঁল্লোকানসৃজত—তিনি এই ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টি করিলে তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার ভারও তাঁহার। একারণ যখনই ধর্ম্মের অপচয়ে, কর্ত্তব্যকরণের অভাবে, সংসার ও সমাজ ধ্বংসের দিকে যায়, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেকে জীবভাবে জীব-

---

১। ৪।৩৪

লোকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করেন। আবির্ভাবের কারণ দেখাইয়াছেন তিনটী :

"পরিত্রাণায় সাধূনাং, "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ও **"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়"**—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন—নব ভাবে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আর আবির্ভাবের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

যুগে যুগে—যুগে যুগে। তাহা হইলে কি বিচার করিতে হইবে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ইঙ্গিত করিতেছেন যে তাঁহার সৃষ্টিতে auto-toxin থাকিবে, যাহা তাঁহার সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিবে।[১] সৃষ্টি নির্ভেজাল দৈব প্রকৃতির হইবে না, দৈবাসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট। আর যখন আসুরীবৃত্তি দৈবীভাব নষ্ট করিয়া সমগ্র সৃষ্টিকে বিনাশের দিকে ঠেলিয়া দিবে, তখনই "সম্ভবামি।"

ইহাই সাধারণের নিকট অবতারবাদ।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব যখন স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন জীবের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য এবং তাহার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন নিশ্চিত করিয়া সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে স্বধর্ম্মপালনে পাপপুণ্যের কোন স্থান নাই, পরিণামনির্ব্বিশেষে জীবের তাহাই পালন করা একমাত্র করণীয়, অর্জ্জুন তখন সাধারণ লৌকিক ব্যবহার অনুযায়ী পাপপুণ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,[২]

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥

১। ১৩।৬,৯,১১-২০ ২। ৩।৩৬

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে বুঝিলেন যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যুত্তম জীবন-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। একারণ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোক হইতে ৪৩শ শ্লোকে, অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পাপপুণ্য কার্য্যের এক লৌকিক ব্যাখ্যা দিলেন। পরে ভাবিলেন, অর্জ্জুন এখন তাঁহার নির্দ্দেশ বুঝিতে পারিবেন; সেই হেতু চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই তাঁহার মুখ্য বক্তব্যের ধারা সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু দেখিলেন, অর্জ্জুন তখনও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। একারণ, এই অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী দুইটী অধ্যায়ে অর্জ্জুন ও তাঁহার ন্যায় জীবের পক্ষে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জীবনদর্শন বুঝিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া পুনরায় সপ্তম অধ্যায় হইতে তাঁহার বিশেষ বক্তব্যের আলোচনা আরম্ভ করেন।

এ কারণ, এই তিন অধ্যায়ে যে সকল আলোচনা করা এবং নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা শুদ্ধচেতাদিগের জন্য নহে। শমদমাদিসম্পন্ন মুমুক্ষু বিদ্বজ্জনগণ যাহাতে অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশক পাপকে হনন করিয়া সাম্যযোগ অনুসরণ করিয়া প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রয়াস ও অভ্যাস করেন এবং সেইরূপ অভ্যাসের ফলে প্রজ্ঞালাভ করিতে সফল হন, তদনুযায়ী নির্দ্দেশ দেন। একারণ এই অধ্যায়গুলিতে বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক operational researchএর বাস্তব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪.২.৩ শ্রীভগবানের এই মানবরূপ দিব্যজন্ম সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান ও তন্নির্দ্দিষ্ট সাধনায় যাঁহারা আশ্রিত— তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

অন্বয়—অর্জুন! যঃ মে এবং দিব্যং (অপ্রাকৃতং) জন্ম কর্ম চ তত্ত্বতঃ (যথার্থেন) বেত্তি, স দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি (প্রাপ্নোতি), মাম্ এতি। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (অবলম্বমানাঃ) (সন্তঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (পবিত্রাঃ) বহবঃ (পুণ্যবন্তঃ) মদ্ভাবম্ আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।

অনুবাদ—হে অর্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, আমাকে লাভ করেন। আসক্তি, ভয়, ক্রোধ হইতে মুক্ত ও মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে অবলম্বন করিয়া অনেক ব্যক্তি জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পুণ্যবন্ত হইয়া আমার ভাব পাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ—পূর্ব্বে চারিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীভগবানের) যে অলৌকিক জন্ম ও অপ্রাকৃত-কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। কোটিকে গুটী ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে; যাহারা পারে, শ্রীকৃষ্ণের মতে, তাঁহারা তাঁহার ভাব পায় অর্থাৎ তাঁহাকে সঠিক জানিতে পারেন। কিরূপে?

মামুপাশ্রিতাঃ—আমাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আমার প্রতিষ্ঠিত মতবাদ (বেদবাদরত হইয়া সঙ্কল্পাত্মক কর্ম্ম না করিয়া পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন) অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ জীবনে ইহা রূপায়িত করিয়া জীবনযাপন করেন। তাঁহারাই পরে পরমাগতি লাভ করেন।

জন্ম কর্ম্ম চ—অজ ও অব্যয় আত্মা হইয়াও মানবদেহ গ্রহণ করিলে শ্রীভগবান্ যে সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার (স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন) কর্ম্ম করিবেন তাহা পুনরুক্তি করিলেন। পূর্ব্বেই[১] এই কথা তিনি জানাইয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন[২] যে তিনি কর্ম্ম না করিলে লোকসমূহ (কর্ম্ম-লোপবশতঃ) উৎসন্ন যাইবে। অর্জ্জুনের ন্যায় ব্যক্তিদিগকে এ কথার বলার তাৎপর্য্য এই যে শ্রেষ্ঠতমও মানবদেহ ধারণ করিলে তাঁহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালন করিবেন—ইহার কোন অন্যথা হয় না। "তুমি অর্জ্জুন, তাঁহার তুল্য নহ; তাঁহার তুলনায় অতিসাধারণ। অতএব তোমার আর কোন যুক্তিতর্ক সাজে না; তুমি তোমার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মযুদ্ধ কর। পরিণাম যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য কোনরূপ বিচার করা বিধেয় নহে।"

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ—আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণোক্ত জীবনদর্শন অভ্যাস করিতে পারা যায়। বেদবাদরতা ব্যক্তিরা কামাত্মা ও স্বর্গলোভী। তাহাদের প্রচেষ্টা লাভবান হইবে-কি-হইবে-না, তাহা লইয়া সর্ব্বদাই মানসিক ভয়জনিত এক অস্বস্তি এবং পরিশেষে সকলকাম না হইলে এই সকল মন্দমতিদিগের ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোক্ত জীবনদর্শন যাহারা স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিবে তাহারা পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিবে। তাহাদের প্রচেষ্টা একমুখী ও নিশ্চয়াত্মিকা এবং নিষ্ঠা সৎ।

মদ্ভাবমাগতাঃ—"আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে

১। ৩।২২ ২। ৩।২৪

মতবাদ নিশ্চয় করিয়াছেন, সেইরূপভাবে ভাবিত হইয়া জীবনদর্শন অনুসরণ করিবে।

জ্ঞানতপসা পূতা—"জ্ঞান তপস্যা দ্বারা পুণ্যবন্ত হইয়া আমার ভাব পাইবেন।" শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন[১] যে যাঁহা হইতে জীব সকলের উৎপত্তি, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, মানব স্বকর্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে; শেষে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এই পরমোত্তমধামই ত সমস্ত জ্ঞান ও তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য।

৪.৩ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের অন্য-ভাবে অর্চ্চনায়ে অর্থাৎ ব্যাকুল প্রার্থনায়েও সিদ্ধিলাভ সম্ভব

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

অন্বয়—যে (জনাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তান্ অহং তথৈব (তদপেক্ষিতফলদানেন) ভজামি (অনুগৃহ্ণামি); পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম (ভজনমার্গম্) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরন্তি)। হি (যতঃ) কর্ম্মজা (যজ্ঞাদিকার্য্যজাতা) সিদ্ধিং ক্ষিপ্রং মানুষে লোকে (কর্ম্মক্ষেত্রে) ভবতি; (অতঃ) কর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ (কর্ম্মফলং) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কাময়মানাঃ) ইহ (মানুষে লোকে) দেবতাঃ যজন্তে (ভজন্তে)।

১। ১৮।৪৬

অনুবাদ—যাহারা যে ভাবে (যে প্রয়োজনে) আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাহাদের সেই ভাবেই (সেই প্রয়োজনসিদ্ধির দ্বারাই) ভজনা করি (তুষ্ট করি)। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ (আমি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, সেজন্য আমার অভিমুখ পথ) অনুসরণ করে। যাহারা কর্ম্মসকলের সিদ্ধি চায় তাহারা ইহলোকে দেবতাগণকে (ইন্দ্রাদি, যাঁহারা ইহলোকেই যজ্ঞফল দেন) যজন করে; কারণ মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ-সিদ্ধি ক্ষিপ্র হয় (অর্থাৎ যাহারা ফলকামনার জন্য দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে, তাহারা শীঘ্রই কাম্যফল পায়, তাহাদের প্রয়োজন তাহাতেই সিদ্ধ হয়)।

ব্যাখ্যা—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—এই দুইটী শ্লোকে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশ সাধারণ জীবের নিকট অতীব মূল্যবান। এই দুটী বচনে অদৃশ্য শক্তির নিকট জাগতিক প্রার্থনার বীজ নিহিত আর ব্যাকুল প্রার্থনায়, সম্যক্ শরণাগতিতে সেই প্রার্থনার সিদ্ধি অনিবার্য্য। মোক্ষ কি, নির্ব্বাণ কি করিয়া লাভ করা যায়, সাধারণ জীবের ইহাতে খুব বেশী আগ্রহ নাই; তাহারা সাংসারিক জীবনে সুখী ও সমৃদ্ধ হইতে চাহে এবং নিজেদের জীবনে এ নিমিত্ত তাহাদের প্রকৃতিগত স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করে; কিন্তু যখন নিজ চেষ্টায় সফলকাম হয় না, তখন তাহারা তাহাদের ইষ্টদেবের নিকট, ঈশ্বরের নিকট, সেই অদৃশ্য শক্তির নিকট তাহাদের অন্তরের প্রার্থনা জানায়। এই অবস্থায় তাহারা আর্ত্তের দলে পড়ে ও "মদ্ভাবমাগতাঃ" হয়; আর এই প্রার্থনা যখন ব্যাকুল হয় এবং শরণাগতি যখন সত্য ও পূর্ণ হয়, তখন সিদ্ধি করতলগত হয়।[১]

১। ৭।১৬, ৭।২০-২৩, ৯।২৩,২৬

সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা—যাহারা ফলকামনার জন্য দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে, তাহারা শীঘ্রই কাম্যফল পায়, তাহাদের প্রয়োজন তাহাতেই সিদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যাহারা বেদবাদীদিগের পুষ্পিত বাক্যে বিমোহিত হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে, শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুনকে সাবধান করেন এবং নির্দ্দেশ দেন "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।"[১] পরে অর্জ্জুনের ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জ্জুন তাঁহার ওই মত গ্রহণ করেন নাই বা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। নানাবিধ লৌকিক আচার বিচারের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় অধ্যায়ে ১০-১৬ শ্লোকে ব্রহ্মার মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বিধান দিতে হইল যে মনুষ্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিবে এবং দেবগণও মনুষ্যের ইষ্টসাধন করিবেন। এইরূপ পরস্পর আদানপ্রদান দ্বারা মনুষ্যগণ শ্রেয়োলাভ করিবে। শুধু তাহাই নহে যজ্ঞকারীরা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন। আর যে অযজ্ঞ, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। এই প্রকার অনেক যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদে কথিত আছে, সে সমস্ত কর্মজ; তাহা জানিয়া মুক্ত হওয়া যায়।[২]

শ্রীকৃষ্ণের সময় প্রচলিত বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা ছিল না;[৩] কিন্তু নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে এ সকল কর্ম তিনি হিতকর বলিয়া মনে করিতেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয় বলা হয় নি, কারণ তাহাতে ইতর সাধারণের আদর্শ বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা। অতএব এই অধ্যায়ে সাংখ্যের বিশুদ্ধ

১। ২।৪২-৪৪,৪৫ ২। ৪।২৩-৩৩ ৩। ২।৪১-৪৬

জ্ঞানযোগের যে বিকল্প আছে, সে বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া পুনরায় এই অধ্যায়ে তাহা নিশ্চিত করিলেন। কিন্তু পরিসমাপ্তি করিলেন জ্ঞানযোগের প্রাধান্য বিচার করিয়া "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।[১]

শ্রীকৃষ্ণ একজন বাস্তববাদী, তিনি সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের বিষয় চিন্তা করিতেন। শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সমাজে অতিকায় যে জীবসকল আছে তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহারাও যাহাতে নিজজীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে স্বীয় স্বভাববিহিত কর্মসম্পাদনপূর্ব্বক সমাজের প্রয়োজনে লাগিয়া পরে পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ দেন। তাছাড়া সমাজে লোকবল হইতে যাহাতে optimum product সৃজন করা যাইতে পারা যায়, যে উপায় অবলম্বনে কোন প্রকারে কোনরূপ জীবনীশক্তির অপচয় না ঘটে, তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পদ্ধতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই পদ্ধতি কার্য্যকরী করিতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের স্বীয় স্বধর্ম্মানুযায়ী কাজ করা কর্ত্তব্য। লোকসংগ্রহার্থে এ কারণ শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করণীয়। এ বিষয়ে[২] পরে পরিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন "নায়ং লোকঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।" এই জন্যই সাধারণ লোকের গীতা-অধ্যয়ন ও গীতা-অভ্যাসের সার্থকতা, এবং ইহাই বর্ত্তমান কালের আধুনিকতম শাস্ত্র praxiology।

১। ৪।৩৮ ২। ৪।৩২

৪.৪ চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত সমাজসংস্থার ব্যবস্থা

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয়—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং; অব্যয়ং মাং তস্য কর্ত্তারম্ অপি অকর্ত্তারম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—গুণানুরূপ কর্ম্মবিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত এক সমাজসংস্থা আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অব্যয় (বিকারহীন) আমাকে তাহার কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। [অকর্ত্তা—কারণ প্রকৃতির গুণানুসারে বর্ণবিভাগ স্বতঃ হইয়াছে। কর্ত্তা—কারণ আমি প্রকৃতির প্রভু।]

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের মানবদেহে আবির্ভাবের কথা এই অধ্যায়ে বিচার করিতেছেন। অতএব মানবসমাজ সম্বন্ধে বিচার অবশ্যকরণীয়। সে কারণ মানবসমাজের উল্লেখ। এই মানবসমাজ, শ্রীকৃষ্ণের মতে, চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত এক সংস্থা। আর এই চতুর্ব্বর্ণ জীবের গুণানুরূপ কর্ম্মবিভাগ অনুসারে স্থিরীকৃত হয়।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং—চতুর্ব্বর্ণ নহে; চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত এক সংস্থা। একথা মনে রাখিলে শ্রীভগবান্ সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ ভুল ধারণা হইবে না। তিনি মানব সৃষ্টি করিয়া সেই সকল মানবের গুণানুরূপ কর্ম্ম ভিত্তি করিয়া এক সমাজ সংস্থা নির্ম্মাণ করেন।

এ বিষয় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণ মানুষের চরিত্র, ব্যবহার, কার্য্যাদি সকল নিরূপণ করে। প্রকৃতিজ সেই গুণানুসারে

বর্ণবিভাগ স্বত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন এই বর্ণ কেহ সৃষ্টি করে নাই ; সত্ত্বাদি গুণের permutation ও computation-এ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ; আর এই গুণানুসারে কর্ম্মানুযায়ী বর্ণবিভাগ স্বত হইয়াছে। এই কথা মনে রাখিলে সমাজের বর্ণবিভাগ (জাতিবিভাগ) সম্বন্ধে আর ভুল ধারণা হইবে না।

কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্—একই শ্লোকার্দ্ধে স্রষ্টা সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহারে confusion হইতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তু বিশেষ করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে কোন বিরোধ নাই। দুইটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া স্রষ্টার সেই অবস্থার সহিত সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। অকর্ত্তা কেন ; কারণ প্রকৃতির গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ স্বতঃ হইয়াছে। জীবের প্রকৃতিই এই বর্ণবিভাগের কর্ত্তা। আর কর্ত্তা কেন ; কারণ শ্রীভগবান্ প্রকৃতির প্রভু।

৪.৫ কর্ম্ম সম্বন্ধে পুনরায় বিচার এবং কর্ম্ম-অকর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

অন্বয়—কর্ম্মানি মাং ন লিম্পন্তি ; কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন (অস্তি) ; ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি (তত্ত্বতোবেত্তি) সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে। এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম কৃতম্ ; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরং কর্ম্ম এব কুরু। কিম্ কর্ম্ম, কিম্ অকর্ম্ম – ইতি অত্র (অস্মিন্ অর্থে) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি মোহিতাঃ ; (অতঃ) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে, তৎ কর্ম তে প্রবক্ষ্যামি। কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং ; কর্ম্মণঃ গতি গহনা (দুর্জ্ঞেয়া) ॥

অনুবাদ—আমাকে কর্ম্মসকল লিপ্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই ; যিনি আমার এই তত্ত্ব জানেন, তিনি কর্ম্মে আবদ্ধ হন না। পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জানিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন ; অতএব তুমি পূর্ব্ববর্ত্তীগণ-কর্ত্তৃক-পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই কর। (কারণ, কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, এ বিষয়ে কবিগণ (পণ্ডিতগণ)ও মোহযুক্ত ; তোমাকে সেই কর্ম্মবিষয় বলিতেছি যাহার স্বরূপ জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তি পাইবে। (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম্মের তত্ত্বে জানিবার বিষয় আছে ; অবিহিত কর্ম্ম সম্বন্ধেও জানা উচিত, অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়তা) সম্বন্ধেও জানা উচিত। কর্ম্মের গতি (তত্ত্ব) গহন (দুর্জ্ঞেয়)।

ব্যাখ্যা—ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি – দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিচারের পর অর্জ্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জ্জুন তাঁহার বিচার সঠিক বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) মানবদেহ গ্রহণ করিয়া জীবলোকে জন্মাইলে তাঁহাকেও কর্ম্ম করিতে হয়[১] এবং তিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করেন ; তথাপি কর্ম্ম-

১। ৩।২২

সকল তাঁহাকে লিপ্ত করে না এবং তাঁহার কর্ম্মফলে কোন স্পৃহা থাকে না। কারণ, কর্ম্ম করে তাঁহার জীবদেহের প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়গণ আর কর্ম্মের ফল তাহারাই ভোগ করে। তিনি অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই প্রসঙ্গে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসনের বিষয়[১] স্মরণ করা যাইতে পারে।

কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে—মানবদেহে শ্রীভগবান্ কি রূপে কর্ম্ম করেন এবং কি ভাবে কর্ম্মফল এড়াইয়া নিজের ভারসাম্য রক্ষা করেন, জীবলোকে যে সকল জীব তাঁহার এই কর্ম্ম করার পদ্ধতি জানেন, কর্ম্মের বিষদাঁত তাহাদের কোনমতে আঘাত করিতে পারে না। কর্ম্ম তাহাদের "বধ" করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে "বধ্যতে" শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী জনকাদি মুমুক্ষুরা কর্ম্ম-সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তুমি ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণ-কর্ত্তৃক-পূর্ব্বে-কৃত কর্ম্মই কর, অর্থাৎ তাঁহারা যেভাবে কর্ম্মকে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তুমিও সেইরূপভাবে অভ্যস্ত হইয়া "কুরু কর্ম্মৈব"। কারণ

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি—কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি – এ বিষয়ে কবি (অর্থাৎ পণ্ডিতগণও) মোহযুক্ত। কর্ম্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন[২] "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ", জীবের জীবনের উন্মেষ হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত প্রতিটী pulsationই কর্ম্ম; তাহা হইলে অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়তা), বিকর্ম্ম (অবিহিত কর্ম্ম) এর স্থান কোথায়? অথচ সমাজ ও সংসারে আমরা সর্ব্বদাই অবিহিত কর্ম্ম ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য

১। ২।৪৭, ২। ৮।৩

করিয়া থাকি। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, **এই কর্ম, অকর্ম সম্বন্ধে** কবিরাও, পণ্ডিতেরাও মোহযুক্ত। অতএব **"এই অত্যন্ত গুরু অবস্থায় আমি তোমাকে সঠিক কর্ম বিষয় বলিতেছি (অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন) যাহার স্বরূপ জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তি পাইবে।"**

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ—কর্মের গতি (তত্ত্ব) অতি গহন, অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ সমাজে ও সংসারে এমন অনেক কর্ম জীব কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, যাহা বিশেষ বিচারে অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিহিত কর্মের সহিত বিরোধ ঘটায়। ইহাই লৌকিক কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার লৌকিক কর্ত্তব্যকে অবিহিত কর্ম আখ্যা দিয়াছেন, যখন এই সব তথাকথিত কর্ত্তব্য জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্মের বিরুদ্ধ হয়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ, শাস্ত্র বিহিত কর্মের তত্ত্বে যথেষ্ট জানিবার বিষয় আছে; অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও জানা উচিত এবং কর্মহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা কি, তাহাও বিচার করা কর্ত্তব্য।

৪.৬ পণ্ডিতের সংজ্ঞা ও লক্ষণ

কর্ম্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অন্বয়—যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ, অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম (পশ্যেৎ) মনুষ্যেসু স বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্ম্মবিৎ। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (ক্রিয়াঃ) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ বুধাঃ (বিদ্বাংসঃ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণাং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ। সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ (সন্) অপি কিঞ্চিৎ এব করোতি ন। নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (পুরুষঃ) কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ (নির্ব্বৈরঃ) সিদ্ধৌ চ অসিদ্ধৌ সমঃ (পুরুষঃ) কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে।

অনুবাদ—যিনি (সর্ব্ববিধ) কর্ম্মে অকর্ম্ম (আত্মার নিষ্ক্রিয়তা) এবং অকর্ম্মে (আত্মার নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও) কর্ম্ম (কর্ম্ম কৃত হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম কৃত হইতেছে, এইরূপ) দেখেন, মনুষ্য মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগযুক্ত, সর্ব্বকর্ম্মবিৎ। যাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত (নিষ্কাম), জ্ঞানিগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাকে (জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার কর্ম্মফলাসক্তি ভস্মীভূত হইয়াছে এমন ব্যক্তিকে) পণ্ডিত আখ্যা দেন। কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় (যিনি ফলের উপর নির্ভর করেন না) (হইয়া) তিনি কর্ম্মে উদ্যমসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও যেন কিছুই করেন না (অর্থাৎ যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য চেষ্টা বা প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি কিছুই করেন না)। ফলাশাশূন্য, সংযতচিত্ত (চিত্ত ও দেহকে সংহত করিয়া) সকল ভোগ্য বস্তুর আহরণে উদাসীন পুরুষ কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া (মন অনাসক্ত

রাখিয়া কিংবা কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে) পাপগ্রস্ত হন না। যদৃচ্ছালাভে (লোভ না করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে) সন্তুষ্ট, সুখদুঃখাদিতে অবিচলিত, বিদ্বেষহীন, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন পুরুষ কর্ম করিয়াও নিবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ—যিনি সর্ববিধ কর্মে আত্মার নিষ্ক্রিয়তা দেখেন, অর্থাৎ যে পণ্ডিত জানেন যে তিনি, সঃ, সকল কর্মে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গণই কর্ম করে, সেই পণ্ডিতই কর্মের তত্ত্ব সঠিক বুঝেন। তাঁহার নিকট কর্ম্মজনিত জয়-পরাজয় বলিয়া কিছুই নাই, সে কারণ কর্মফলে তাঁহার কোন উত্তেজনা হয় না বলিয়া তাঁহার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। তখন তাঁহার সমত্ব বোধ হয় আর এই সমত্ববোধই যোগ। আর যাঁহারা এই সমত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহারা যোগযুক্ত, তাঁহারা পণ্ডিত।

কামসঙ্কল্পবৰ্জ্জিতাঃ—পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে[১] বেদবাদরতা, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তদিগের সম্বন্ধে বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে তাহাদের সকল কর্মই সঙ্কল্পজাত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না। পরন্তু পরিণামনির্ব্বিশেষে পণ্ডিতরা তাঁহাদের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিবেন ; এখানে কোন সঙ্কল্পের স্থান নাই। অর্জ্জুনের মাধ্যমে তাঁহাদিগকে "নিস্ত্রৈগুণ্যো" হইবার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য, কোনরূপ সঙ্কল্প না করিয়া শুধুমাত্র স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায় এবং কর্ম্মীকে সেই কর্ম কোনরূপে আঘাত করিতে পারে না।

১। ২।৪২-৪৪

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্—জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাঁহাদের কর্ম্ম-ফলাসক্তি ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহারা কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত। ইহার কারণ তাঁহাদের সেই জ্ঞান লাভ হইয়াছিল যে জ্ঞানে তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহারা (তন্নিহিত আত্মা) কর্ম্ম করেন না, কর্ম্ম করে তাঁহাদের বর্ত্তমান আধারের প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়গণ। আর সেই কর্ম্ম তাঁহাদের সেই প্রকৃতির স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম। অতএব এই কর্ম্মে সঙ্কল্পের কোন স্থান থাকিত না।

নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ—নিত্যতৃপ্ত, কারণ কর্ম্মের বিষদাঁত তাঁহাকে (পণ্ডিতকে) আঘাত করিয়া তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না ; আর নিরাশ্রয়, কারণ তিনি পরিণামনির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ হইয়া স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করেন।

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি—পণ্ডিতব্যক্তি তাঁহাদের কর্ম্মে উদ্যম-সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও যেন কিছুই করেন না অর্থাৎ অদৃষ্টবাদীদের ন্যায় দায় সারা মত কাজ না করিয়া তিনি তাঁহার প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে উৎসাহের সহিত স্বকীয় কাজ করেন, কারণ তিনি জানেন যে ইঁহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন অন্যথা হইতে পারে না। তিনি (অর্থাৎ তাঁহার আধারের অন্তর্নিহিত আত্মা) একথা সর্ব্বদাই মনে রাখেন যে তিনি নিষ্ক্রিয়, অতএব কাজে প্রবৃত্ত হইয়াও কাজ করেন না।

নিরাশীঃ—ফলের আশা শূন্য হইয়া,
যতচিত্তাত্মা—চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া,
ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ—সর্ব্বভোগ্যবস্তুর আহরণে উদাসীন হইয়া,

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্—কেবল শরীর দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতিজ-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা) কর্ম্ম করেন

(জীবাত্মাকে অনাসক্ত রাখিয়া), অতএব পাপগ্রস্ত হয়েন না। "শারীরং কর্ম্ম" বলিতে অনেকে কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম বুঝেন। তাহা কিন্তু ঠিক নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত জড়ভড়ৎকে ও কর্ম করিতে হয়। এখানে স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্মপালন আলোচনায় শুধুমাত্র শরীর রক্ষার কথা বুঝিলে ভুল বুঝা হইব।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো—লোভ না করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সন্তুষ্ট অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্ম-পালন করিয়া যাহা পাওয়া যায়," যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্", তাহাতে সন্তুষ্ট। ইহাতে মানসিক ভারসাম্য কখনও নষ্ট হয় না।

বিমৎসরঃ—বিদ্বেষীহীন, নির্ব্বৈর।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ কর্ম্মের জয় পরাজয় যাঁহাকে কোন প্রকার আঘাত হানিতে পারে না। পরিণামনির্ব্বিশেষ স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির কোন স্থান থাকে না। এইরূপভাবে কর্ম্ম করিলে সঙ্কল্পেরও কোন স্থান থাকে না, আর সঙ্কল্প না থাকিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিরও কোন স্থান নাই।

পরে পঞ্চম অধ্যায়ে[১] পুনরায় জ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিয়াছেন।

৪.৬.১ কর্ম্ম কখন বন্ধনহীন হয়?

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

১। ৫।১৮-২৮

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

অন্বয়—গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ, যজ্ঞায় আচরতঃ (জনস্য) সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা (কর্ত্রা) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নি তস্মিন্) হুতং (হোমঃ,) ব্রহ্ম; তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যং (প্রাপ্যম্)।

অনুবাদ—আসক্তিরহিত, মুক্ত, জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত (পুরুষের পক্ষে) যজ্ঞার্থে আচরণকারী (যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর) সমগ্র কর্ম্ম বিলীন হয় (নিষ্প্রয়োজন; অথবা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা বন্ধনহীন)। তাঁহার পক্ষে, ব্রহ্মই অর্পণস্বরূপ (যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হবি, (ব্রহ্মরূপ যজমান কর্ত্তৃক) ব্রহ্ম দ্বারা হুত হয়; ব্রহ্মে কর্ম্ম সমাহিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য বস্তু।

ব্যাখ্যা—গতসঙ্গস্য—কর্ম্ম কখন বন্ধনহীন হয়? শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এখানে এই দুইটী শ্লোকে পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এমন কি বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ—স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ।[১] পুরাকাল হইতে যজ্ঞচক্র অর্থাৎ দেবতা-মানুষের মধ্যে আদানপ্রদানের একটী ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। আর এই প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তী যে না হয়, সে পাপাত্মাই বৃথা জীবন যাপন করে।[২] অতএব যজ্ঞ না করা একরূপ অপরাধ গণ্য হইত। কিন্তু আত্মজ্ঞানে অনুরক্তদিগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য[৩] যে, যে জীব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার যজ্ঞ করা-না-করা সমতুল্য।

১। ৪।২৮ ২। ৩।১০-১৬ ৩। ৩।১৭-১৮

যজ্ঞায়াচরতঃ—এই অধ্যায়ে পণ্ডিতের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ের পুনরুক্তি করিলেন। অনাসক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত কর্ম বিলীন হয়; ব্রহ্মকেই লইয়া তাঁহার যজ্ঞ। অর্থাৎ অনাসক্ত জ্ঞানীরা নিরাশী, অতএব তাঁহাদের যজ্ঞের আড়ম্বর নিরর্থক। যজ্ঞচক্র সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা কর্তব্য তাহা তাঁহারা ব্রহ্মচক্রে করিয়া "ব্রহ্মকর্ম-সমাধি" দ্বারাই, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্ম সম্পন্ন করেন। ইহার তাৎপর্য্য কর্মকে বন্ধনহীন করিতে হইলে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে। এই কথাই পরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়[১] মন্তব্য করিলেন, "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ", আড়ম্বর-বহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চ্চাই শ্রেষ্ঠ।

৪.৭ যজ্ঞ কি ?

বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞবলিয়া গণ্য হইয়াছে
দৈবযজ্ঞ ঃ জ্ঞানযজ্ঞ

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

অন্বয়—অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্মযোগিনঃ) দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি)।

অনুবাদ—কোন কোন যোগী (কর্ম যোগীরা) দৈবযজ্ঞই (ইন্দ্রাদির উদ্দেশ্যে) অনুষ্ঠান করেন; অপর যোগীরা (জ্ঞান যোগীগণ) [যাঁহারা আত্মার নিষ্ক্রিয়তা জানিয়াছেন] ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞ আহুতি দেন (অর্থাৎ কর্ম করিয়া কর্মফল ত্যাগ করেন)।

১। ৪।৩৩

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, যথা বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ, সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি যজ্ঞ, কুম্ভকাদি প্রক্রিয়াও যজ্ঞ, অপানে প্রাণাহুতিও। এমনকি বর্ত্তমান কৃষ্ণার্জ্জুনসংলাপও যজ্ঞ।[১] আবার ব্রহ্মযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞও যজ্ঞ। ২৫ হইতে ৩০শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনা illustrative, exhaustive নহে; এবং তাঁহার মতে সকলেরই কোন না কোনও যজ্ঞকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ বিষয় তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরুক্তি করিয়াছেন,[২]

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তি পূর্ব্ব কথিত ভিন্ন ভিন্ন জীবের জন্য পৃথক পৃথক যজ্ঞ। সকল জীবের জন্য একই প্রকার যজ্ঞের বিধান দেন নাই; যদিও তাঁহার বিশেষ অনুজ্ঞা[৩] "নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম" —অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নাই।

৪.৭.১ ইন্দ্রিয় সংযম যজ্ঞ

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

১। ১৮।৭০ ২। ১৮।৫ ৩। ৪।৩২

অন্বয়—অন্যে (নৈষ্ঠিকাঃ ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি ; অন্যে (গৃহস্থাঃ মুমুক্ষবঃ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি। অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চ প্রাণকর্ম্মাণি জুহ্বতি।

অনুবাদ—কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল আহুতি দেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁহার সংযম) ; অন্য কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দেন (অর্থাৎ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগ্য, আত্মার ভোগ্য নহে, এই ধারণাই তাঁহার পক্ষে যজ্ঞ)। অপর কেহ জ্ঞানদ্বারা উদ্বোধিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কর্ম্ম (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) এবং প্রাণকর্ম্ম (শ্বাসাদি ক্রিয়া) আহুতি দেন (অর্থাৎ সমস্ত শরীরব্যাপার সংযত করাই তাঁহার যজ্ঞ)।

ব্যাখ্যা—এই সকল অনুষ্ঠান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, যথা সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি। গীতায় যজ্ঞ শব্দ যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে অনেক কর্ম্মকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। পুরাকালে যজ্ঞ বলিলে যে প্রক্রিয়া বুঝাইত তাহার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছিল। কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক আসিল। বহুবিধ অনুষ্ঠান, যাহাতে কোন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তাহাই যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মপালন করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জ্জুন সেই উপদেশানুসারে চলিলে অনেক যজ্ঞই তাঁহার করা হইবে। আর তিনি যদি জ্ঞানযজ্ঞ করেন তবে শ্রেষ্ঠযজ্ঞও করা হইবে। একারণ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে একেবারে শেষ পর্ব্বে[১] শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিলেন,

---

১ ।১৮।৭০

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ (অর্থাৎ ভগবদগীতা, ধর্ম্মবিষয়ক সংলাপ) অধ্যয়ন করেন, তাঁহার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই, এই আমার মত।

৪·৭·২ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যোগযজ্ঞ, প্রাণায়াম (পূরক, রেচক, কুম্ভক) যজ্ঞ, আহারসংযমযজ্ঞ

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২৮॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥২৯॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥৩০॥

অন্বয়—(কেচিৎ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (কেচিৎ) তপোযজ্ঞাঃ; (কেচিৎ) যোগযজ্ঞাঃ; তথা অপরে (কেচন) যতয়ঃ (মোক্ষার্থং প্রযত্নশীলাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ সংশিতব্রতাঃ। তথা অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণং (ঊর্দ্ধবৃত্তিং) [পূরকেণ] জুহ্বতি; তথা (কুম্ভকেন) প্রাণাপানগতী রুদ্ধা (রেচককালে) প্রাণে অপানং (জুহ্বতি); [এবং পূরক-কুম্ভক-রেচকৈঃ] প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ; অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে যজ্ঞবিদঃ সর্ব্বে অপি যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—কেহ দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্য উৎসর্গ), কেহ তপোযজ্ঞ (কৃচ্ছ্রব্রত), কেহ বা যোগযজ্ঞ (প্রাণায়ামাদি) করেন; আবার অপর কোন দৃঢ়ব্রত যতি শাস্ত্রার্থজ্ঞানলাভরূপ যজ্ঞও করেন। কেহ বা অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু [প্রাণ—প্রশ্বাস বা গ্রাহ্য শ্বাস); অপান—নিঃশ্বাস বা ত্যাজ্য শ্বাস] আহুতি দেন (পূরক), কেহ বা প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন (রেচক), আবার অপর কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করিয়া (কুম্ভক) প্রাণায়ামপরায়ণ হন। অপর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া (আহার সংযম করিয়া) প্রাণবায়ুদ্বারা প্রাণবায়ু সকলকে আহুতি দেন। এই সকল যজ্ঞবিদ্‌গণ যজ্ঞদ্বারা ক্ষয়িতপাপ হন।

ব্যাখ্যা—এই অধ্যায়ে পঁচিশ হইতে ত্রিশ শ্লোকে গীতাকার যজ্ঞের একটী তালিকা দেন—কিন্তু এই তালিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা illustrative and not exhaustive। শুধু তাহাই নহে, গীতায় যজ্ঞ শব্দ যে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে অনেক কর্ম্মকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরাকালে যজ্ঞ বলিতে তাহার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছিল, যথা—(ক) যজমান অর্থাৎ যিনি উদ্যোগী হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতেন; (খ) ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্টলাভের নিমিত্ত, পৃথক পৃথক দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞ করা হইত; (গ) ওই সকল দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্যাদি এবং (ঘ) যে অভীষ্ট লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্কল্প। আর যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল—দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে নিবেদন করিয়া অভীষ্ট লাভ।

এই অভিষ্ট ব্যক্তিগত হইতে পারিত, যথা পুণ্যসঞ্চয়, ধনপুত্র-

লাভ ; অথবা সমষ্টিগত ও সামাজিক হইত যথা সুবৃষ্টি, মারীভয়-নিবারণ। কতকগুলি যজ্ঞ রাজার বা সম্রাটের অভিষেকের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যথা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি।

কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক আসে। অনেক অনুষ্ঠান, যাহাতে কোন প্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাহাই যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। যাহা অর্পণ বা ত্যাগ করা যায়, তাহাই হবি, যাহাতে বা যে উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যায়, তাহা অগ্নি। দেবগণ জনসাধারণের মঙ্গলবিধান করেন, অতএব তাঁহারা জনহিতের বা সমাজের প্রতীক। দেবতাতে বা অগ্নিতে অর্পণ করার অর্থ জনহিতকল্পে কোনও দ্রব্য নিয়োগ করা, যথা পূর্তযজ্ঞে জলাশয়াদি। হবির অর্থ ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইল। যাহা কিছু নিয়োগ করা যাইতে পারে, বিত্ত, সামর্থ্য, এমনকি নিজের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত। অবশেষে সঙ্কল্প অর্থাৎ যে অভীষ্টের কামনায় যজ্ঞ হইতেছে তাহা পর্যন্ত হবির অন্তর্গত হইল, নিষ্কাম যজমান যজ্ঞকাল পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশ্য সকলেই যে সঙ্কল্প উৎসর্গ করিতেন তাহা নহে। তথাপি অধিকাংশ যজ্ঞই সমাজহিতকর, সেজন্য কোন যজ্ঞ না করা অপেক্ষা কাম্য যজ্ঞও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইত। ব্যাপক দৃষ্টিতে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানমাত্রই যজ্ঞ। কিন্তু যে কর্ম্মে আহুতি দানরূপ আড়ম্বর থাকিত, তাহাই যজ্ঞ নামে বিশেষিত হইত। এখনও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভূমিকা—রাজশেখর বসু)। অতএব যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই তাহাই বিহিত কর্ম্ম, তাহাই সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ।

৪.৭.৩ যজ্ঞাবশিষ্টরূপ অমৃতভোজনে ব্রহ্মলাভঃ অযজ্ঞকারীর ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। কুরুসত্তম! অয়ং (অল্পসুখোঽপি) লোকঃ (নরলোকঃ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞরহিতস্য) ন অস্তি; অন্যঃ (বহুসুখঃ পরলোকঃ) কুতঃ?

অনুবাদ—যজ্ঞাবিশিষ্ট অমৃত ভোজনকারীগণ সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞকারীর ইহলোক নাই, অন্য-লোক (পরলোক) কোথায়? (অর্থাৎ পরলোকে তাহার স্থান কোথায়?)।

ব্যাখ্যা—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—সকল যজ্ঞকারীই যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন। যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজনের অর্থ—উৎসৃষ্ট এবং অর্পিত বস্তুতে যজ্ঞকর্তার আর কোন সত্ব রহিল না, তাহা দেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইল, তবে যজ্ঞকর্তা জনসাধারণের একজন হিসাবে তাহা ভোগ করিতে পারেন এবং কৃতার্থ হন। উদাহরণ স্বরূপ, কোন যজ্ঞকারী পূর্তযজ্ঞ করিয়া জলাশয় খনন করিলেন কিংবা শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই জলাশয় হইতে জলগ্রহণ কিংবা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আপন পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাব্যবস্থা, জনসাধারণের একজন হিসাবে, করিতে পারেন এবং পুরাকালে সমাজভুক্ত লোকেরা

সেইরূপ আচারে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাই সনাতনধর্ম্মপুষ্ট সমাজে ভোগের রীতি ছিল। যজ্ঞকর্ত্তা নিজের ভোগের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন না, কারণ তাঁহাদের মতে তাহা ধর্ম্ম ও আচার বিরুদ্ধ।

বর্ত্তমান কালে শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে প্রায় শোনা যায়, শিল্পে ধর্ম্মঘট নচেৎ লক-আউট। কারণ, হয় শ্রমিকরা ভাবে তাহাদের ন্যায্য দাবী মালিকরা দিতেছেন না, কিংবা মালিকরা ভাবেন শ্রমিকরা যাহা তাহাদের দেয় (অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিগতভাবে end-product সৃষ্টি করিতে তাহাদের অবদান) তদপেক্ষা অধিক দাবী করিতেছে। ফলে এই সকল অবাঞ্ছনীয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব। ইহা ব্যাপকভাব ধারণ করিলে সমাজে ও সংসারে বহু ক্ষতি হইতে পারে। আধুনিককালে এই বিষয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে ক্ষতির পরিমাণ সময় সময় ভয়াবহ হইয়া উঠে। এই অবস্থার একটী সার্ব্বিক ও সুষ্ঠু সমাধান শিল্পগুলিকে যজ্ঞ হিসাবে বিচার করিয়া মালিকদিগের যজ্ঞাবিশিষ্টভোগ করা। সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই[১] [আধুনিক কালেও প্রযোজ্য] সমাজে residual theory of profit চালু করিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অযজ্ঞস্য—শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রুতিবাক্য "বিততা ব্রহ্মণো মুখে" উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিলেন "অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নাই"। অতএব তাঁহার মতে জীব সকলেরই কোন ও না কোনও যজ্ঞ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।[২]

১। ৩।১১-১৩ ২। ১৮।৫

৪'৭'৪ এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞের বিষয় ব্রহ্মমুখে (বেদে) উক্ত হইয়াছে

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

অন্বয়—ব্রহ্মণো (বেদস্য) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ; (তথাপি) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি; এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

অনুবাদ—এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মার মুখে (অর্থাৎ বেদে) বিস্তারিত হইয়াছে; তথাপি তুমি সেই সকল কর্ম্মজ (কর্ম্ম-সংবলিত, অথবা কেবল অন্ধ কর্ম্ম-মূলক, জ্ঞানমূলক নহে) বলিয়া জানিও; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে মুক্তি লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা—জীবকে যেরূপ যজ্ঞই হউক, কোনও না কোন যজ্ঞ, করিতেই হইবে। যজ্ঞের ফল আত্মাকে স্পর্শ করে না, যজ্ঞকর্ম্মে নিবদ্ধ থাকে। অতএব কেবল কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ করিলে জীবের মুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার মতবাদ প্রচার করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই প্রথম, যিনি বেদের কাম্যকর্ম্মের পরিবর্ত্তে পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই শ্রেয়ঃ বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানে সে কারণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে বলিতে চাহিলেন যে বেদোক্ত বহুবিধ যজ্ঞ "ক্রিয়া বিশেষবহুল",[১] সমস্তই কর্ম্মজ, জ্ঞানজ নহে। অর্থাৎ শুধুই কর্ম্ম, বুদ্ধি চালিত নহে। ওই সকল যজ্ঞকর্ম্ম জনসাধারণের জন্য। তাহারা অজ্ঞ, অতএব তাহাদের জন্য

১। ২।৪৩

এই সকল কর্মজ যজ্ঞের ব্যবস্থা, যাহাতে বহু আড়ম্বর, বহু ক্রিয়া। বিদ্বজ্জনগণ এইরূপ যজ্ঞ না করিলে কোনও ক্ষতি নাই, তবে লোকসংগ্রহের জন্য, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। তাঁহাদের উপযুক্ত যজ্ঞ অন্যবিধ : কিরূপ সেই যজ্ঞ ? পরের শ্লোকে তাহা দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ ভাষায় নির্দ্দেশ দিলেন।

৪.৭.৫ কিন্তু দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ঃ

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞ: পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

অন্বয়—পরন্তপ ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞ: শ্রেয়ান্; পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং (ফলসহিতং) কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

অনুবাদ—হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; হে পার্থ, অখিল (ফলসহিত) সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয় (সম্যক্ উদ্‌যাপিত হয়)।

ব্যাখ্যা - জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে – আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানর্চ্চাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা কেবল বিদ্বজ্জনগণের জন্য প্রশস্ত। ইহা সর্ব্বথা মনে রাখিয়া ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। লোকসংগ্রহার্থ শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানরা যজ্ঞ সবিধি অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ। তবে অর্জ্জুনের সমগোত্রীয়ের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাসের ফলে নির্লিপ্তি ও জ্ঞানযোগ যে এক তাহাই এই অধ্যায়ে বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং পরে আবার বলিলেন যে "যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ"[১] অর্থাৎ জপনির্ভর ধ্যানের

১। ১০।২৫

দ্বারা, একাগ্রচিন্তার দ্বারা জ্ঞানলাভের চেষ্টা। ইহাও একপ্রকার operational research।

৪.৮ এই সকল বিষয়ে জ্ঞান তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট জানিয়া লও

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়—তৎ প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন (চ) সেবয়া বিদ্ধি; তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।

অনুবাদ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন; অতএব তুমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া, সেবা করিয়া সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে।

ব্যাখ্যা—এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়ে[১] শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মনে রাখিলে এই শ্লোক বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, এবং কতিপয় আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অভিমতানুযায়ী এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ভুল ধারণা হইবে না। তাঁহার নির্দ্দেশঃ কার্য্য-অকার্য্য ব্যবস্থার নির্ণয়ের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার প্রমাণ, কর্ত্তব্যনির্ণায়ক; এই সকল শাস্ত্রবিধানোক্ত (তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে) জানিয়া ইহলোকে তোমার কর্ম্মকরা উচিত।

এই নির্দ্দেশ হইতে ইহা পরিস্ফুট যে বিদ্বানরাও সবিধি যজ্ঞ করিয়া জনগণের কর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিবেন। সবিধি যজ্ঞ করিয়া

১। ১৬।২৪

যজ্ঞকর্ম্মফলে নিরাসক্ত হও, অর্থাৎ পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহে অভিভূত হইবে না।

৪.৯ জ্ঞানযোগের ফল

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

অন্বয়—পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন (জ্ঞানেন) অশেষেন ভূতানি আত্মনি; অথো (ময়ি) অভেদেন দ্রক্ষ্যসি। চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ অসি (ভবসি) (তথাপি) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানপোতেন) এব সন্তরিষ্যসি। অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ (জ্বালিতঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং হি যস্মাৎ ন বিদ্যতে; তৎ (তস্মাৎ) যোগসংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি স্বয়ং (এব) বিন্দতি (লভতে)।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ করিলে পুনরায় তুমি

এইরূপ মোহে অভিভূত হইবে না ; যে জ্ঞানের দ্বারা নিখিল প্রাণী-সমূহকে আপনাতে, এবং পরে আমাতে (পরমাত্মাতে) দেখিবে। যদি সমস্ত পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা (সমুদয়) পাপসমুদ্র পার হইতে পারিবে। হে অর্জ্জুন ! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিকাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। ইহলোকে জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগ সংসিদ্ধ (বুদ্ধিযোগ দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত) পুরুষ কালক্রমে তাহা স্বয়ং (আপনা হইতে) আপনাতে লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে[১] শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন—সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ ও যোগিগণের কর্ম্মযোগ। সাংখ্য বলিতে সাংখ্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহে ; যে সকল সন্ন্যাসী সাংখ্যদর্শন নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া সংসার হইতে দূরে যথাসম্ভব কর্ম্মবর্জ্জন করিয়া চলিতেন, তাঁহারাই সাংখ্য। যোগীর অর্থ কর্ম্মযোগ-পরায়ণ। এঁরাও সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ লইতেন, কিন্তু অন্যবিধ মার্গ অনুসরণ করিতেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। গীতার যুগে সাংখ্যদর্শন বলিতে যাহা বুঝা যাইত তাহা আধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক, যদিও পদ্ধতি এক প্রকার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যকার কপিলের মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন, "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ"।[২] গীতোক্ত সাংখ্যে ব্রহ্মই কেন্দ্রস্বরূপ, কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য ব্রহ্মবর্জ্জিত। আর এই জ্ঞানযোগী আসক্তির আশঙ্কায় কর্ম্মপরিহার করেন।

১। ৩।৩ ২। ১০।২৬

বর্তমান এই চারটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের ফল সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই যোগ সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

৪.১০ কাঁহারা জ্ঞানলাভ করেন ?

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥
যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। অজ্ঞঃ, অশ্রদ্দধানঃ, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি; ন চ পরঃ (পরলোকঃ) ন চ সুখম্ (অস্তি)। ধনঞ্জয়! যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, জ্ঞানলাভে একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরমা শান্তি পান। কিন্তু জ্ঞানহীন, অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই এবং সুখও নাই। হে ধনঞ্জয়, যোগ দ্বারা (কর্ম্মযোগদ্বারা) যাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যস্ত হইয়াছে (অর্থাৎ কর্ম্মযোগাভ্যাসের ফলে যাঁহারা নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন, আত্মাতে সমস্ত অর্পণ করিতে পারেন) এবং

(আত্মবোধ) জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সংশয় সম্যক্ ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ আত্মবান্ (আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) পুরুষকে কর্ম্মফল আবদ্ধ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা—এই তিনটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কাঁহারা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহাদের একটী মোটামুটি তালিকা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সাধনায় সফল হইতে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন তাহাও নির্দ্দেশ দিয়া বহুবিধ নিষ্ঠার নিন্দা করিয়া সংশয়াত্মার বিনাশের বিষয়ও উল্লেখ করেন। এখানে বেদের কাম্যকর্ম্মের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, বেদবাদরতেরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের প্রয়াস সফল হইবে, কি-না-হইবে সর্ব্বদাই এইরূপ এক সংশয়েরও উল্লেখ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই। পরে কঠিন নির্দ্দেশ দিলেন,

৪.১১ শ্রীকৃষ্ণের মতে বুদ্ধিযোগনির্ভর কর্ম্মযোগই জ্ঞানযোগ

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্ হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

অন্বয়—তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ ; ভারত ! উত্তিষ্ঠ।

অনুবাদ—অতএব অজ্ঞানসম্ভূত তোমার হৃদয়স্থ এই সংশয় আপনার জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগ (বুদ্ধিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ) অবলম্বন কর ; হে ভারত, উঠ।

ব্যাখ্যা—অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই[১] মন্তব্য করিয়াছেন যে যাঁহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গলাভই যাঁহাদের পরম-পুরুষার্থ, যাঁহারা জন্মকর্ম্মফলপ্রদজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত নানাবিধ কর্ম্মবহুল বাক্যে বিমোহিতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, তাঁহারা সংশয়াত্মা, তাঁহাদের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না। এ কারণ অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ দেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ;"[২] "তুমি পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালন কর। এইরূপ কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ফলাকাঙ্খা নাই এবং কর্ম্মকর্ত্তা "তৎপরায়ণ ও তদেকচিত্ত" হইয়া কার্য্য করেন ও ফল "ভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্ত" বলিয়া কর্ম্ম-সম্পাদন করেন। এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিশ্চয়াত্মিকা এবং বুদ্ধি একনিষ্ঠা। ইহাতে সংশয়ের কোন স্থান নাই। এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ; এইরূপ বুদ্ধিনির্ভর কর্ম্মযোগই পরমজ্ঞান। এই জ্ঞান-অগ্নির দ্বারা সকল সংশয় ছেদন কর।" ইহাই গীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়।

১। ২।৪২-৪৪ ২। ২।৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

৫.০ অর্জ্জুনের প্রশ্ন : কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগং) [উক্তা] পুনঃ যোগং (কর্ম্মানুষ্ঠানং) চ শংসসি (কথয়সি); এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ তৎ একং সুনিশ্চিতং মে ব্রূহি।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—তুমি কর্ম্মত্যাগের কথা বলিতেছ, পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিতেছ; এই দুইটীর মধ্যে যেটী শ্রেয়ঃ সেইটী নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে[১] শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া সেই বিষয় বুঝাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে দেখা গেল, অর্জ্জুন তখন তাহা সঠিক ও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই বিষয় বিচার করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ষোলটী শ্লোকে[২] এ বিষয় বুঝাইয়া পরে[৩] জ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। প্রথম চারিটী শ্লোকে[৪]

১। ২।৩৯,৩।৩ ২। ৫।২-১৭ ৩। ৫।১৮-২৮ ৪। ৫।২,৪,৫,৬

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগে কোনরূপ পার্থক্য নাই তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পনেরোটী শ্লোকে[১] কর্ম্মযোগ পুনরায় ব্যাখ্যা করিয়া তিনটী শ্লোকে[২] কর্ম্ম করার পদ্ধতির নির্দ্দেশ দিলেন।

৫.১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর :

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

> সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
> তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – সন্ন্যাসঃ চ কর্ম্মযোগঃ উভৌ নিঃশ্রেয়-সকরৌ ; তু তয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন – সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস (আসক্তির আশঙ্কায় কর্ম্মবর্জ্জন) অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ।

ব্যাখ্যা—এই অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব সংসারে থাকিয়া কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটে না, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা এবং ফলত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মকরা ও কর্ম্মসন্ন্যাসের এক তুলনামূলক বিতর্কের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে,

---

১। ৫।৬-১৬,২০-২৩ ২। ৫।২৭-২৯

কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে—জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। কেন?

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী (realist) ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে জন্মাইলে বোধ হয় একজন প্রধান operational researcher বলিয়া খ্যাত হইতেন। তিনি জানিতেন যে সকল (মোক্ষ) শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ, অতএব মোক্ষপ্রদ, তাহাই সর্ব্বথা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। এই অনুসরণ যাহাতে স্বভাবজাত ও সহজ হয় সেইরূপ কোন প্রণালী, কোন Master method, উদ্ভাবন করিতে পারিলে জীবের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক ও সুখপ্রদ হইবে; এ কারণ গীতায় মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্বসূরীরা যে সব প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সব প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য করিলেন,[১]

> এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
> বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥
> নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
> স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্জ্জুন নানাবিধ লোকপ্রচলিত আপত্তি তুলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই সাংখ্যোক্ত আত্মতত্ত্ববিষয় ও তদন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের বক্তব্য—আত্মার অবিনাশিত্ব[২] সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। পরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের কর্ত্তব্য, লোকনিন্দার ভয়, রাজ্য বা স্বর্গলাভ ইত্যাদি বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মের যুক্তির[৩] অবতারণা করিয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে নিজের বক্তব্য রাখিলেন; "আত্মতত্ত্বে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমাকে বলা হইল, কর্ম্মযোগ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর; এই কর্ম্মযোগ

১। ২।৩৯-৪০ ২। ২।১১-৩০, ৩। ২।৪১-৪৪,

বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক এই কর্মযোগ ব্যবহার করিলে) কর্মবন্ধন পরিহার করিতে পারিবে। এই কর্মযোগ আরম্ভ করিলে বিফল হয় না; ইহাতে প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই। এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে।" এইরূপ কর্মযোগ, সহজ ভাষায়, পরিণামনির্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন,[১] অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মকরণ। ইহাই গীতার সারমর্ম। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জগতে জীবের কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন সম্ভব ও সহজ হইয়া জাগতিক সাধারণের পক্ষে সংসারের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। তাছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে এই মার্গ অনুসরণ করিয়া মোক্ষলাভ, পরমাগতিপ্রাপ্তি সত্যই সুলভ। অপর পক্ষে জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি সুদুষ্কর, অতীব কষ্টকর।

৫.১.১ নিত্য সন্ন্যাসী কে?

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়— যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি, সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ; মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ হি সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ— যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না (যাঁহার বিরাগ কিংবা অনুরাগের বিষয় কিছুই নাই, অর্থাৎ যিনি নির্দ্বন্দ্ব) তিনি নিত্যসন্ন্যাসী গণ্য হন; কর্ম করিলেও, তিনি সন্ন্যাসী; কারণ, হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ বন্ধন (কর্মফলাকাঙ্ক্ষাজনিত বন্ধন) হইতে সুখে, অনায়াসে মুক্ত হন।

১। ২।৩৯-৪০

ব্যাখ্যা—ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—কর্ম্মের বিষদাঁত সেই কর্ম্মের ফলের জয়পরাজয়জনিত অভিমান। যিনি এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলের প্রতি যাঁহার বিরাগ কিংবা অনুরাগ বিন্দুমাত্র নাই, যিনি পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাকে কর্ম্মের বিষদাঁত আঘাত করিতে পারে না। এই বিষদাঁতের আঘাতই জীবের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়। আর সমত্ব নষ্ট হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। "সমত্বং যোগ উচ্যতে।"[১]

নির্দ্বন্দ্বঃ—নিত্য নৈমিত্তিক দৈহিক ও জৈবিক আচরণ ব্যতীত কর্ম্ম করিলে জয় পরাজয় নিশ্চয়ই হইবে। এই জয় পরাজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়ার প্রয়োজন। ওই ঔদাসীন্য মানসিক সাম্য ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, একারণ নির্দ্বন্দ্ব হওয়ারও প্রয়োজন। জয় পরাজয়—এই উভয় মনোভাবকেই উপেক্ষা করিতে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং কিছুকাল সর্ব্ববিষয়ের ফলাফলের সম্বন্ধে এইভাবে উপেক্ষা করিতে অভ্যাস করিলে সঠিকভাবে ও সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্ব্বক পরিণামনির্ব্বিশেষে কর্ম্ম করিতে পারা যায়। ইহা কর্ম্মযোগীদিগের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ইহা এক বিরাট operational research। এ প্রসঙ্গে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের নির্দ্দেশ[২] স্মরণীয়, "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—যে যে কর্ম্ম করিবেন তৎসমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কর্ম্মের জয়পরাজয়জনিত অভিমানসম্ভূত মানসিক বিক্ষিপ্তির অবসান ঘটিয়া ভারসাম্য আসিবে আর জীব ক্রমশঃ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিবে। এই পদ্ধতিতে সংসারে ও

১। ২।৪৮ ২। ৮।২৩

সমাজে জীবের কর্ম্মশক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা এবং optimisation of human actions will be assured.

৫,১.২ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল একই ; তবে কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাসলাভ দুঃখজনক

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

অন্বয়—বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ ; একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ) যৎ স্থানং প্রাপ্যতে ; যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ গম্যতে ; যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি। মহাবাহো! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুং ; যোগযুক্তঃ তু মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ—বালকগণ (অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধিগণ) সাংখ্য (সন্ন্যাসমার্গ) ও যোগ (কর্ম্মযোগমার্গ) পৃথক বলে, কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না ; (কেন না) একটীকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়। যে অবস্থা (মোক্ষ) সাংখ্য দ্বারা (অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাস-দ্বারা) পাওয়া যায়, তাহা যোগ (কর্ম্মযোগ) দ্বারাও পাওয়া যায় ;

যিনি সাংখ্য ও যোগ এক দেখেন (অর্থাৎ পরিণামে সমান মনে করেন) তিনিই যথার্থ দেখেন (অর্থাৎ যথার্থ বোদ্ধা)। কিন্তু হে মহাবাহো ! অযোগদ্বারা (কর্মযোগ বিনা) সন্ন্যাস পাওয়া দুঃখজনক (কষ্টকর); যোগ (কর্মযোগ) যুক্ত মুনি (সাধক) অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন।

ব্যাখ্যা—Operationaliy শুদ্ধচেতা ব্যতীত অপর শ্রেণীর জীবের মোক্ষলাভ করিতে আর জাগতিক ব্যাপারে জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনায়, শ্রীকৃষ্ণে মতে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং সমগ্র গীতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কৃষ্ণবাসুদেব academician কিংবা theoretician ছিলেন না। তিনি ঘোর বাস্তববাদী। তাঁহার সময় প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব সমূহ সহজ ভাষায় বিস্তারিত করিয়া তিনি ওই সকল তত্ত্ব অনুসারে জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন, এবং নির্দ্দেশ দেন যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তাহা হইলে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাতে মন বসিবে, যা হেয় তাহাতে বিরাগ জন্মিবে। শুধু তাহাই নহে, হাতে কলমে কিরূপ অভ্যাস করিলে সহজে এই সকল তত্ত্বের সার— আধ্যাত্মিক জীবনে মোক্ষলাভ আর জাগতিক জীবনে কর্ম্মশক্তির পরকাষ্ঠাসাধন সম্ভব হয় তাহার এক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যান অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবলোকে প্রচার করেন। তাঁহার লক্ষ্য অর্জ্জুন— যাঁহার স্বধর্ম্মে উৎকর্ষ থাকিলেও, যিনি জীবনদর্শনের চরম জ্ঞানে পারঙ্গম ছিলেন না, যিনি শুদ্ধচেতা নন, এমন এক শ্রেণীর জীবনের পরম সার্থকতার (মোক্ষলাভ ও কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের) জন্য যে মার্গ সর্ব্বাধিক সহায়ক হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাছাড়া সমাজের যে বিরাট জনগণ অর্জ্জুন অপেক্ষা নিম্নস্তরের জীব,

তাহাদের বিষয়ও তাঁহার মনে ছিল ; সে কারণ এই ব্যাখ্যান কালে তাহাদের জন্য উপযুক্ত মার্গ সম্বন্ধেও বিবেচনা করেন। আর এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ দেন যে মোক্ষ নিশ্চই চরম লক্ষ্য হইলেও তাহাতে পৌঁছুবার যে সোপান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোনও এক পঙ্‌ক্তিতে উঠিতে পারিলে জনগণও মহাভয় হইতে ত্রাণ পাইবে এবং তাহাদের স্বকীয় শক্তির সম্যক ও সঠিক ব্যবহারে ইহলোকে যোগ্য স্থান পাইবে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"[১]

সন্ন্যাসস্তু দুঃখাপ্তুমযোগতঃ—কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস পাওয়া কষ্টকর। এখানে একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। পরম জ্ঞান ও চরম শান্তি পাইতে হইলে ত্যাগী হইতেই হইবে। এই ত্যাগ কি করিয়া জীব সহজে লাভ করিতে পারিবে? ইহাই হইল প্রধান প্রশ্ন। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য, সন্ন্যাস দ্বারা ত্যাগ সুদুষ্কর, কিন্তু নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সহজেই এই ত্যাগ স্বাভাবিক হয়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরে[২] ইহাই বিশদ ভাবে বলিয়াছেন,

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥

এবং শেষ কথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে[৩] এ বিষয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের অভিমত উল্লেখ করিয়া পরে নিজের মত দৃঢ়তার সহিত উক্ত করিলেন,[৪]

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥

ন চিরেণাধিগচ্ছতি—কর্ম্মযোগযুক্ত মুনিরা, সাধকরা অচিরে

১। ২।৪০ ২। ১২।১২ ৩। ১৮।২ ৪। ১৮।৫

ব্রহ্মলাভ করেন। এই আশ্বাস বাক্য (তাঁহার মতবাদ) শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবলোকে প্রচার করিলেন। সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মতাবলম্বীদের প্রতি এইরূপ আশ্বাস বাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র কিংবা নীতিশাস্ত্র হইতে অন্য পর্য্যায় লইয়া গিয়াছে ; এখানেই গীতার প্রাধান্য ও কার্য্যকারিতা।

৫.১.৩ কাঁহারা কর্ম্মযুক্ত হইয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না?

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

অন্বয়—বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মৈকত্বদর্শী) যোগযুক্তঃ (সন্) (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে। ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ণ তত্ত্ববিৎ (পুরুষঃ) যুক্তঃ (সন্) পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্, প্রলপন্, গৃহ্নন্, উন্মিষন্, নিমিষন্, অপি—অহং কিঞ্চিৎ এব ন করোমি—ইতি মন্যেত। যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে।

অনুবাদ—বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মার স্বরূপ-(অর্থাৎ যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সহিত ঐকাত্ম্য বোধ করেন) এই (সকল শ্রেণীর) রূপ পুরুষ যোগযুক্ত (কর্ম্ম-যোগযুক্ত) হইয়া কর্ম্ম করিলেও (কর্ম্মবন্ধনে) লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয় সকলেই নিবদ্ধ থাকে এই ধারণা করিয়া ও এইরূপ বুঝিয়া, তত্ত্ববিৎপুরুষ কর্ম্মযোগযুক্ত হইয়াও দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, স্বপনে (নিদ্রায়), নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, কথনে, ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষেতে—"আমি কিছুই করছি না"—এই প্রকার মনে করিবেন (বুঝিবেন)। যিনি ব্রহ্মে (সর্ব্বকর্ম্ম) সমর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম সকল করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপদ্বারা লিপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা—কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে—কাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কর্মফলে লিপ্ত হন না? এঁরা চারি প্রকারের: বিশুদ্ধচিত্ত, বশীকৃত-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। বিশুদ্ধচিত্তেরা স্ব স্ব সুবুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী স্বচ্ছ মন লইয়া কর্ম্ম করেন, অতএব তাঁহাদের জয়পরাজয়ের প্রশ্ন উঠে না; স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য—work is worship—ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা শুদ্ধচেতা। বশীকৃতচিত্ত তাঁহারা, যাঁহাদের চিত্ত কোনরূপ বাহিরের চাপে বিকৃত হয় না; জিতেন্দ্রিয় শ্রেণীভুক্ত তাঁহারা, যাঁহারা কামাদি কোন রিপুর দ্বারা দোষদুষ্ট হন না। অতএব তাঁহারা কর্ম্মজনিত জয়-পরাজয়ের অভিমানে ক্লিষ্ট হয়েন না; এবং যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর সহিত ঐকাত্ম্যবোধ করেন তাঁহাদের পক্ষে পরাজয়ের কোন প্রশ্নই নাই, কারণ অন্যের জয়, নিজেতরের জয়—তাঁহারই জয়।

জীবের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কোন

এক শ্রেণীভূক্ত কি করিয়া হওয়া যায়? শ্রীকৃষ্ণ পরে[১] জীবের প্রকৃতিস্থ সত্ত্বাদিগুণানুসারে তাহার ত্যাগ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, এবং সামাজিক স্তর ও বৃত্তি যে স্থিরীকৃত হয় তাহা বর্ণনা করিয়া নির্দ্দেশ দেন.[২] "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"। এই নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিলে শুধু যে কর্ম্মবন্ধন খণ্ডণ করা যায় তাহা নহে, জীব স্বধর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাহার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠলাভ এবং সিদ্ধিলাভ করে।

যতঃ প্রবৃত্তিভূ'তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে গীতাকার সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বানুসারে জীবন যাত্রার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং দ্ব্যর্থহীন স্বচ্ছ ভাষায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন—এইরূপে জীবন যাত্রা নিরূপণ কর, তাহা হইলে যাহা শ্রেয় তাহাতে জীব আকৃষ্ট হইবে এবং যাহা অপকৃষ্ট তাহাতে তাহার বিরাগ জন্মিবে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমি—আমি কিছুই করিতেছি না। তাহা হইলে জীবের মনে প্রশ্ন জাগিবে—কাজ করে কে? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলেই নিবদ্ধ থাকে, জীবাত্মা নিজে কিছুই করেন না। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ্‌নির্ভর। কেনোপনিষৎ প্রশ্ন তোলেন.[৩]

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

মন কাঁহা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে?

১। ১৮।২০-৪৪ ২। ১৮।৪৫-৪৬ ৩। ১।১

(শরীর অভ্যন্তরে) প্রথম (প্রধান রূপে বর্ত্তমান) প্রাণ কাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার চালনায় লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন ?

আর উত্তর দেন,[১] যেন বাগভ্যুদ্যতে, যেনাহুর্ম্মনো মতম্, যেন চক্ষুংষি পশ্যতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ; তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি।

যাঁহা হইতে বাক্য প্রকাশিত (উচ্চারিত) হয়, যিনি মনকে জানেন বলিয়া (ব্রহ্মবিদেরা) বলেন, যাঁহার শক্তিতে (লোকে) চক্ষু-গোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করান (অর্থাৎ জানেন), যাঁহার শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জান।

শ্রীকৃষ্ণ এই কয়েকটী শ্লোকে প্রথমেই জৈবিক আচরণ সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্ পুরুষদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা "আমি কিছুই করি না" – চিত্তের এই অবস্থা অভ্যাসপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণই এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত আছে – এই ভাব আয়ত্ত করেন। পরে সাংসারিক কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ব্যাপারেও কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মোদ্ভূত জয়পরাজয়ের অভিমান ত দূরের কথা, "কোনরূপ কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি" এই ভাব চিত্তে পুষ্ট করিয়া তুলিলে স্বভাবে পরিণত হইবে, এবং জীব কর্ম্মের বিষ দাঁতে আহত হইবে না।

ব্রহ্মণ্যাধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি—এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন ওঠে : মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম্ম বিনা উদ্দেশ্যে করিতে পারে

১। ১।৪-৮

না। তাহা হইলে উপরি-উক্ত কর্ম্ম করার যে পদ্ধতির কথা কৃষ্ণবাসুদেব তত্ত্ববিদের জন্য নির্দ্ধারণ করিলেন, তাহার proper import (সত্য ও সঠিক তাৎপর্য্য) কি ? সঠিক তাৎপর্য্য হইতেছে – নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ লক্ষ্যহীন কর্ম্ম নহে। নিষ্কামের অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থবিহীন। সর্ব্বভূতের বা বহুজনের মঙ্গল ব্যক্তিগত স্বার্থ নহে, তাহাই ব্রহ্ম-উদ্দেশ্যে ; সুকৃতি দুষ্কৃতির হিসাব না করিয়া পরিণাম-নির্ব্বিশেষে কৌশলে[১] অর্থাৎ বিশিষ্ট উপায়ে দক্ষতার সহিত যোগস্থ অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত[২] হইয়া করণীয় কর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম-পালন ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে সাধন করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করার পদ্ধতিকে গীতায় কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে। এ কারণ এই সকল তত্ত্ববিদেরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কর্ম্ম করেন।

৫.২ এই সকল তত্ত্ববিদের কর্ম্মকরার পদ্ধতি

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কৈবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ণ ॥১৩॥

অন্বয়—যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, কৈবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি ; অযুক্তঃ (জনঃ) কামকারেণ ফলে সক্তঃ (আসক্তঃ

১। ২।৫০ ২। ২।৪৮

সন্‌) নিবধাতে। বশী (জিতচিত্তঃ) দেহী (জনঃ) সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নবদ্বারে পুরে (দেহে) (স্বয়ং) ন এব কুর্ব্বন্‌ ন এব কারয়ন্‌ (প্রবর্ত্তয়ন্‌) সুখম্‌ আস্তে।

অনুবাদ—(এই নিমিত্ত) (কর্ম্ম) যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও (কর্ম্মাভিনিবেশ শূন্য) ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। (এই হেতু) যোগে সমাহিত (পুরুষ) কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিক (নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা সম্ভূত) শান্তি পান ; অযুক্ত (পুরুষ) (ঈশ্বরনিষ্ঠা বিমুখ) কামনা-জনিত কার্য্য দ্বারা ফলে (কর্ম্মসিদ্ধি বিষয়ে) আসক্ত হইয়া (কর্ম্মে) আবদ্ধ হয়। (এবং) ইন্দ্রিয়সংযমী ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম মনের দ্বারা সন্ন্যস্ত করিয়া (আত্মাকে নির্লিপ্ত বুঝিয়া) নবদ্বার বিশিষ্ট (২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ) দেহে স্বয়ং কিছু না করিয়া এবং (অন্যদ্বারা) কিছু না করাইয়া (আত্মা নিজে কিছু করেন না বা করান না, এই বুঝিয়া) সুখে বাস করেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে জৈবিক আচরণের বিষয় আলোচনা করিয়া সমাজ ও সংসারে থাকিয়া কিরূপভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ এখন নির্দ্ধারণ করিলেন।

কর্ম্ম করিতে হইলে operationally end-product (প্রত্যেক কর্ম্মেরই কর্ম্মকর্ত্তার নিকট একটী উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকে) সম্বন্ধে (১) সুনির্দ্দিষ্ট একটী ধারণা করিয়া, তৎপ্রাপ্তির জন্য (২) পরিকল্পনা করিতে হয় এবং (৩) পরিকল্পনার পর সঠিক ভাবে ধাপে ধাপে কাজ করিলে, সমগ্র কর্ম্মটীর সমাপ্তির পর ফলপ্রাপ্তি ঘটে (end-product is achieved)। এই কর্ম্মপদ্ধতিতে দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধি,

মন ও শরীরের প্রয়োজন। বুদ্ধি উদ্দিষ্ট বস্তু (end product-এর) পরিকল্পনা করে এবং মন ও শরীর তাহা কার্য্যে পরিণত করে। পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদনা ঠিক ভাবে হইলে end-product-এর সৃষ্টি হয়। ইহাই স্থূলভাবে কর্ম্মফলের উৎপত্তি এবং ইহার উদ্দেশ্যে জীব কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট হয় ও কর্ম্ম করিয়া থাকে।

সকলেই জানেন "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে"; অতএব প্রত্যেক কর্ম্মকর্ত্তা end-product-এর দ্বারা লুব্ধ হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন এবং কর্ম্মফলে আট্‌কা পড়িয়া এক প্রলয়কারী গোল-যোগের আবর্ত্তে পড়িয়া যান। তখন সেই আবর্ত্তনীর মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ "ন ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকৃৎ"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মকরার এমন এক কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে যাহাতে পুরুষেরা পরিকল্পিত কর্ম্মও করিবে অথচ আবর্ত্তনীর মধ্যে পড়িবে না। শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটী শ্লোকে সেই কৌশল ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ফলত্যাগ পূর্ব্বক মন, বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্ম করিবে এবং নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম সম্পাদনা পূর্ব্বক "তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্তু" অর্থাৎ ফলে কর্ম্ম-কর্ত্তার কোন অধিকার নাই—"মা ফলেষু কদাচন"—এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিবে।" এইরূপ অভ্যাসের দুইটী বিশেষ ফল হয়। operationally কর্ম্মকর্ত্তার সমস্ত নিষ্ঠা ও শক্তি কর্ম্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ায় কর্ম্মফলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন সম্ভব হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "এফল কিন্তু আমার প্রাপ্য নহে"—এই ভাব নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা কর্ম্ম-সন্ন্যাসের মনোবৃত্তি উদ্ভব ও বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়ায় কর্ম্মের আসল বিষদাঁত একেবারে ভোঁতা হইয়া যাইবে এবং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মের ফলের অভিমানও দূর হইবে। আর

শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্—এই কৌশল অনুযায়ী কর্ম করিলে নৈষ্ঠিকী শান্তি পাওয়া যায়,[১] এবং এইরূপ অভ্যাসের ফলে, "সুখং বশী," বশীকৃতচিত্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে জিতচিত্তমনের দ্বারা (অর্থাৎ বিচার পূর্ব্বক) কর্মফল ত্যাগ করিয়া,

নবদ্বারে পুরে দেহী—নবদ্বারবিশিষ্ট দেহী হওয়া সত্ত্বেও যোগী সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়, ইন্দ্রিয়সংযমী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম মনের দ্বারা সন্ন্যস্ত করিয়া, আত্মাকে নির্লিপ্ত বুঝিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে স্বয়ং কিছু না করিয়া এবং অন্যদ্বারা কিছু না করাইয়া অর্থাৎ আত্মা নিজে কিছু করেন না বা করান না, এই বুঝিয়া সুখে বাস করেন।

৫.৩ জীবের প্রকৃতিই ফলের উৎপাদিকা ; পাপপুণ্যবোধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

অন্বয়—প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি চ (ন), (তথা) কর্ম্মফলসংযোগং (চ) ন (সৃজয়তি); স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে। বিভুঃ কস্যচিৎ পাপম ন আদত্তে (গৃহ্নাতি), সুকৃতিং চ ন এব ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্ (আচ্ছাদিতং) ; তেন (হেতুনা) জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহ্যন্তি।

১। ২।৭০

অনুবাদ—প্রভু (নবদ্বারপুরের অধিপতি আত্মা) লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মও সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মফলসংযোগও সৃজন করেন না ; জীবের স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়। বিভু (সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্য ও গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত (আচ্ছাদিত) থাকে ; সে কারণ প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়।

ব্যাখ্যা—প্রভুঃ—আত্মাই যে ঈশ্বর ইহা উপনিষদ্ নিশ্চিত করিয়া বলেন "তিনি রাজার ন্যায় এই একাদশদ্বার বিশিষ্ট পুরসদৃশ দেহে অবস্থিত আছেন।"[১] শ্রীকৃষ্ণ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে একথা বলিয়াছেন।[২] তিনি পুরস্বামী আত্মা।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি সৃজতি—এই দুইটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে জীবাত্মার Role কি তাহার ব্যাখ্যান করিলেন এবং এই প্রসঙ্গক্রমে সংসারে ও সমাজের সাধারণ জীবের সদাপ্রচলিত ধারণা যে কি তাহাও পরিষ্কার করিয়া বিচার করিলেন।

সাধারণ জীব কর্ম্ম করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিজেই গ্রহণ করে এবং যে পর্য্যন্ত কৃতকর্ম্মের ফল জীবের মনোমত হইতে থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ববোধ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখে। কিন্তু কর্ম্মে জয় না ঘটিয়া কৃতকর্ম্মের ফল অন্তরূপ হইলে কিংবা সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়া পর্য্যুদস্ত হইলে, এই সকল জীব বলিতে থাকে "শ্রীভগবান্ যাহাকে যেরূপ কর্ম্ম করান, সে সেই রূপ কর্ম্ম করে ; ইহাতে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই সকল কর্ম্ম করিয়া সে নূতন

১। কঠো ২।২।১ ২। ১৮।৬১

কর্ম্ম সৃষ্টি করে না, অতএব কর্ম্মজনিত পাপ-পুণ্য-ফল-সংযোগ তাহার ঘটে না। এ সমস্তই বিভু করান এবং বিভুই এই সকল কর্ম্মফলের ভোক্তা। সে নিজে তাহার হাতের পুতুল এবং সম্যকভাবে "নিমিত্ত-মাত্র"। পরাজয়জনিত ক্ষয় ক্ষতি পূরণ হইবার পর পুনরায় সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং স্বীয় কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব নিজেই গ্রহণ করে।

সাধারণ জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে উপরি-উক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই ব্যাপারে তাহার ধারণা স্বচ্ছ নহে। জয়ী হইলে জীব নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, কিন্তু সে জানে না যে নবদ্বারপুরের অধিপতি আত্মা কর্ত্তা নহেন; কর্ম্ম বা কর্ম্মের সঙ্গে ফলের যে সম্বন্ধ তাহারও তিনি উৎপাদক নহেন। জীবের প্রকৃতিই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফলের উৎপাদিকা। আর পরাজিত হইলে কিংবা অপকর্ম্ম করিলে বিভুই সব কিছু করেন এবং এই সমস্ত কর্ম্মের ফলেরই বিভুই ভোক্তা – জীবের এই রূপ মানসিক ব্যবহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বিভুর নিকট, পরমাত্মার কাছে বিহিত কর্ম্ম ও অবিহিত কর্ম্মের বৈষম্য নাই, যেমন নাই পাপীর ও পুণ্যবানের বৈষম্য। পাপ পুণ্য বোধ জীবের প্রকৃতির ধর্ম্ম। অজ্ঞানবশতঃ জীব আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি আরোপ করে। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি জানে না যে আত্মা কেবল organisation সৃষ্টি করেন, তাহাতে বিশ্বের সকলেই সূত্রে মণিগণাঃ ইব"[১] নিযুক্ত; সেই organisation একটী বিশেষ পরিধির মধ্যে, একটী বিশেষ system অনুযায়ী কাজ করে। আত্মা কিছুই করেন না। সেই organisation ওই পরিধির মধ্যে, ওই বিশিষ্ট system-এর অন্তর্গত থাকিয়া automatic; আত্মা দ্রষ্টা আর সেই

১। ৭।৭

দৃষ্টি energy যোগান, শক্তি দেন। সাধারণ জীব মনে করে যে সেই-ই সব, সকল বিষয়ে কর্ত্তা। ইহাই তাহার ভ্রম। আধুনিক কালে giant electronic computor এর ন্যায় জীব কাজ করে। এই সকল computor system-অনুযায়ী কাজ করে; তাহার বাহিরে যাইবার ক্ষমতা থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ পরে[১] এই কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন,

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসৎযোনিজন্মসু ॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥

পরমেশ্বর (বিভু) একবার তাঁহার স্ব-ইচ্ছায়, স ইমাঁল্লোকানসৃজত[২] – বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করিবার পর তাহাদিগকে পুনরায় বিনাশ না করা পর্য্যন্ত সেই সকল জীব স্ব স্ব স্বভাববশে অবশ হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে।[৩] ইহার কোন অন্যথা হইতে পারে না বা হয় না। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই[৪] বলিয়াছেন যে সাধারণ প্রাণিগণ যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। আর তিনি নিজে সৃষ্টজীবকে বিনাশ না করা পর্য্যন্ত সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকেন এবং স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার নিজের ভূমিকা

১। ১৩।২২-২৪ ২। ঐত ১।১ ৩। ৯।৭-৮ ৪। ৩।৩৩

সম্বন্ধে এই দুই শ্লোকে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। আর মন্তব্য করিলেন :

৫.৪ কোন্ জ্ঞান আদিত্যবৎ পরমাত্মাকে প্রকাশ করে ?

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—তু আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং তৎ জ্ঞানম্ আদিত্যবৎ পরং প্রকাশয়তি। তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ (জনাঃ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (সন্তঃ) অপুনরাবৃত্তিং (ন পুনর্দেহসম্বন্ধং) গচ্ছন্তি।

অনুবাদ—কিন্তু আত্মজ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের ঐ জ্ঞান (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অজ্ঞানদ্বারা আবৃত জ্ঞান) আদিত্যবৎ পরমাত্মাকে প্রকাশ করে। তাঁহাতে যাঁহারা বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের বুদ্ধি ঈশ্বর-অভিমুখিনী) তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মা, তাঁহাতে যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ধৌতপাপ হইয়া পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) পান না।

ব্যাখ্যা—জ্ঞানেন তু—কিন্তু যাঁহারা সম্যক্ জানিয়াছেন যে আত্মা কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মের বা কর্ম্মের সঙ্গে ফলের যে সম্বন্ধ তাহারও

উৎপাদক নহেন, প্রকৃতিই একমাত্র উৎপাদিকা, তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা আদিত্যবৎ প্রকাশিত হন। অভ্যাসের দ্বারা জৈবিক কর্ম্ম যেমন স্বয়ংক্রিয় হইয়া যায় এবং জীবাত্মার নিকট সেই সকল কর্ম্মের কর্তৃত্ব একেবারে লোপ পায়, তদ্রূপ এই সকল কর্ম্মকুশলীদিগের সংসারযাপনের কর্ম্মগুলি যে প্রকৃতি সম্পাদন করে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ক্রিয়, তাহা উপলব্ধি হওয়ায় কর্ম্মকর্তৃত্ব, কর্ম্মফলসংযোগ, কর্ম্মোদ্ভূত পাপ-পুণ্য-বোধ দূরীভূত হইয়া যায়।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং – আর এই জ্ঞান হওয়ায়, তাহাদের সমস্ত মোহ দূর হইয়া এই সব জিতচিত্তগণ "অপুনরাবৃত্তি" প্রাপ্ত হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ব্যত্যয় ঘটে না এবং কর্ম্ম-ত্যাগও ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই। এই সকল জিতচিত্তেরা "নিরগ্নি" অথবা "অক্রিয়" নহেন। তাঁহারও সন্ন্যাসী এবং যোগী। পরবর্ত্তী এগারোটী শ্লোকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্ কাঁহারা – সেই প্রশ্নের উত্তরে – শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই দৃঢ়তার সহিত পুনরুক্তি করিলেন :

৫.৭.১ ব্রহ্মবিদ্ কাঁহারা ?

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥২৬॥
স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

অন্বয় – বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চ, গবি, হস্তিনি, শুনি চ এব, পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (ভবন্তি) ; যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং, তৈঃ ইহ (সংসারে) এব সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ ; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ, তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ। স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ (জ্ঞানী) ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ (সন্‌) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ ন উদ্বিজেৎ। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু) অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং (তৎ) বিন্দতি, সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম অশ্নুতে। হে কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ

(সুখানি) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়জাঃ) তে হি দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখস্যৈব কারণভূতাঃ) এব, (তথা) আদ্যন্তবন্তঃ চ, বুধঃ (বিবেকী) তেষু (সুখেষু) ন রমতে। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগং ইহৈব (উদ্ভবসময়ে এব) সোঢ়ুং (প্রতিরোদ্ধুং) শক্নোতি, সঃ (নরঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) সঃ (এব) নরঃ সুখী। যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব, ব্রহ্মভূতঃ সঃ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি। ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপাঃ), ছিন্নদ্বৈধাঃ (বিনষ্টসংশয়াঃ) যতাত্মনঃ (সংযতচিত্তাঃ), সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ঋষয়ঃ (সম্যগ্দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষং) লভন্তে। কামক্রোধবিযুক্তানাং, যতচেতসাং সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বনাং) যতীনাং অভিতঃ (ত্বরান্বিতঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে। বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, নাসাভ্যন্তরচারিনৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, ভ্রুবোঃ অন্তরে চক্ষুঃ (কৃত্বা) চ এব, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (সন্), যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ (ভবতি), সঃ সদা এব মুক্তঃ।

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত তুল্যরূপ দেখেন। যাঁহাদের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারাই জীবিতাবস্থাতেই সংসার জয় করেন ; যেহেতু তাঁহাদের মন ব্রহ্মের সমান দোষস্পর্শহীন, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ় (জ্ঞানী) ও ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মে অবস্থান করিয়া প্রিয়বস্তু পাইয়া আনন্দিত হন না বা অপ্রিয়বস্তু লাভে উদ্বিগ্ন হন না। বাহ্যবিষয়ের স্পর্শে (ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে) যিনি অনাসক্তচিত্ত, তিনি অন্তঃরণে শান্তি সুখ অসীম ভাবে অনুভব করেন, শেষে তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। হে কৌন্তেয়! যে সকল ভোগ (সুখ) বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শজনিত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য)

তাহারা দুঃখের কারণ এবং আদি-অন্ত-বিশিষ্ট (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী) ; পণ্ডিতগণ সে সকলে রত হন না। যিনি শরীরমোচনের পূর্ব্বে (অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই) ইহলোকে কাম-ক্রোধোদ্ভব বেগ (চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি, urge) সহ্য করিতে পারেন (অর্থাৎ শান্ত করিতে পারেন), তিনিই সমাহিত যোগী, তিনিই সুখী। যিনি আপন অন্তঃকরণেই সুখী (বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা রাখেন না), আপনাতেই পরিতৃপ্ত, এবং যিনি অন্তরে উদ্ভাসিত (যিনি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে নির্ভর না করিয়া সমস্ত বিষয়ের যথার্থ্য নিজ মনে নিরূপিত করিতে পারেন) সেই যোগী ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মের সহিত একীভূত) হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ পান। এবং নিষ্পাপ, সংশয়বিহীন, সংযতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতেরত, আত্মদর্শী ঋষিগণ (তত্ত্বদর্শিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। আর কামক্রোধ-বিযুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতিগণের ত্বরায় ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে ; এবং বাহ্যবিষয়ের অনুভূতিরোধ করিয়া (বাহ্যবিষয়ের স্পর্শ বাহিরে রাখিয়া) চক্ষু (দৃষ্টি) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, নাসার অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ অপান বায়ুকে সম (কুম্ভক) করিয়া যে মুনি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং যাঁহার ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে, তিনি সদাই মুক্ত।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ—ইহা উপনিষদের পুনরুক্তি ; কারণ যাঁহারা জানেন,

ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ ॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত ;

তাঁহাদের পক্ষে এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করা অসম্ভব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কেহ কেহ "সমদর্শিনঃ" বলিতে বোঝেন যে পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে,

চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে সমভাবে প্রীতিভাবাপন্ন ; তাঁহারা আরো বলেন সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জ এক হইলে সৃষ্টির সার্থকতা কোথায় ? পার্থক্য আছে বলিয়া সৃষ্টি। অতএব উপনিষদের মন্ত্রে "ইমাঁল্লোকানসৃজত", বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। সে নিমিত্ত ইঁহাদের মতে জীবাত্মার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আধার তুলামূল্য নহে। এইরূপ যুক্তি ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয় ; কারণ context দেখিলে অর্থাৎ এই শ্লোকের পূর্ব্বের দুটী শ্লোক[1] বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল সৌভাগ্যবানদিগের বিষয় বিচার করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহার (পরমাত্মার) সহিত একাত্ম। এই ঐকাত্মভাবের উদাহরণ হিসাবে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য "ইতর" জীবের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় মন্তব্য যে ইহারা সকলে তুল্যমূল্য অতএব সমদৃষ্টির দাবিদার। They are of equal importance and as such they claim equal treatment ; তুল্যমুল্য বলিয়া সমপ্রীতি-ভাজনের দাবি। এ ছাড়া এই আলেখ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতে চাহেন যে যদিও সৃষ্টির শেষে জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ অনেক শব্দের বাচ্য ও অনেক জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, তথাপি যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা সবই এক ও অভিন্ন। অন্য কথায় ইহাই প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদ, ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাদের এক সংশয়হীন ব্যাখ্যা।

যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ — জয় পরাজয় প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী অবস্থা সংসার ও সমাজে মানবের চিত্তের ভারসাম্য নষ্ট করে ; কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান, যে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন,

---

১। ৫।১৬-১৭

তাঁহাদের এই ভারসাম্য রক্ষা করিতে সহায়তা করে এবং তাঁহারা ইহলোকে, সংসারে সত্য জয় লাভ করেন।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য—এ লক্ষণ সম্ভব হয় তাঁহারই, যিনি "সাম্যোস্থিত"। সাংসারিক জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "প্রিয় ও অপ্রিয়"; কারণ "ব্রহ্মণি স্থিতের" নিকট দ্বৈত, পরস্পর-বিরোধী অবস্থা থাকিতে পারে না; তাঁহার পক্ষে "নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।"

সুখমক্ষয়মশ্নুতে—অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ইহা এক বিরাট গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে প্রিয় নাই, অপ্রিয় নাই; যাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুকুর এবং চণ্ডাল এক; যিনি "ব্রহ্মণি স্থিত," তাঁহার নিকট অক্ষয় সুখ আকাশ পুষ্পের ন্যায় অলীক, এক সোনার পাথর-বাটী। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবকে বলিতে চাহিতেছেন যে জ্ঞানযোগে সাংখ্যসন্ন্যাসীরা আসক্তির আশঙ্কায় কর্ম্ম পরিহার করেন, জনসাধারণের সহিত সংস্রব রাখেন না; তাঁহাদের অনুষ্ঠান মানসিক প্রক্রিয়া, কেবল তপস্যা—যাহার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। আর ব্রহ্মলাভে অনন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখ। পক্ষান্তরে কর্ম্মযোগী বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জনসাধারণের সহিত তাঁহার ব্যবহার যুক্ত রাখেন। তিনি সাধারণ লোকের সম্মুখে সহজসাধ্য হিতকর আদর্শ নিজের আচরণ দ্বারা স্থাপন করেন। তিনি "লোকসংগ্রহচিকীর্ষু"[১] অর্থাৎ লোকরক্ষা বা লোকহিত করিতে চাহেন। তিনি কেবল

১। ৩।২৫

নিজেরই উন্নতি করেন না, "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্,"[১] যোগপরায়ণ হইয়া সর্ব্বকর্ম সমাচরণ করিয়া লোকসেবা করেন। তাঁহার অনুষ্ঠান কেবল মানসিক ব্যাপার নহে, তিনি "ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমারভতে,"[২] মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ হাতে কলমে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন। কর্ম্মযোগী এই দিক দিয়া অসামাজিক জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসী হইতে পৃথক; তিনি কর্ম্মযোগী, সামাজিক গৃহী, তথাপি নির্লিপ্ত। তিনি নিত্যকর্ম্ম করিয়াও বাহিরের বিষয়ে আসক্ত হন না এবং পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মযোগযুক্ত অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

ন তেষু রমতে বুধঃ – পণ্ডিতগণ ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগে রত হন না। প্রবাদ আছে, "মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার; ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ করি না।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মুখ্যত, গীতায় ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হইয়াছে। জীবন যাত্রার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যাহাতে জনসাধারণ শ্রেষ্ঠজন প্রদর্শিত ও আচরিত আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া সংসারে স্বস্তি, সুখ ও শান্তি সহজে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারই এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্যান। ইহাতে সকল জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনও সম্ভবপর হইবে। "বিষয়জাত সুখদুঃখের কারণ বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিও না; পক্ষান্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করিয়া কাজ কর যাহাতে তোমার কর্ম্মশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইবে, সমাজের ও সংসারের পরম কল্যাণ হইবে এবং তুমিও কর্ম্মের বিষদাঁতে আহত হইবে না কিংবা কর্ম্মফলের আবর্ত্তনীর

১। ৩।২৬ ২। ৩।৭

মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে না। অথচ অনন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখ লাভ করিবে।"

প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ—এই শ্লোকে আর একটি ব্যবহারিক বিদ্যা কথিত হইয়াছে। যিনি শরীর মোচনের পূর্ব্বে জীবদ্দশাতেই ইহলোকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি, urge শান্ত করিতে পারেন, তিনিই যোগসমাহিত, তিনি সত্যই সুখী। মানুষের আধারে জীবাত্মা সৃষ্ট হইলে কামাদির বেগে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অভিভূত হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ, "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে",[১] করণীয় কর্ম্মে বুদ্ধি প্রযুক্ত করিবে অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক নিজের ব্যবহারকে সংযত করিবে। বিচার কি প্রকার?[২]

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ—এই শ্লোক হইতে পর পর পাঁচটী শ্লোকে ব্রহ্মবিদের শেষ অবস্থার একটী আলেখ্য আঁকা হইয়াছে। তিনি কিরূপ দৈহিক প্রণালীর সাহায্যে বাহ্যবিষয়ের অনুভূতিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত করেন সে বিষয় নির্দ্দেশ দেন। এই অভ্যাসের ফলে তিনি বাহ্যবিষয়ের অপেক্ষা রাখেন না, আপনাতেই পরিতৃপ্ত এবং তিনি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে নির্ভর না করিয়া সমস্ত বিষয়ের

১। ২।৫০ ২। ২।৬২-৬৩

যথার্থ্য স্বীয় মনে নিরূপিত করিতে পারেন। অভ্যাসের এই শেষ ধাপে পৌঁছাইয়া সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি নিষ্পাপ, সংশয়বিহীন, সংযতচিত্ত ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া সমাজে ও সংসারে বসবাস করেন। আর এই জাতীয় যতির ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে।

৫.৫ [পরমাত্মাকেই] ঈশ্বরকেই যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ জানিলে শান্তি

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

অন্বয়—মাং যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং, সর্ব্বলোকমহেশ্বরং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা (সঃ জীবঃ) শান্তিম্ ঋচ্ছতি।

অনুবাদ—আমাকে (পরমাত্মাকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ জানিয়া জীব শান্তি লাভ করে।

ব্যাখ্যা—ভোক্তারং—এই শব্দটীর বিচার অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে। আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভোক্তা জানিলে জীব শান্তি লাভ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে বিভু কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না এবং পুণ্যও নহে[১]; অর্থাৎ সৃষ্টজীবের কর্ম্মফল পরমাত্মা গ্রহণ করেন না; তাহা হইলে এখানে "ভোক্তারং" বলিতে কি বলিতে চাহিয়াছেন? পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য

১। ৫।১৪-১৫

রক্ষা করিলে এবং সমগ্র গীতার বিচার মনে রাখিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ : তিনি ফলগ্রাহী নহেন ; তাঁহাতে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ফল নিষ্কামভাবে অর্পণ করিবে। ইহা নূতন কিছু নহে। সনাতনধর্ম্মাশ্রিত হিন্দুসমাজে ইহা পূর্ব্বাপর বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। যে কোন সনাতনধর্ম্মাশ্রিত হিন্দুসমাজভুক্ত সংসারে পূজাপাঠান্তে শুনা যায় পুরোহিত মহাশয় পূজাপাঠ সমাপনান্তে বলিতেছেন, "ওঁ ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং, তৎসর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু," আমার দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত হইল তৎ সম্যক্ শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত হউক।

যজমানের নামে সংকল্প করিয়া পুরোহিত মহাশয় পূজাপাঠ আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু পূজাপাঠ সম্পাদন করেন এই বলিয়া "আমার দ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম কৃত হইল, তৎ সম্যক্ শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত হউক।" ইহাই সকল প্রকার যজ্ঞ তপস্যা করিবার বিধি। এই কথাই পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভাষায় বলিয়াছেন,[১]

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥

এবং ইহার পর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন সেই অমৃত-বর্ষিণী অদ্বৈতবাদ[২] যাহা ভারতের আকাশে বাতাসে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে,

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

১। ৪।২৩ ২। ৪।২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ

৬.০ ফলাকাঙ্খারহিত ব্যক্তি যোগী

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদুচ্যতে ॥৪॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – যঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং (বিহিতং) কর্ম করোতি, সঃ চ সন্ন্যাসী চ যোগী; নিরগ্নিঃ ন, অক্রিয়ঃ চ ন। পাণ্ডব! (পণ্ডিতাঃ) যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি; হি, (যতঃ) অসন্ন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চনঃ (কোঽপি) যোগী ন ভবতি। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (আরোঢ়ুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছোঃ) মুনেঃ (তদারোহে) কর্ম কারণম্ উচ্যতে; যোগারূঢ়স্য তস্য (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) শমঃ (জ্ঞান পরিপাকে) এব কারণম্ উচ্যতে। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি), কর্মসু (অপি) ন, তৎ (সঃ) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিলেন—যিনি কর্ম্মফলের উপর নির্ভর না করিয়া করণীয় কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী ; নিরগ্নি নন্‌, অক্রিয় ও নন্‌। হে পাণ্ডব ! (সুধীগণ) যাঁহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও ; কারণ কামনা ত্যাগ না করিতে পারিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যোগ-আরোহন-ইচ্ছু মুনির (পক্ষে) কর্ম্ম করাই কারণ (সাধনার উপায়) উক্ত হয় ; (কিন্তু) যোগারূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে শমই কারণ (সাধনার উপায়) উক্ত হয়। যখন জীব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্ত হন না, কর্ম সকলেও নহে, তখন সেই সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত সন্ন্যাসী জীব যোগারূঢ় উক্ত হন।

ব্যাখ্যা—ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে দৃঢ়ভাবে ও পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ দিতেছেন যে যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। নিরগ্নি নন্‌, অক্রিয়ও নন্‌। অর্থাৎ যিনি অগ্নিহোত্রাদি বর্জ্জন করিয়াছেন অথবা কোন ক্রিয়াই করেন না, তিনি সন্ন্যাসী যোগী নন।

যোগং তং বিদ্ধি—এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসকে যোগ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুধীগণ যাহাকে যোগ বলেন, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও। কারণ দেখাইতেছেন যে কামনা, ফলাশা ত্যাগ না করিলে কেহই (কর্ম) যোগী হইতে পারে না। যাঁহার সঙ্কল্প সন্ন্যস্ত হয়নি, তিনি কখনও যোগী হন না। এ বিষয় আরো পরিষ্কার করিলেন পরের শ্লোকে।

আরুরুক্ষোঃ—যোগ-আরোহণ-ইচ্ছু সাধকের পক্ষে (স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্মপালনই) কর্ম করাই সাধনার উপায়, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম

করাই যোগ পথে অগ্রসর হইতে সহায়। যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সাধনার ক্ষেত্রে উন্নতির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু,

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে—যোগারূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে শমই সাধনার উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মযোগ সাধনায় পটু হইয়াছেন, তাঁহাকে "নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং শান্তিম্"র[১] জন্য দশ হইতে সতেরো শ্লোকে বিবৃত শম-সাধনা করিতে হইবে। "শম" বলিতে সর্ব্ব-কর্ম্ম নিবৃত্তি বুঝান হইয়াছে। পরের শ্লোকে যোগারূঢ়ের সংজ্ঞা দিতে শমের স্পষ্ট অর্থ স্বচ্ছ করা হইয়াছে। His acts will fall from him (as dry leaves fall out) and his path will be tranquil.

সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী—সমুদয় সঙ্কল্পবর্জ্জিত (মহা) পুরুষকে যোগারূঢ় বলা হয়। তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে এবং কর্ম্মসকলেও আসক্ত হন না।

৬·১ নিজেকে উদ্ধার করিতে জীবাত্মার স্বকীয়া চেষ্টা

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

১। ৬।১৫

অন্বয়—আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ ; হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। যেন আত্মনা আত্মা এব জিতঃ, আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ ; তু অনাত্মনঃ আত্মা শক্রবৎ শক্রত্বে এব বর্ত্ততে।

অনুবাদ—(এই জন্য) আত্মার দ্বারা আত্মার (জীবাত্মার) উদ্ধার করিবে, আত্মাকে (জীবাত্মাকে) অবসাদগ্রস্ত করিবে না ; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার (জীবাত্মার) শক্র। যাঁহার (চেষ্টার, অভ্যাসের) দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা জিত (বশী-ভূত) হইয়াছে, তাঁহার আত্মা আত্মার বন্ধু ; কিন্তু অনাত্মার (যাঁহার আত্মা জিত হয় নি তাঁহার) আত্মা শক্রবৎ আত্মার শক্রত্বে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা—এই অভ্যাস যোগ সাধারণের জন্য নহে। ইহা যোগ-আরোহণ-ইচ্ছু মুনির পরের স্তরের জন্য, অর্থাৎ যিনি সাধক এবং যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই সাধনার উপায়। এই কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া মুনি যখন কর্ম্মযোগ সাধনায় পটু হন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্ত হন না এবং কর্ম্ম সকল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। সেই সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী তখন যোগারূঢ় হন। তখন তাঁহার জন্য এই অভ্যাসযোগ।

ইহা হইতে দেখা যায়, আরুরুক্ষ ও যোগারূঢ়ের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। অভ্যাসযোগ দ্বারা সেই ব্যবধান অতিক্রম করা যায়।

আত্মনাত্মানং—এই দুইটী শ্লোকে আত্মা শব্দ বিশেষ গোল বাধাইয়াছে। আত্মাকে বন্ধু বলা হইয়াছে, আবার রিপু, শক্র বলা

হইয়াছে। আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার আত্মাকে অবসন্ন করিবে না—ইহাও নির্দেশ দিয়াছেন।

এই সকল গোলযোগের সমাধান তখনই সম্ভব, যখন গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝা যায়। গীতাকার তাঁহার সময় প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বসমূহ ভিত্তি করিয়া ঐ সকল তত্ত্ব নিজ ভাষায় বিস্তারিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—ঐ সকল তত্ত্ব অনুসারে জীবন যাত্রার পদ্ধতিনির্দ্ধারণ।

বেদান্ত ও সাংখ্য সূত্রগ্রন্থ প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক। কি করিয়া এই সকল তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করিতে হয়, এই সকল গ্রন্থে তাহার কোন বিস্তারিত বিধান নাই; যিনি মোক্ষকাম তাঁহাকে নিজবুদ্ধির দ্বারা বা অপর কোন ব্যবহারিক শাস্ত্রের সাহায্যে সূত্রনির্ণীত তত্ত্ব সকল কাজে লাগাইতে হয়।

কিন্তু গীতা এই সকল গ্রন্থ হইতে পৃথক। গীতায়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি ইহাতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে পৃথীবীর বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা যাহাতে নানাবিধ তত্ত্বের, theoretical knowledgeএর সবিশেষে ও সঠিক প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীর মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে Dunoyer, Martin, Bourdeau এবং Espinasএর চেষ্টা ছিল যাহাতে সমস্ত theoretical knowledge, সমগ্র তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যার সঠিক ও সম্পূর্ণ প্রয়োগের দ্বারা মানুষের optimisation of efficient actions সম্ভব হয়। এখানেও গীতাতে সেই একই চেষ্টা, কি করিয়া কর্ম্ম করার পদ্ধতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া জীবের কর্ম্মপ্রয়াস সম্পূর্ণ ও সার্থক করা যায়। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কয়েকজন

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ যথা ব্রিটেনের Von Mises, Alfred Marshall ও A. C. Pigou এবং রাশিয়ার Slutsky অর্থনীতির মাধ্যমে এ বিষয়ে গবেষণা করেন। ইহার পর Polandএ চেষ্টা হয় কি করিয়া অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়াও অন্যান্য তত্ত্বের নির্দেশগুলি কাজে লাগাইয়া সকল প্রকার efficient actions কে optimise করিতে পারা যায়। এই প্রয়াসের শেষ রূপ Principles of Praxiology এবং এই ব্যবহারিক বিদ্যার বিস্তার কল্পে Polish Academy of Sciencesএর অন্তর্গত Praxiology গবেষণাগার। যাহার উদ্দেশ্য "to study the new discipline termed praxiology and concerned with the efficiency of actions understood as generally as possible. The principles of praxiology thus apply to industrial production, agriculture, animal breeding, transport, health services, education and schooling, public administration, administration of justice, national defence, sports, games, theatre, fine arts etc alike,"[১]

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে কৃষ্ণবাসুদেব গীতায় কতো গভীরে, আরো কতো ব্যাপকভাবে এইরূপ এক বৈজ্ঞানিক সামগ্রিক ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখন রাজশেখর বসুর ভাষায় বলিতেছি "গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা Ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে—এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে—এই জন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন—এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।"

১। Praxiology— Kotarbiniski, Polish Perspective, Septr. 1970, pp8.

এই পটভূমিকায় দেখা যাউক, আত্মা বলিতে কৃষ্ণবাসুদেব কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অভ্যাস-তথা-ধ্যান যোগে তিনি এইরূপ এক পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন যাহাতে পরমাত্মা দ্বারা আবদ্ধ জীবাত্মা তাঁহার বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। কেনোপনিষদে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ব্যতীত অন্য কাহারো কোন শক্তি নাই। তাহা হইলে জীবাত্মার মুক্তি পাইবার modus operandii কি হইবে? উত্তর

আত্মনাত্মানম্ উদ্ধরেৎ—আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবে। বদ্ধ বলিয়া আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না।

এখানে একটী বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত সাংখ্যদর্শন স্বীকার করিলেও, তিনি তাহা বেদান্তের অনুগামী করিয়া বলেন—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েরই মূল ব্রহ্ম[১] এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্ত্বা। এই ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, সৎ-চিৎ-আনন্দ। তাহা হইলে, এখন প্রশ্ন : তাঁহার আবার বদ্ধ অবস্থা কি? সেই অবস্থা হইতে তাঁহার উদ্ধারই বা কি? এবং তাঁহার (আত্মার) আবার অবসাদ কি? ইহার উত্তরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ ব্যাখ্যান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,[২] "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সমুদয় উপভোগ করেন[৩] এবং বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন ও সুখ দুঃখাদির অধীন হন। তবে শ্রীকৃষ্ণের মতে তন্নির্দ্দিষ্ট সাধনপদ্ধতির অনুসরণ করিলে পুরুষ তাহার স্বতন্ত্র নির্গুণ অবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে এবং তাহার সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

১। ১৩।২০ ২। ১৫।৭-৮ ৩। ১৫।৯

এ কারণ, আবার বলি শ্রীকৃষ্ণ আধুনিক কালের Praxiology বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শাশ্বত অবদান এবং (মুমুক্ষু) জীবমাত্রেরই অত্যন্ত আদরের বস্তু।

এখন বিচার্য্য: বদ্ধ আত্মার মুক্তির উপায় কি? প্রথমেই এই জ্ঞান—যে জীবাত্মা "মমৈবাংশঃ"। জীব মনে প্রাণে এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পর নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালনে পটু হইয়া পরে এই অধ্যায়োক্ত দশ হইতে সপ্তদশ শ্লোকে বিবৃত শম-সাধনায় তৎপর হইবে। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষৎ হইতে দুইটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিলে এই শ্লোকার্থ সহজ বোধ্য হইবে। উপনিষৎ বলেন,[১]

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচি।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥

যে আত্মরথীর বুদ্ধিরূপ সারথি অবিবেকী (অর্থাৎ uncontrolled আত্মা), মনোরূপ প্রগ্রহ (রজ্জু) অগৃহীত (অসমাহিত) এবং নিয়ত অশুচিভাবাপন্ন, সেই রথী অক্ষরব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন না (অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হন্ না); পরন্তু (জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল) এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে যে আত্মরথী বিজ্ঞানবান্ বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট এবং সমনস্ক (প্রগৃহীতমনা) ও নিয়ত শুচিভাবযুক্ত, সেই রথী অক্ষরব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১। কঠো ১।৩।৭-৮

ইহার পরের মন্ত্রে[১] বিষয় বস্তু আরো স্বচ্ছ করিয়া উপনিষৎ ঘোষণা করেন,

বিজ্ঞান-সারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যে সুধীব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকযুক্ত বুদ্ধি-সারথিসম্পন্ন এবং মন যাঁহার প্রগ্রহস্থানীয়, সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে যাইতে পারেন (অর্থাৎ জীবাত্মা দেহমুক্ত হন) ও বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।

এ কারণ কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশানুযায়ী সাধনার দ্বারা অভ্যাস-তথা-ধ্যানের মাধ্যমে জীবাত্মা (অর্থাৎ আরুরুক্ষ জীব) তাঁহার স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা বুদ্ধিযোগের সাহায্যে মোহমুক্ত হইয়া পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস যোগ তাঁহার পক্ষে প্রযুজ্য যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া তাহাতে পটু হইয়াছেন। এখানে দুটী বিভিন্ন অবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থা : যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে (নিষ্কাম) কর্ম্মই সাধনার উপায়; দ্বিতীয় অবস্থা : যিনি কর্ম্মযোগ সাধনায় পটু হইয়াছেন, তাঁহাকে পরমা শান্তি পাইবার জন্য, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য দশম হইতে সপ্তদশ শ্লোক বর্ণিত শম-সাধনা করিতে হইবে।

(কর্ম্ম) যোগী ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের মাধ্যমে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম সঠিকভাবে করিতে পারিবেন। শুদ্ধচেতার এইরূপ অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। সে কারণ, আচার্য্য শঙ্করের

১। কঠো ১।৩।৯

মতে "যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মেভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণম্।" ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মোহবদ্ধ জীব এইরূপ অভ্যাসের সাহায্যে জিতাত্মা (অর্থাৎ মোহজাল ভেদ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন) হইতে পারেন। কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব জিতাত্মা হইবেন, পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেকারণ জিতাত্মার লক্ষণ বিশ্লেষণ করিলেন :

৬.২ জিতাত্মার লক্ষণ

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ॥৯॥

অন্বয়—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (অতঃ) কূটস্থঃ (অতএব) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ; সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ (সমাহিতঃ)—ইতি উচ্যতে। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু, অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ (অতএব) বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—আত্মজয়ী, প্রশান্ত (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত) পুরুষের আত্মা শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে এবং মান-অপমানে পরম সমাহিত (অর্থাৎ নির্ব্বিকার) থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান (অর্থাৎ পরোক্ষ বা শাস্ত্রাদিলব্ধ এবং প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ) দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত, নির্ব্বিকার,

জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী (কর্ম্ম) যোগীকে যুক্ত (যোগারূঢ়) বলে। তিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, এবং বন্ধুর প্রতি, সাধুগণের প্রতি ও পাপীগণের প্রতি সমবুদ্ধি ; এজন্য বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ) গণ্য হন।

ব্যাখ্যা—পরম্ সমাহিতঃ—অর্থাৎ জিতাত্মা, যেহেতু তাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত, তিনি সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার। অতএব তাঁহার ভাবসাম্যের কোনরূপ বিকার হয় না।

জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা—জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রাদিলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান আর বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত-চিত্ত। বিজ্ঞান অর্থে আধুনিক কালের প্রযুক্তি বিদ্যা নহে ; প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না—"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্।"[১]

কূটস্থঃ—স্থানু, নির্ব্বিকার ;

সুহৃৎ—যে উপকারক প্রত্যুপকারের আশা করে না ;

মিত্রঃ—স্নেহবান্ ;

উদাসীন—যে কোনও পক্ষ অবলম্বন করে না ;

মধ্যস্থ—বিরুদ্ধ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী ;

বন্ধুঃ—আত্মীয় ;

দ্বেষ্যঃ—অপ্রিয়ব্যক্তি।

এইরূপ জিতাত্মা কি প্রকার অভ্যাসের দ্বারা হওয়া সম্ভব, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ এখন নির্দ্দেশ দিলেন।

১। কঠো ১।২।১২

৬.৩ অভ্যাস-তথা-ধ্যান যোগ

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

অন্বয়—যোগী সততং রহসি স্থিতঃ (সন্) একাকী, যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ) অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মানং যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ)। শুচৌদেশে (শুদ্ধস্থানে) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশানামুপরি চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্য ইত্যর্থঃ) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অত্যুন্নতং) ন চ অতিনীচম্ আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (আসনে) স্থিরম্ উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (সংযতাঃ চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ যস্য সঃ) (সন্) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধ্যর্থং) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যসেৎ)।

কায়শিরোগ্রীবং সমম্ (অবক্রম্) অচলং ধারয়ন্, স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নঃ) (সন্) স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রঃ সন্) দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে) স্থিতঃ (সন্) মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ (এবং) যুক্তঃ (ভূত্বা) আসীত (তিষ্ঠেৎ)। এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ যোগী নির্ব্বাণপরামাং মৎসংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি। অর্জ্জুন! তু অত্যশ্নতঃ (অত্যন্তং ভুঞ্জানস্য) যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য), ন চ অতি-স্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) ন চ এব জাগ্রতঃ (যোগঃ অস্তি)। যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি।

অনুবাদ— যোগী সতত (অহরহ) নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া একাকী, নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া আপনাকে যোগে সমাহিত করিবেন। তিনি শুদ্ধস্থানে স্থির, অনতি-উচ্চ, অনতি-নীচ কুশের উপর চর্ম্ম এবং তাহার উপর বস্ত্র বিস্তার করিয়া আপনার আসন স্থাপনপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করিয়া মন একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন। দেহ, মস্তক, গ্রীবা সমান ও স্থির রাখিয়া স্বয়ং স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকাগ্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং অনন্যদৃষ্টি হইয়া প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থির হইয়া মনকে সংযত করিবেন এবং মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। এই প্রকারে সর্ব্বদা নিজের মন যুক্ত রাখিয়া সংযতচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি প্রাপ্ত হন। (পরন্তু) হে অর্জ্জুন! অতিভোজীর এবং একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না; অতিনিদ্রালু কিংবা একেবারে জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হয় না।

নিয়মিত আহারবিহারকারী কর্ম্মসমূহে নিয়মিত চেষ্টাসম্পন্ন, উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণশীল ব্যক্তির যোগ দুঃখনাশক হয়।

ব্যাখ্যা—উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, দুই প্রকার জীবের জন্য সাধনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যোগ-আরোহণ-ইচ্ছু সাধকের পক্ষে কর্ম্মকরাই সাধনার উপায়, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে (নিষ্কাম) কর্ম্মই সাধনার উপায়। এইরূপ অভ্যাসে কর্ম্মযুক্ত হইয়া যোগারূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে (অর্থাৎ যিনি কর্ম্মযোগ সাধনায় পটু হইয়াছে) "নির্ব্বাণ-পরমা মৎসংস্থা" শান্তির জন্য এই সকল শ্লোকে বর্ণিত শম-সাধনা করিতে হইবে। শম অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি।

যোগী—তৃতীয় শ্লোকোক্ত সম শাধক।

অপরিগ্রহঃ—ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে মমতাহীন।

বিগতভীঃ—সিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ভয়।

সমম্—অবক্র।

স্থিরঃ—দৃঢ় প্রযত্ন।

সংপ্রেক্ষ্য—অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র।

নির্ব্বাণ পরমাং—নির্ব্বাণই যাঁহার পরম লক্ষ্য।

মৎসংস্থাম্—ব্রহ্ম-আশ্রিতা।

মতভং—জনসাধারণ এই অভ্যাস যোগ হইতে সামান্যই লাভ করিতে পারে। নির্জ্জনস্থানে অল্প কিছু সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার অভ্যাস করিলে যে স্বকীয় কর্ম্মসাধনায় concentration আসিবার সম্ভাবনা, এই নির্দ্দেশে তাহা মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, "সতত" (অর্থাৎ অহরহ) নির্জ্জন স্থানে ধ্যান করিবেন। কে করিবেন—যোগী; তৃতীয় শ্লোকোক্ত শম-সাধক; সাধারণ ব্যক্তি নহে।

তবে এই সকল শ্লোকোক্ত নির্দ্দেশ মানিলে একটী লাভ হয় এবং তাহা সাধকের জীবনে পরম লাভ। ধ্যান বা একাগ্রচিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা কর্ম্মের তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিলে লোকে ফল সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। কোন ক্রিয়া (process) ব্যতিরেকে, অর্থাৎ কোন একটী ক্রিয়া না থাকিলে ধ্যান অসম্ভব। চিন্তাও মানসিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া কোন বিশেষ বিষয়ে প্রযুক্ত করিতে হয় (যথা কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানে, তাহা হইল যুক্তি বা প্রয়োগ)। পরে সেই ক্রিয়া একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত হইবে (অর্থাৎ ধ্যান)। এই ক্রিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা সহকারে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কৌশল। এর অনুষ্ঠাতার নিজের কোন ফলাশা বা স্বার্থ নাই, তিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন।

নিরাশীরপরিগ্রহঃ—কিন্তু এইরূপ ক্রিয়া করিলেই যোগ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে এখানে নির্দ্দেশ দিলেন যে একাগ্রচিত্তে কাজ করিলেই যোগ হয় না, সুকৌশলে কাজ করিলেও যোগ হয় না; সমত্ব ও ফলাশাবর্জ্জন চাই।

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্—কৃষ্ণবাসুদেব ইন্দ্রিয়-সংযম ও আসক্তিত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য করণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জবরদস্তির বিরোধী। "প্রকৃতি যান্তি

ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ।"[১] সংযম ও সবলে-নিরোধ এক নহে। পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি উক্তিতে[২] এবং বর্ত্তমানে[৩] তাঁহার নির্দ্দেশে অনেকে মনে করেন যে গীতায় হঠযোগের কথা আছে। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। পরে এ বিষয় তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দেশের রূপ স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছেন।[৪]

> অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
> দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
> কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
> মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥

তৎকথিত যোগ-অভ্যাস "আত্মবিশুদ্ধয়ে", চিত্তশুদ্ধির জন্য; ইহার উদ্দেশ্য "শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং", নির্ব্বাণ অভিমুখী ব্রহ্ম আশ্রিত শান্তি; অণিমা-লঘিমাদি অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য লাভ নহে। অতএব চলিত কথায় যোগ বলিতে যাহা বুঝায় গীতায় তজ্জাতীয় কিছু কিছু প্রক্রিয়া বিহিত আছে বলিয়া যাঁহারা এই গ্রন্থে হঠযোগের উল্লেখ দেখেন, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত।

তাহা হইলে প্রশ্ন: আসল যোগ কি? এ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পরের ছয়টী শ্লোকে বিস্তারিত করিয়া বিষয়বস্তুটী পরিষ্কার করিয়াছেন।

৬.৩.১ যোগ কি?

> যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
> নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥
> যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
> যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

১। ৩।৩৩ ২। ৪।২৪-৩০ ৩। ৬।১১-১৪ ৪। ১৭।৫-৬

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

অন্বয়—যদা বিনিয়তং (নিরুদ্ধং) চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং তিষ্ঠতি); তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (সঃ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে। যথা নিবাতস্থঃ (বাতশূন্যস্থানে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে (চলতি), আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা। যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) যোগসেবয়া (যোগানুষ্ঠানেন) নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তম্ উপরমতে, যত্র চ আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি (তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ)। যত্র অয়ং যত্তৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকং (অনন্তং) সুখং বেত্তি (অনুভবতি), যত্র চ স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) ন চলতি। যং (আত্মস্বরূপং) লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে। তং দুঃখ-সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ ; সঃ যোগঃ অনির্ব্বিণ্ণচেতসা নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ।

অনুবাদ—(এই যোগ অভ্যাস দ্বারা) যখন মন সর্ব্বতোভাবে সংযতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে থাকে, তখন

সকল কামনা বর্জ্জিত হয়, এবং তিনিই (সেইরূপ যোগী) যোগযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন্। যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপ চঞ্চল হয় না— আত্মবিষয়ক যোগযুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর সম্বন্ধে এই উপমা শোনা যায়। যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান দ্বারা সংযতচিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়) এবং যে অবস্থায় শুদ্ধচিত্ত দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া (অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া) আত্মাতেই পরিতোষ পাওয়া যায়, (তাহাই যোগ)। যে অবস্থায় আত্যন্তিক সুখ—যাহা বুদ্ধির দ্বারাই গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়—তাহা যোগী জানিতে পারেন এবং যে অবস্থায় থাকিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হন না, (তাহাই যোগ)। যাহা লাভ করিলে অপর কোনও লাভ তাঁহার অধিক মনে হয় না, যাহাতে স্থিত হইয়া গুরু দুঃখেও তিনি বিচলিত হন না (তাহাই যোগ)। এই হেতু দুঃখসম্পর্কশূন্য অবস্থাবিশেষকে যোগ বলিয়া জানিবে; সেই যোগ নির্ব্বেদশূন্য (অবসাদ শূন্য) চিত্তে বিশেষ ভাবে আচরণীয়।

ব্যাখ্যা—অমরকোষে যোগের অর্থ—সংহনন (সংহতি), উপায় (উপার্জ্জন), ধ্যান, সংগতি (মিলন), যুক্তি (প্রয়োগ)। চলিত কথায় যোগ বলিলে হঠযোগাদি বোঝায়। গীতায় যোগশব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। সমগ্র গীতায় নব্বইটী শ্লোকে যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল দুই এক স্থলে ইহার অর্থ উপায় বা উপার্জ্জন, যথা "যোগক্ষেম"। কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র যোগ শব্দ এক বিশেষ অথচ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে যোগের লক্ষণ পাওয়া যায়:

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।[১]

১। ২।৪৮

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ।[১]
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ।[২]

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত। কর্ম্মে কুশলতাই যোগ। কামনা ত্যাগ না করিতে পারিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। আর যেহেতু ধ্যান বা একাগ্র চিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়, সে কারণ ধ্যান ও প্রয়োগ (বা যুক্তি) এই দুই আভিধানিক অর্থও গীতোক্ত "যোগ" শব্দে উহ্য আছে।

এই পটভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে সদা—এই শ্লোকে "যুক্তের" একটী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। "তখন তিনি যুক্ত উক্ত হন"। কখন ? জীব যখন নিয়ন্ত্রিতচিত্ত হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করেন এবং তিনি (জীব) সর্ব্বকামনাতে নিস্পৃহ হন।

কর্ম্মতত্ত্ব বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জীব যখন দেখেন যে জয় পরাজয় মানসিক ভ্রান্তিবিলাস, তখন তিনি সংযতচিত্ত। তাঁহার মানসিক ভারসাম্যের কোন অভাব হয় না এবং তিনি সর্ব্বকামনাতে নিস্পৃহ হন। জীবের তখন বন্ধনমোচন হয় এবং তিনি পরমাত্মায় যুক্ত হন। এই অবস্থাই পরে শ্লোকের "যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ"। ইহার পরের শ্লোকে গীতাকার আর এক ধাপ এগিয়ে চলিলেন এবং সর্ব্বশেষ নির্দ্দেশ দিলেন, "স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা"।

১। ২।৫০ ২। ৬।২

যত্রোপরমতে চিত্তং—যখন নিরুদ্ধচিত্ত জীব যোগ অভ্যাস দ্বারা উপরমন করিয়া (অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া) আপনার (বুদ্ধি যোগের চেষ্টার) দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন ;

স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ—তখন অতীন্দ্রিয় সুখ কি, তাহা জানিতে পারিয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হন না এবং

ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে—গুরু দুঃখেও ভারসাম্য হারান না ও

যোক্তব্য যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা—দুঃখসংযোগবিয়োগকে (অর্থাৎ সেই অবস্থাকে যাহাতে দুঃখ অনুভূতি মাত্র হয়, কিন্তু মানসিক বিকার হয় না) যোগ বলিয়া জানিবে ; এই যোগ নির্ব্বেদশূন্য (অবসাদ শূন্য) চিত্তে বিশেষভাবে আচরণীয়, ইহা নিশ্চিত করেন।

যোগ কি তাহার একটী ধারণা হইল ; এখন কি প্রকারে এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে তৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশ :

৬.৩.২ কি প্রণালীতে যোগ-অভ্যাস করিবে ?

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানাং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

অন্বয়—সঙ্কল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ত্যক্ত্বা, মনসা ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য ; ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যযুক্তয়া), বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা, শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ ; কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চলতি ততঃ ততঃ এতৎ (মনঃ) নিয়ম্য আত্মনি এবং বশং নয়েৎ। প্রশান্তমনসং, শান্তরজসম্, অকল্মষং, ব্রহ্মভূতং এনং যোগিনং হি উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে। যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ (সঃ যোগী) আত্মানং (স্বয়ং) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে অবস্থিতং) সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে (পশ্যতি)। যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি, সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি ; স চ (সর্ব্বত্রব্রহ্মদর্শী) মে ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি)। যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বং

আস্থিতঃ (অভেদমাশ্রিতঃ) ভজতি, স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বর্ত্ততে। অর্জ্জুন! যঃ সর্ব্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখং আত্মৌপম্যেন (আত্মতুলনয়া) সমং (অভিন্নং) পশ্যতি, সঃ যোগী পরমঃ মতঃ।

অনুবাদ—সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মনদ্বারা সর্ব্বদিক হইতে ইন্দ্রিয়সমুদয়কে সংযত করিয়া ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিয়া (অর্থাৎ আত্মার স্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া) ধীরে ধীরে উপরতি (বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তি) অভ্যাস করিবে ; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না (অর্থাৎ সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ বা অপর কোন বিষয় চিন্তা করিবে না)। চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আত্মার (আপনার) বশীভূত করিবে। যাঁহার মন প্রশান্ত, রজোগুণ উপশমিত, যিনি ব্রহ্মভূত, নিষ্পাপ—এরূপ যোগীকে উত্তম সুখ আশ্রয় করে। এইরূপে সদা (আপনার মনকে বশীভূত করিয়া) আপনাকে যোগযুক্ত করিয়া বিগতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন। যোগে সমাহিতচিত্ত, সর্ব্বত্র সমদর্শী সেই যোগী আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য নহি এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হয়েন না। এই প্রকার যিনি সর্ব্বভূতে-অবস্থিত-আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া এবং সেই প্রকার দেখিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী সর্ব্বথা (যেখানে যেভাবে হউক) বর্ত্তমান থাকিলেও আমাতে থাকেন। হে অর্জ্জুন! সুখ বা দুঃখ (যাহাই থাকুক) যিনি সর্ব্বত্র আত্মতুল্য সমান দেখেন (অর্থাৎ সকলের সুখদুঃখ আপনার বলিয়া গণ্য করেন) তিনি পরম যোগী বিবেচিত হন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে[1] শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে "দুঃখপ্রদ ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষের জন্য চেষ্টাবান্ বিবেকীপুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। অতএব অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এবং মনকে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বধ করিতে হইবে। এইরূপে যোগী ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া থাকেন।"

তখনকার আর বর্ত্তমানের নির্দ্দেশ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ব্বের অবস্থার জীবের জন্য এই অভ্যাসযোগ। যাহাদের মন চঞ্চল ও অস্থির—তাহাদের জন্য। শুদ্ধচেতা ও মুক্ত-পুরুষের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদের বিচারে লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সুখদুঃখ এবং সৎ ও অসতের কোন স্থান নাই, সবই তুল্যমূলক।

এখন এই নয়টী শ্লোক বিশ্লেষণ করা যাউক। এখানে কৃষ্ণবাসুদেব কি প্রণালীতে সমগ্র theoretical principlesএর, সমগ্র তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যার সঠিক প্রয়োগের দ্বারা optimisation of efficient actions সম্ভব হয়, তাহার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে শ্রীকৃষ্ণ এখানে অভ্যাসের কয়েকটী ধাপের উল্লেখ করিয়াছেন:

(ক) **সঙ্কল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ত্যক্ত্বা**—সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া;

(খ) **ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য**—মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া;

১। ২।৬০-৬১, ৩।৪১,৪৩

(গ) **বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া**—ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ completely concetrated অবস্থায় ;

(ঘ) **শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ**—ধীরে ধীরে উপরতি অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তি অভ্যাস করিবে অর্থাৎ slowly and gradully withdrawing oneself from the surrounding environment, পরে ;

(ঙ) **ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ** - অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। এততেও যদি মন অস্থির হইয়া অন্যান্য বিষয়ে বিচরণ করে তাহা হইলে ;

(চ) **ততস্ততো নিয়ম্য**—মনকে সেই সেই বিষয় হইতে ঘুরাইয়া লইয়া আত্মার বশীভূত করিবে ; ইহার জন্য প্রকৃষ্ট modus operandii হইতেছে

(ছ) **সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি**—সর্ব্বভূতকে (অর্থাৎ বিবিধ বিষয় যাহাতে চঞ্চল মন বিচরণ করিতেছে) আত্মায় অভেদে অবস্থিত দেখিতে চেষ্টা , এবং

(জ) **আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্রং সমং পশ্যতি**- সকলের (অর্থাৎ সর্ব্বভূতের) সুখদুঃখ আপনার বলিয়া অনুভব করা।

এইরূপে জীবের কর্মপ্রয়াস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া সার্থক ও পরিপূর্ণ হইবে। ইহাই আধুনিক কালের optimisation of efficient actions এবং praxiology বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যা।

৬.৪ অর্জ্জুনের প্রশ্ন : চঞ্চল মনকে নিরোধ করা বায়ু নিরোধের ন্যায় দুষ্কর

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ – মধুসূদন! অয়ং যঃ সাম্যেন যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ, অহম্ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ ন পশ্যামি। কৃষ্ণ! হি মনঃ চঞ্চলং, প্রমাথি, বলবৎ, দৃঢ়ং ; অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন হে মধুসূদন! এই যে সমতার দ্বারা যোগের কথা তুমি বলিলে, এর স্থায়িত্ব আমি (মনের) চাঞ্চল্যবশতঃ দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ! কারণ মন চঞ্চল, বিক্ষোভকর, প্রবল, দৃঢ় (অনমনীয়); আমি তাহার নিগ্রহ (সংযম) বায়ু-নিরোধের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।

ব্যাখ্যা—স্থিরাং স্থিতিং—জীব স্বকীয় চেষ্টায় বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মের জয় পরাজয় বিচার করিয়া অল্পসময়ের জন্য মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মানসিক অবসাদ আসে আর এই সমতার স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া যায়। অর্জ্জুন শুধু সাধারণ জীবের কথা উল্লেখ করিলেন না, তজ্জাতীয় বিদ্বান্‌দিগেরও এইরূপ

ঘটে তাহা অকপটে জানাইলেন এবং তাঁহার মতে তাহার কারণ দেখাইলেন,

মনঃ চঞ্চলং, প্রমাথি, বলবৎ, দৃঢ়ম্—মন চঞ্চল, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, প্রবল ও অনমনীয়।

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদীর ন্যায় জীবের এই অবস্থা স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিলেন :

৬.৫ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর : অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই নিরোধ সম্ভব

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (চঞ্চলং); (এতৎ) অসংশয়ম্। কৌন্তেয়! তু অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ, তু উপায়তঃ যততা বশ্যাত্মনা অবাপ্তুং শক্যঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো! মন যে দুর্দ্দমনীয় ও চঞ্চল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; হে কৌন্তেয়! কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়। অসংযতচিত্ত পুরুষের

পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপা – এই আমার মত। কিন্তু সংযমী ব্যক্তি যত্নশীল সাধনের দ্বারা ইহা লাভ করিতে সমর্থ।

ব্যাখ্যা—অসংশয়ম্—শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী। তিনি অর্জ্জুনের অভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া যাহাতে তজ্জাতীয় বিদ্বানগণ মনকে আয়ত্তে আনিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিলেন:

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য: এখন প্রশ্ন হইতেছে;

(ক) কীরূপ অভ্যাস?

ও (খ) কী বিষয়ে বৈরাগ্য?

পূর্ব্বে এই অধ্যায়োক্ত দশ হইতে সতেরো শ্লোকে অভ্যাসের যে কাঠামো prescribe করিয়াছেন, তাহা ত একটী বিশেষ শ্রেণীর জীবের জন্য – যাঁহারা যোগারূঢ়। এ শ্লোকের নির্দ্দেশ যে সকলের জন্য সাধারণ (general) নির্দ্দেশ – এইরূপ মনে হয় না এবং একারণ অভ্যাসের একটী বিকল্প স্বরূপ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে অষ্টম হইতে একাদশ শ্লোকে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

সেখানে কি বিষয়ে বৈরাগ্য তাহারও একটী স্বচ্ছ ধারণা দিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসম্পাদন। ইহাই গীতোক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মবাদ।

এইরূপ যোগ অভ্যাস দ্বারা মন যখন সর্ব্বতোভাবে সংযতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে থাকে, তখনই সকল কামনা বর্জ্জিত হয় এবং যোগী যোগযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন।

এই কর্ম্মকৌশল ব্যবহার আধুনিক কালের বিরাট এক operations research। আমরা নিম্নলিখিতভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই অধ্যায়ের শ্লোকোক্ত অভ্যাসের কাঠামো গ্রহণ করি কিংবা দ্বাদশ অধ্যায়ের কাঠামো গ্রহণ করি, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, একটী অতীব কঠিন আর তদনুষ্ঠানের সহায়ক হইতেছে – বুদ্ধিযোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, control; অপরটীর ভিত্তি – প্রীতি ও ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ভরতা।

এই অধ্যায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী দেশ, স্থান, আসন, সঙ্গ, কামনা, শারীরিক ক্রিয়া, দৃষ্টি, আহারবিহার, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, নিদ্রা, ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় – এই সকলেরই নিয়ন্ত্রণ। এইরূপ অভ্যাস সুদুষ্কর এবং কোটিকে গুটীর জন্য – কেবল যাঁহারা যোগারূঢ়। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়ে অভ্যাসের যে বিকল্প কাঠামো বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আপামর জনসাধারণের জন্য। সেখানে নিয়ন্ত্রণের বালাই নাই। সহজভাবে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরের প্রয়াস। সেখানেও কয়েকটী ধাপ :

প্রথম ধাপ—শ্রীকৃষ্ণে চিত্তস্থাপন ;

দ্বিতীয় ধাপ—তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ ;

তৃতীয় ধাপ—তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং

চতুর্থ ধাপ—তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে ফল-ত্যাগপূর্ব্বক স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন।

এ বিষয় পরে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

৬.৬ অর্জ্জুনের প্রশ্ন: যোগভ্রষ্টের ভবিষ্যৎ কি?

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নহ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ, যোগেপ্রবৃত্তঃ) (ততঃ পরং) যোগাৎ চলিত মানসঃ (মন্দবৈরাগ্যঃ) অযতিঃ যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগফলং জ্ঞানং) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি। মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ (সন্) ছিন্নাভ্রম্ ইব (সঃ) কচ্চিৎ ন নশ্যতি? কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ (ত্বং) অর্হসি; হি ত্বৎ অন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন: হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে শৈথিল্যবশতঃ যোগভ্রষ্ট হইলে যোগসিদ্ধি না পাইয়া যোগী কি গতি প্রাপ্ত হন? হে মহাবাহো! ব্রহ্মলাভের পথে বিমূঢ়, আশ্রয়শূন্য, উভয়বিভ্রষ্ট (সকাম কর্ম্মে ফললাভ ও নিষ্কাম

কর্ম্মে মুক্তি লাভ - উভয় সম্ভাবনা হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় সে কি নষ্ট হয় না ? হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছেদ করিতে পার, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই সংশয় দূর করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা—ঠিক জনসাধারণের প্রবক্তা না হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি ও মতবাদ – স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই যে জীবের চরম কর্ত্তব্য – সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় এখনো যায় নাই। চিরকালের সংস্কার, তথা-কথিত লৌকিক কর্ত্তব্যপালন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে তাঁহার (অর্জ্জুনের) সন্দেহ হইতেছিল। "যদি কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ পুরাপুরি না মানিতে পারি তাহা হইলে 'ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইবে।" সে কারণ এই প্রশ্ন।

ফলাশাশূন্য ত দূরের কথা – অর্জ্জুন এখনো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। লাভ-লোকসানের একটী হিসাব নিকাশ করিতে ব্যস্ত। এই জন্য নিঃসঙ্কোচে সখাকে বলিলেন

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে—তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেত্তা পাওয়া যাইতেছে না।

৬.৬.১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর : যোগীর বিনাশ নাই

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – পার্থ! ইহ তস্য (যোগভ্রষ্টস্য) বিনাশঃ ন এব; অমুত্র (পরস্মিন্ বা লোকে) বিনাশঃ ন বিদ্যতে; তাত! হি (যস্মাৎ) কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (তত্র) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ সংবৎসরান্) উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে। অথবা ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং) যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি, ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্। তত্র পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে, ততঃ চ কুরুনন্দন! ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে। তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি সঃ হ্রিয়তে; যোগস্য জিজ্ঞাসু এব শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে। তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (সন্) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি। যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্ম্মিভ্যশ্চ অপি অধিকঃ মতঃ; তস্মাৎ, অর্জ্জুন! যোগী ভব। মদ্গতেন অন্তরাত্মনা

(মনসা) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (সন্) মাং ভজতে, সর্ব্বেষাং যোগিনাং অপি সঃ যুক্ততমঃ মে মতঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিলেন : হে পার্থ! ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার (যোগভ্রষ্টের) বিনাশ হয় না (অর্থাৎ সাধনার ব্যর্থতা হয় না)। হে তাত (বৎস)! কারণ, শুভকারী (যে কখনও যোগাভ্যাসরূপ কল্যাণকার্য্য করিয়াছে) কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের লোকসকল (স্বর্গাদি) পাইয়া সেখানে বহু বৎসর বাস করিয়া সদাচারী ও ভাগ্যবান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন ; এইরূপ যে জন্ম তাহা ইহলোকে অতিদুর্ল্লভ। (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) সেখানে (অর্থাৎ সেই জন্মে) পূর্ব্বদেহের সেই জ্ঞানসংযোগ লাভ করেন ; এবং তারপর, হে কুরুনন্দন! পুনরায় সংসিদ্ধির (মোক্ষের) জন্য যত্ন করেন। আর সেই পূর্ব্বাভ্যাসই সেই ব্যক্তিকে (যোগভ্রষ্ট পুরুষকে) অবশ করিয়া যোগবিষয়ে টানিয়া লইয়া যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্ম (বেদ) অতিক্রম করেন (অর্থাৎ আর বেদের কাম্যকর্ম্মের উপর নির্ভর করেন না)। (শুধু তাহাই নহে) যত্নের সহিত চেষ্টাশীল যোগী পাপ হইতে সংশুদ্ধ হইয়া একাধিক জন্মে সংসিদ্ধি লাভ করিয়া পরে পরাগতি প্রাপ্ত হয়েন। যোগী তপস্বী (কৃচ্ছ্রসাধকের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী (যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানসাধনা করেন, তাঁহাদের) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গণ্য হন, যোগী কর্ম্মিগণ (বেদের কাম্যকর্ম্মে অভ্যস্তগণ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি (নিষ্কাম কর্ম্ম) যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া (ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া) মনের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সমস্ত যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী – এই আমার মত।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গীতা ব্যবহারিক বিষয়ক শাস্ত্র ; ইহাতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হইয়াছে। আর গীতাকারের প্রধান নির্দ্দেশ—স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন। তাহা হইলে জীবের তথা সংসারের ও সমাজের optimisation of efficient actions সম্ভব হইবে।

কৃষ্ণবাসুদেব অত্যন্ত বাস্তববাদী, realist ছিলেন ; তিনি জানিতেন যে জনগণের মধ্যে সামান্য একটী অংশ তাঁহার এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী সংসার যাপন করিবে। আর এই সামান্য অংশের মধ্যেও সমস্ত জীব তাহাদের প্রকৃতিনির্ণীত অনুসৃত নীতি ও পন্থা একেবারে নির্ভুলভাবে পালন করিতে পারিবে না। অন্যেতর বর্ণের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণেরাও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে স্বধর্ম্মপালনে সমর্থ হইতেন না। কৃষ্ণবাসুদেব ইহা জানিতেন এবং সে কারণ নির্দ্দেশ দেন, "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" নিজ স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না।[১]

কেন ত্যাগ করিবে না, তাহার কোন যুক্তি দেন নাই ; অপরন্তু সাবধান করিয়া দিয়াছেন[২] যে,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

ইহা অত্যন্ত কঠোর বাস্তব সত্য। ইহাকে কিছু মোলায়েম না করিলে তাঁহার মতবাদ সর্ব্বস্তরের গ্রহণীয় করা বিশেষ কঠিন হইবে।

১। ১৮।৪৮ ২। ৩।৩৫

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা কোন একটী মত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেই মত যে সঠিক ও শ্রেয়স্কর তাহা ব্যবহারিক ভাবে হাতে কলমে শিক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় এবং তিনি তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, উপদেষ্টার কোন মতানুযায়ী কাজ করিয়া ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ করিবার আশ্বাস থাকিলে সেইমত সহজেই গৃহীত হয় ও সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিবার উৎসাহ আসে।

একারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে তাঁহার যুক্তি ও মতবাদ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় এখনো যায় নাই এবং তিনি প্রশ্ন করিতেছেন[১] ;

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবকে সাদর ও সস্নেহ আশ্বাসবাণী শুনাইয়া নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।" যোগীর পূর্ব্বদেহের জ্ঞানসংযোগ সেই ব্যক্তিকে অবশ করিয়া যোগবিষয়ে টানিয়া লইয়া যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্ম (বেদ) অতিক্রম করেন, অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উপর আর নির্ভরশীল না হইয়া শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট মতবাদ স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে তৎপর হয়েন এবং

প্রযত্নাদ্‌ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥

যোগী যত্নের সহিত চেষ্টাশীল হইয়া নিষ্পাপ হন ও একাধিক জন্মে সংসিদ্ধি লাভ করিয়া পরে পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

১। ৬।৩৭

এই সকল আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিয়াও থামিলেন না; পরন্তু যোগী যে কি বস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ দিলেন,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥

এবং তাঁহার শেষ ও মোক্ষম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন,

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যোগীর বিনাশ ত নাই-ই, বরঞ্চ যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে চিত্তসমর্পণ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, এবং যিনি মন্নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-করার পদ্ধতি স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন তিনি সকল যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী—ইহাই আমার অভিমত।"

—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৭	action	actions
৫	২১	ধর্মক্ষেত্রে	ধর্মক্ষেত্র
১৭	৪	সর্ব্বোষাঞ্চ	সর্ব্বেষাঞ্চ
২১	২৩	ধ্বংশের	ধ্বংসের
২২	৫	বিষন্ন	বিষণ্ণ
২৪	৭	ক্ষত্রির	ক্ষত্রিয়
২৮	১০	করিয়াছিালন	করিয়াছিলেন
৩০	৫	পারিবা	পারিয়া
৩১	১৮	action	actions
৩০	১২	মহাপ্রাণত্বা	মহাপ্রাণত্ব
৪	১২	সমুপস্থিম্	সমুপস্থিতম্
৪৯	২০	মাত্রাস্পর্শাস্ত	মাত্রাস্পর্শাস্ত
৫৬	৭	বিষযে	বিষয়ে
৫৬	২১	অপাতদৃষ্টিতে	আপাতদৃষ্টিতে
৫৯	১৫	পড়িয়াছে	পড়িয়াছ
৬৪	১	কবা	করা
৬৭	৩	তজ্জস্ত	তজ্জন্য
৭০	৬	ষমেবৈষ	যমেবৈষ
৮৩	১০	অত্যাপ্ত	অত্যন্ত
৯৪	১৪	দুষ্কৃতি	দুষ্কৃতি

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৭	১৪	তাঁহায়	তাঁহার
১০৩	২১	পরিয়াছে	পড়িয়াছে
১০৪	১৪	যোগ্য	যোগ্য নহে,
১০৫	১	প্রজ্ঞা ও	প্রজ্ঞা ;
১১১	৬	বিবর	বিষয়
১১১	২১	সমূদ্রমাপঃ	সমুদ্রমাপঃ
১১৩	১৩	আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা	আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা
১১৪	৪	অত্মনিষ্ঠায়াং	আত্মনিষ্ঠায়াং
১১৫	১২	ঘটাইবার	ঘটাইয়া
১১৫	১৬	কিছূ	কিছু
১১৭	২২	যৎ	যং
১২১	২২	শমনমাদিগুণসম্পন্ন	শমদমাদিগুণসম্পন্ন
১২৭	১৩	কারন	করেন
১২৭	১৫	প্রকৃতি –	প্রকৃতি
১২৮	২	যদি	যদি জীবের
১৩২	১৭	শ্রীকৃজ্ঞ	শ্রীকৃষ্ণ
১৩৫	১৮	অধর্ম্মৈচিত	অধর্ম্মোচিত
১৩৬	২০	ভাবয়িত	ভাবয়ত
১৩৬	২১	(যুগ্মান্)	(যুষ্মান্)
১৪০	৩	তজ্জন্য	তজ্জন্য
১৫২	২২	থাকিতা	থাকিতাম
১৫৩ Heading		সাংখ্য	কর্ম্ম
১৬০	৪	করিয়াছেন	করিয়াছেন
১৬০	৭	demolition	demolished

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	১৯	যে	যে ইঁহাদের
১৭৪	১৭	৩.১১.১	৩.১২
১৭৫	১	৩.১২	৩.১৩
১৭৫	৭	বুদ্ধা	বুদ্ধা
১৭৬	১১	সোহং	সোঽহং
১৭৯	১৭	ষাহা	যাহা
১৯৩	২০	সিদ্ধিং	সিদ্ধিঃ
১৯৩	২১	সিদ্ধিঃ	সিদ্ধিং
২০১	১৮	মনুষ্যেসু	মনুষ্যেষু
২০২	৪	মনুষ্যেসু	মনুষ্যেষু
২০৭ Heading ২০			২০৭
২০৮	19	শোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে
২০৯	৬	তাঁহার সংযম	তাঁহার যজ্ঞ
২১০	৩	ভগবদগীতা	ভগবদ্গীতা
২১১	১২	কিন্তু	কিন্তু
২১৯	১৮	আধুনা	অধুনা
২৩০	৩	নিশ্চই	নিশ্চয়ই
২৩১	২২	পদ্মপত্রম	পদ্মপত্রম্
২৩৮	১২	পাপপূণ্য বোধ	পাপপুণ্য বোধ
২৬৮	২১	দাপো	দীপো
২৮৫	৬	কৃষ্ণবাচুদেব	কৃষ্ণবাসুদেব
[১৪]	৭	যোক্তিক	যৌক্তিক
[১৮]	১২	করিয়াহিলেন	করিয়াছিলেন
[১৯]	১৯	গূঢ়	গূঢ়

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[২৫]	১	ure	ture
[২৮]	৫	স্বকীর	স্বকীয়
[৩৫]	১৮	পরস্পরা	পরম্পরা
[৪৪]	Heading	স্বধ্যায়	অধ্যায়

12-7-73